উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

দ্বিতীয় সেমেস্টার

নাটক

কোর পত্র – ২০৩ (আবশ্যিক)

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ - নাট্যশিল্প ও সাজাহান,প্রধান চরিত্রের তাৎপর্য।

একক ২ – ঔরংজীব জাহানারা ও অন্যান্য চরিত্র আলোচনা।

একক ৩ - নাটকে সংগীতের ব্যবহার, ভাষা ও সংলাপের ব্যবহারে বৈচিত্র্য, ট্র্যাজেডি বিচার।

একক ৪ – দৃশ্য ও অঙ্ক অনুসারে নাটকের বিশ্লেষণ।

একক ৫ - বাংলা নাটকের সূচনা ও মধুসূদন।

একক ৬ – ট্র্যাজেডি, গঠনশৈলী, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য প্রভাব।

একক ৭ - কৃষ্ণকুমারী নাটকের সংলাপ ও চরিত্রসৃষ্টি

পর্যায় খ

একক ৮ - কাব্য নাটক প্রসঙ্গ ও বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা

একক ৯ - পুরাণের পুনর্জন্ম, সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব।

একক ১০ – নাটকের চরিত্র নির্মাণের বৈচিত্র্য

একক ১১ - লেখক সত্তা, সমকাল ও তুলসী লাহিড়ী

একক ১২ - চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ছেঁড়া তার

একক ১৩ - সংগীত প্রয়োগ, ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে গুরুত্ব।

একক ১৪ - কাহিনি বিন্যাস, শৈলীবিচার, সংলাপ ও ভাষার নির্মাণ।

কোর পত্র – ২০৩ (আবশ্যিক) নাটক

পর্যায় খ

একক ৮ - কাব্য নাটক প্রসঙ্গ ও বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা - কাব্যনাটক প্রসঙ্গ ও আলোচনা, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা, নাট্যকার বুদ্ধদেব,

একক ৯ - পুরাণের পুনর্জন্ম, সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব - নাটকের উৎস ও অনুষঙ্গ, পুরাণের পুনর্জন্ম, নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ অনুসারে সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব

একক ১০ – নাটকের চরিত্র নির্মাণের বৈচিত্র্য - নাটকের চরিত্রায়ন, ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনী, শান্তা, লোলাপাঙ্গী ও বিভান্ডক, অংশুমান, চন্দ্রকেতু, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত, শ্লীলতা ও অশ্লীলতা এবং তপস্বী তরঙ্গিণী,

একক ১১ - লেখক সত্তা, সমকাল ও তুলসী লাহিড়ী - লেখক সত্তা ও তুলসী লাহিড়ী, ছেঁড়া তার ও সমকালীন সমাজ, ছেঁড়া তার নাটকের নামকরণ, গণনাট্য, নবনাট্য, ও ছেঁড়া তার নাটক,

একক ১২ - চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ছেঁড়া তার - চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ছেঁড়া তারের, রহিমুদ্দি চরিত্র, হাকিমুদ্দি চরিত্র, মহিম চরিত্র, গোবিন্দ কোরাক প্রভৃত্তি চরিত্রের পর্যালোচনা

একক ১৩ - সংগীত প্রয়োগ, ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে গুরুত্ব - সংগীত প্রয়োগের তাৎপর্য, ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে গুরুত্ব

একক ১৪ - কাহিনি বিন্যাস, শৈলীবিচার, সংলাপ ও ভাষার নির্মাণ - 'ছেঁড়া তার'র অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ অনুসারে কাহিনি বিন্যাস, নাটকের শৈলীগত কাহিনির পরম্পরা বিন্যাস, নাটকের সংলাপ ও নাট্যভাষার নির্মাণ

একক ৮- তপস্বী ও তরঙ্গিনী কাব্য নাটক প্রসঙ্গ ও বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা

বিন্যাসক্রম

৮.১ কাব্যনাটক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

৮.২ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

৮.৩ বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা

৮.৪ নাট্যকার বুদ্ধদেব।

৮.৫ অনুশীলনী

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ কাব্যনাটক প্রসঙ্গ ও আলোচনা

কাব্যনাটক কথাটি নিতান্ত একালের। প্রাচীনকালে এদেশে এবং বিদেশে নাটককেই কাব্য বলা হতো। সংস্কৃতে নাটককে বলা হয় দৃশ্যকাব্য। গ্রীক এবং এলিযাবেথীয় যুগের নাটক মূলত কাব্যনাটকের আঙ্গিকেই রচিত। কিন্তু যে অর্থে এখন কাব্যনাটক না কাব্যনাট্য কথাটা ব্যবহৃত হয় তা একান্তভাবেই বিশ শতকের সৃষ্টি।

বিশ শতকের শুরুতে প্রচলিত নাট্যচর্চার একঘেয়েমী ও স্থবিরতা থেকে উত্তীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কবিরাই নাট্য আঙ্গিকে কাব্যনাট্যের ধারাটির পুর্নজন্ম ও বিকাশের চেষ্টা করেন। অবশ্য তাদের সে প্রয়াস-পরীক্ষা চলে স্বল্প সংখ্যক দর্শকের সামনে, Little থিয়েটার বা ঘরোয়া মঞ্চে। এরকম ঘরোয়া দর্শকদের জন্যই এলিয়ট লিখেছিলেন তাঁর স্যামসাঙ্গ এগোনিস্টস। ১৯০১ –এ বিশ শতকের কাব্য নাটকের

পুনর্জন্ম সূচিত হয় Little থিয়েটারে স্টিফেন ফিলিপ্‌স এর Herold নাটকের প্রদর্শন মধ্য দিয়ে। উনিশ শতক থেকে এ ব্যাপারে অনেক পাশ্চাত্য কবি (ওয়ার্ডওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস্‌, বায়রন, টেনিসন, ব্রাউনিং, আর্নল্ড, সুইনবার্ন, হবকিন্স) সচেষ্ট হলেও সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। তাদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে এলিয়ট জানান, মঞ্চ বিষয়ে কবিদের অজ্ঞাত ও নাট্যকর্মের সম্পূর্ণ বিষয় অনুধাবনে তাঁদের অক্ষমতাই এজন্য দায়ী। অন্যদিকে মঞ্চ বিষয়ে যাঁদের জ্ঞান আছে, কবি নন বলে কাব্যনাট্য রচনায় তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন।

তাই ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স, জে. এস. সিং সীন ওকেসি, কিংবা জন ম্যাসফিল্ড, ক্রিস্টোফার ইশারউড, ডবলিউ. এইচ. অডেন, স্ট্রীফেন স্পেন্ডার ও ত্রিস্টোফার ফ্রাই এই প্রকরণের ধারায় কাজ করলেও সার্থকতা দেখাতে সক্ষম হন নি।

সত্যিকার অর্থে এর সূচনা, তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ, নাট্য রচনায় এর প্রয়োগ ও বিকাশে সাধন করেন টি. এস. এলিয়ট। এবং একে বিশেষ একটি পরিণতিতে পৌঁছে দেন তিনি। বলা বাহুল্য, বাংলায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্যনাট্যে অনুশীলনে আমাদের কবিদের কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রধানভাবে আছেন এলিয়টই।

সাধারণভাবে কাব্যীর ভাষায় রচিত নাটকই কাব্যনাট্য বলে অভিহিত হয়। কিন্তু একালের সমালোচক ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেনঃ-

‘কাব্যনাটক বা কাব্যনাট্য, ইংরেজীতে Verse play বা poetic Drama – র সাধারণ অর্থ তাই। কিন্তু ছন্দে রচিত রচনা মাত্রই যেমন কবিতা নয়, তেমনি নাটক কাব্য রচিত হলেই তা কাব্য নাটক হয় না। কাব্য ও নাটক উভয়ের শর্ত পূরণ এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মস্থ, বাহুল্যবর্জিত ও অপরিহার্য হয়ে নিজেকে হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে যে শিল্পমাধ্যম তাই কাব্য নাটক” (শান্তনু কায়সার/ কাব্য নাটক/বাংলা একাডেমি/ঢাকা ১৯৮৯/পৃ-৯)

অন্য সমালোচক বলেনঃ- “যেখানে কাব্য পরিবেশনই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং কাব্যের আঁধার হিসেবে নাট্য পদ্ধতি গৃহীত, সেখানে রচনাক্র কাব্য আখ্যায় চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। ইংরেজীতে এই জাতীয় কাব্যকে বলে Dramatic Poetry। আর বাংলায়

একে বলা যায় নাট্যকাব্য বা নাট্যিক কাব্য। কিন্তু যে স্থলে রচনাকে নাটক বলে চিহ্নিত করা উচিৎ। ইংরেজীতে এই ধরনের রচনাকে Poetic Drama আর বাংলায় একে বলে যায় কাব্যনাট্য বা কাব্যিক নাটক বা কাব্যনাটোক।”

(সুশীল কুমার গুপ্ত/ রবীন্দ্রনাথ নাট্য প্রসঙ্গঃকাব্যনাটক স্ট্যান্ডার্ড পাবলিশার্স ১৩৬৮/ পৃ-১৯)’

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের মধ্যে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য চিহ্নিত করেছেন পন্ডিতেরা। আমরা একে একে সেগুলির উল্লেখ করতে পারি।

১। আকৃতির দিক থেকে নাট্যকাব্য কাব্যনাটকের চাইতে হ্রস্ব।

২। কাব্যনাট্যনাটকে কাহিনি দীর্ঘ হবার দরুণ এখানে চরিত্র সংখ্যা বেশী। অন্যদিকে, নাট্যকাব্যে চরিত্র সনহখ্যা কম। কাহিনি একমুখী।

৩। কাব্যনাটকে শখা কাহিনির ব্যবহার স্বাভাবিক। অপরপক্ষে, নাট্যকাব্য শাখা কাহিনি অনুপস্থিত।

৪। কাব্যনাট্যে প্রয়োজনে গদ্য সংলাপ এবং সঙ্গীত ব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু নাট্যকাব্যে গদ্য সংলাপ ও সঙ্গীত ব্যবহার অবকাশ থাকে না।

৫। নাট্যকাব্যে বেগমান আবেগ ও দ্রুততা লক্ষনীয়।

৬। কাব্যনাট্যে সেই তুলনায় আবেগ কম, ঘটনা ও সংঘাতের উপস্থিতি স্বাভাবিক।

৭। নাট্যকাব্যে নাট্য নির্দেশনা ইত্যাদি অনুস্থিত থাকে। অপরদিকে, কাব্যনাট্যে নাট্য নির্দেশনা থাকে।

৮.২ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

নাট্যকাব্য আসলে নাটকের আঙ্গিকে রচিত কবিতা। কাব্যনাট্য রচিত হয় নাটকের তীব্র গতিময়তা ও উৎকণ্ঠা কাব্যের আবেগ তারল্য কিছুটা স্তিমিত হতে বাধ্য। ফলে নাটকের জগতে ‘লিরিকের বাড়াবাড়ি’ (স্মরণীয়ঃ কেহ বলে ড্রামাটিক/ বলা নাহি যায় ঠিক/ লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি - রবীন্দ্রনাথ) অনেকের কাছে পীড়াদায়কও মনে হতে পারে।

এলিয়ট মনে করেন, কাব্যনাটকের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে চিরকালীন। আধুনিক কালে এটি এক সামাজিক সৃষ্টিতে পরিণত। তাঁর মতে কাব্যনাটকের সমস্যা আসলে ভাষা ও

কনটেন্ট এর সমস্যা। অন্যসিকে যোগাযোগ বা কম্যুনিকেশন এর সমস্যা কবিতায় এতটা জরুরি নয়, যতটা জরুরি কাব্যনাট্যে। কাব্যনাটক রচনায় তার আঙ্গিক ও ভাষা ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন বলেই তিনি মনে করেন, কাব্যনাট্যে কবিতা ও নাটক আলাদা হতে পারে না। এই সূত্রে পূর্ববর্তীদের কবিতায় লেখা নাটককে কাব্যনাট্য বলার প্রবণতা বাতিল করে দেন এলিয়ট। তিনি এও বুঝিয়ে দেন যে, শেক্সপীয়রের কাব্য নাটকগুলি যে আলাদা গদ্য ও পদ্য সংলাপ যুক্ত করা হয়েছে এটি ও কাব্যনাট্যের ত্রুটি। কেননা এতে করে পাঠক বা দর্শক কবিতার আলাদা অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়বে। এটা উচিৎ নয়।

আধুনিক কালের যথার্থ কাব্যনাটক রচিত হয় এলিয়টের হাতে। The Rock(1934) এর কোরাস লিখে তিনি সত্যিকারের এই নতুন রীতির শিল্পকলার সূচনা করেন। আর তাঁর শেষ কাব্যনাটক 'দ্য এল্ডার স্টেট্‌সম্যান' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এই প্রকরণের ব্যাপারে তাঁর ধারণার স্পষ্ট পরিচয় দেন তিনি এইভাবেঃ-

'যে কবি মঞ্চের জন্য লিখতে চান তাকে দীর্ঘকাল সাধনার দ্বারা কাব্যশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিজের বশে রাখতে হবে। অর্থাৎ কবিতাকে স্বাস্থ্যকর স্বল্পাহারে রেখে তাকে নাট্যমঞ্চের উপযোগিতা দান করতে হবে। যখন এই কুশলতা সম্পূর্ণ অর্জিত হবে, কবির তা দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হবে, তখন কবিও মঞ্চের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবেন। কাব্য নির্মাণে নিত্যকার মুখের বুলিকে আরও অসংকোচে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন।'

(শান্তনু কায়সার/ কাব্য নাটক/বাংলা একাডেমি/ঢাকা ১৯৮৯/পৃ-৯)

অথচ একদা বাংলা নাটকে শেক্সপীয়রেরই কাব্যনাট্যের আঙ্গিক অনুসৃত হয়েছে। গিরিশ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই আঙ্গিকেরই রকমফের। কিন্তু লক্ষনীয়ভাবে রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' রচনার সময় থেকেই এই রীতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছেন। মালিনী রচনার সময় ছোট ছোট নাট্যকাব্য লিখলে ও শেক্সপীয়রীয় কাব্যনাট্যের আদল তিনি আর অবলম্বন করেন নি। ১৯০৮ থেকে রবীন্দ্রনাথ নতুনতর পরীক্ষায়, এক দুঃসাহসে ভর করে তাঁর নাটকে পদ্যের বদলে গ্রহণ করলেন গদ্য

সংলাপ। শারদোৎসব নাটকে সে পালাবদলের সূচনা হলো। শারদোৎসবের পাঠক মাত্রই অনুভব করলেন যে, এ গদ্য প্রচলিত গদ্য নয়। এর লাবণ্য কবিতার প্রায় আমাদের কান এবং প্রাণকে যুগপৎ আকর্ষণ করে। আমাদের মনে হয়েছে, যতদিন পর্যন্ত না নাটকের গদ্যভাষার এই নিজস্ব শৈলী – যা কাব্যময় ও আপেল বা বাদামের মত সুরভিত – আবিষ্কার করতে পারছিলেন কবি, ততদিন পর্যন্ত তিনি শেক্সপীয়রকে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু শারদোৎসবের পর রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন তাঁর নিজস্ব ভূমি। বহু যত্নে ও কষ্টার্জিত এই গদ্য সংলাপ যা শারদোৎসবে, তিনি প্রথম গ্রহণ করলেন, তাকে ক্রমশ মার্জিত পরিশীলিত ও ধারালো করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এই গদ্য ভাষার পেছনে কবি রবীন্দ্রনাথের আজন্ম লালিত শব্দ সচেতনতা যেমন আছে, তেমনি আছে ঠাকুরবাড়িতে প্রচলিত মৌলিক গদ্যের একটি নিশ্চিত প্রভাব। এবং শ্রদ্ধেয় শিশির দাস ঠিকই অনুমান করেন যে, এই আবিষ্কৃত গদ্যই শেষে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মৌখিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ব্যক্তিগত আলাপেও রবীন্দ্রনাথ এই লাবণ্যময় কাব্যগুণান্বিত পদ্য ভাষাই যে ব্যবহার করতেন, তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন তাঁর সান্নিধ্যধন্য অনেকে। তাছাড়া তাঁর শেষ পর্বের লেখায় তিনি গদ্যই গ্রহণ করেছেন। এখানে একটি বিন্দুতে এসে মিলে গেছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গদ্য আর তাঁর কবিতার গদ্য। আসলে পন্ডিত সমালোচকদের তর্ক বিতর্কের মধ্যে না ডুবে রবীন্দ্রনাথ যেন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন তাঁর। নাটকের ভাষা হবে কাব্য সুরভিত গদ্য। যে গদ্য একান্ত আটপৌরে।

৮.৩-বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা

কাব্যনাটকের কাব্যময় গদ্য ভাষা সংক্রান্ত প্রথম পাঠ বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের থেকে নিয়েছিলেন, একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য এর পরে এলিয়টের কাব্যনাট্য সংক্রান্ত তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। বুদ্ধদেবও চিনে নিয়েছিলেন গদ্যের সেই 'নাড়ীস্পন্দন' যা তিনি অনুভব করতেন রবীন্দ্র-গদ্যে। বুদ্ধদেবের কাব্যনাট্য সম্পর্কে শান্তনু কায়সার লিখেছেনঃ 'রবীন্দ্রোত্তর কালে কাব্যনাটক রচনায় বুদ্ধদেব বসু বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যনাট্যগুলোর মধ্যে আছে তপস্বী ও

তরঙ্গিনী', 'কলকাতার ইলেকট্রা', 'প্রথম পার্থ', 'সত্যসন্ধ', 'পাতা ঝরে যায়', 'কাল সন্ধ্যা', 'হিতাকাঙ্ক্ষী' ও 'অনাম্নী অঙ্গনা'।

প্রধানত মহাভারতের পৌরাণিক পটভূমিতে তাঁর কাব্যনাট্যগুলো রচিত হলেও এখানে গ্রীক নাট্যকলার ঋজুতা ও সংহতি লক্ষ্য করা যায়। ইউজিন ওনীল তাঁর গদ্য নাটক 'মর্নিং বিকামস্ ইলেকট্রায় যেমন মার্কিন জীবন ও কাহিনীকে গ্রীক কাঠামোয় বিন্যস্ত করেছেন তেমনি বুদ্ধদেব বসু কলকাতা, সমকালীন জীবন ও বাংলা কাব্যনাট্যে ইলেকট্রা তথা নাট্যকলার নতুন তাৎপর্য আবিষ্কারও যোগ করেছেন।' (শান্তনু কায়সার/ কাব্য নাটক/বাংলা একাডেমি/ঢাকা ১৯৮৯/পৃ-৪১-৪২)

বুদ্ধদেব বসু উল্লেখযোগ্য সব কটি কাব্যনাট্যে নির্বাচিত হয়েছে মহাভারতীয় তথা পৌরাণিক পটভূমি। এলিয়টের কবিতায় ও নাটকে যেমন রয়েছে গ্রীক উৎস। তবে এই পুরাতন উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক ছিলেন এলিয়ট। তাঁর এই সর্তক মনোভাবের প্রমাণ পাওয়া যাবে তাঁর নিজস্ব রচনা দ্য ফ্যামিলি রি ইউনিয়নে গ্রীক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গে কঠোর সমালোচনায়। তিনি লেখেনঃ – 'এ নাটকের গভীরতর দুর্বলতা গ্রীক কাহিনি ও আধুনিক পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যার্থতা। আমার পক্ষে উচিৎ ছিল এস্কিলাসকে আরও যথাযথভাবে অনুসরণ করা, নয় তাঁর উপাখ্যানকে আরও স্বাধীনভাবে রূপান্তরিত করা। নাটকের প্রতিহিংসা গ্রহণকারী প্রেত যোনির দল (Furies) আমরা এই ব্যর্থতার সাক্ষী... এরা না পেরেছে গ্রীক দেবী হতে, না পেরেছে আধুনিক প্রেতাত্মা হতে। প্রাচীনের সঙ্গে সমকালের যোগাযোগ ঘটাতে গিয়ে আমি যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি এই অসঙ্গতি তার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র' (শান্তনু কায়সার/ কাব্য নাটক/বাংলা একাডেমি/ঢাকা ১৯৮৯/পৃ-৩৬-৩৯)

এই দিক থেকে বুদ্ধদেবের কাব্য নাটকগুলি বিশেষ করে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'প্রথম পার্থ', কিংবা 'অনাম্নী অঙ্গনা'য় কবির সার্থকতা ও সিদ্ধি তুলনাহীন। পুরাণকথাকে আধুনিক যুগের বিশ্বাসযোগ্যতায় নামিয়ে আনায় যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল তাকে অবলীলায় অতিক্রম করেছেন বুদ্ধদেব। পুরাণকথাকে আধুনিক যুগের বিশ্বাসযোগ্যতায় নামিয়ে আনায় যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল তাকে অবলীলায় অতিক্রম করেছেন বুদ্ধদেব।

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে দেখা যাবে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম-রহস্যে হরিণীর গর্ভে বিভান্ডকের সন্তান উৎপাদনের ব্যাপারটি এ যুগের পাঠক বা দর্শক কীভাবে নেবেন চিন্তা করেই কবি কিরাত রমণীর প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন। এবং শেষ অঙ্কে শান্তাকে তার কৌমার্য ফিরিয়ে দেবার অলৌকিকত্বে উল্লেখ থাকলেও ব্যাপারটিকে গৌণ করে দিয়েছে নাটকের সেই বিশেষ মুহূর্তে 'তরঙ্গিনী ও তপস্বী'র মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যা। সংক্রান্তি কাব্যনাট্যে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষদিনে হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে নাটকের পটভূমি উন্মোচিত। এই এক দিনের কাহিনিতে সমস্ত ঘটনা ঘনবদ্ধ নাট্যক্রিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য দিকে নাটকের সময়কালীন বাস্তবতায় নাট্যকার প্রাচীন মূল্যবোধকে যাচাই করে নিতে চেয়েছেন। অনাম্নী অঙ্গনাতেও দেখি ব্রাত্যরমণীর কুমারী মাতা হবার অভিজ্ঞতা বর্ণনার পটভূমিতে যদিও এসেছে অলৌকিকতা ও আকস্মিকতা তবুও কোথায়ও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি পরিবেশ। বরং অঙ্গনার অভিজ্ঞতায় বর্ণিত হয়েছে চিরকালের এক সাধারণ মানবীর জীবন- অভিজ্ঞতা। কবিতা রচনায় যে বুদ্ধদেব প্রায়সই বিস্তৃত আবেগের অগভীরতায়, ছড়িয়ে যান পৌরাণিক জীবনবোধের অনুষঙ্গে, সেই সমস্ত কিছুকে অবলম্বন করে কাব্যনাট্য সৃজনে সেই কবি অসামান্য দক্ষতায় ডুব দিতে পারেন মানবজীবনের গভীর সমস্যায়। কাব্য নাটকের বিষয়বস্তু পৌরাণিক ঐতিহাসিক বা রোমান্টিক যাই হোক না কেন, এই প্রজাতির শিল্পের মূল চরিত্রটি নিহিত আছে তার ভাষাশৈলীর প্রগাঢ়তা এবং সংহতির উপর। তাই এলিয়ট গ্রীক নাটকের স্থান কাল ও কর্মের ত্রয়ী ঐক্য কাব্যনাট্যে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। এই ত্রয়ী ঐক্য গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস বুদ্ধদেবের সব নাটকে না দেখলেও যে বিষয়টি সহজে আমাদের নজরে আসে, তা হলো বুদ্ধদেবের কাব্যনাটকের অসাধারণ বাচনশৈলী ।

শব্দের উপর কি অসাধারণ আধিপত্য বুদ্ধদেবের দু একটি, দৃষ্টান্ত এখানে অবান্তর হবে না। তপস্বী ও তরঙ্গিনী তার প্রথম সার্থক কাব্যনাট্য। এর পরবর্তী নাটকগুলিতে এই দক্ষতা আরও স্পষ্ট হয়েছে। তবু, প্রাথমিক প্রয়াস বলেই আমরা তপস্বী তরঙ্গিনী

থেকেই উদ্ধৃত করি তার রচনা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এ ব্যাপারে চরম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বুদ্ধদেব।

তরঙ্গিনী সুদক্ষ কামকলার উদ্দেশ্য নিয়ে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলে তার সরলার্থ করেন নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে অবোধ তপস্বী। তপস্বী তার অভিজ্ঞতা দিয়ে শব্দের অর্থ বোধ করেন। অথচ সেই সুযোগ গ্রহণ করে তরঙ্গিনী তার উদ্দেশ্যে সফল হয়। প্রেম নয়, কাম নয় তপস্বীর শরীরে যে সঞ্চার করে এক প্রেরণা।

তরঙ্গিনীঃ তপোধন আমি তত্ত্বকথা জানি না, আমি প্রেরণার বশবর্তী।

ত্যাগীই আমার ভোগ। আমার সার্থকতা। পশুপক্ষী

ও পতঙ্গকে বৃক্ষ যেমন ফল দান করে তেমনিই আমি জনে জনে করি আত্মদান।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ তত্ত্বজ্ঞান আমারও যৎকিঞ্চিৎ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার অনুভূতি

হয়, যেন পশু-পক্ষী, বৃক্ষের সঙ্গে আমি একাত্ম।

নিখিলের সঙ্গে একাত্ম।

তরঙ্গিণীঃ দেব, আমি দ্বৈতবাদী। কে আমাকে গ্রহণ করবেন, আমি

নিরন্তর তাকে খুঁজে বেড়াই। এই আমার পদ্ধতি। লজ্জা

ত্যাগ ও ঘৃণা বর্জন আমার ক্রিয়া কর্ম।

তরঙ্গিণীঃ আমি কিন্তু পূজ্যজনকে প্রণাম করি না, আলিঙ্গন করি।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ আলিঙ্গন? লতা যেমন বৃক্ষ কে আলিঙ্গন করে?

তরঙ্গিণীঃ ...এবার আপনার মুখচুম্বন আমার কর্তব্য।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ চুম্বন? অলি যেমন মধুপুষ্প চুম্বন করে?

শব্দের ধ্বনি ও তার অর্থের যে অনুষঙ্গ শ্রোতার মনে সৃষ্টি হয় তার মূলে থাকে ভাষহাভাষীর অভ্যাস সংস্কার ও ব্যবহারিক পরিস্থিতি। নাটকে ব্যবহৃত সংলাপেরও তাই থাকে তিনটি মাত্রা অন্ততঃ তিনটি ক্ষেত্রে।

১। সংলাপ যে বলছে।

২। যাকে বলছে।

৩। দর্শক মন্ডলী।

তপস্বীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত শব্দগুলি তরঙ্গিনীর কাছে যে মাত্রা বহন করছে, তপস্বীর কাছে তা নয়। তেমনিই এ দুজনের সংলাপের বোধাতীত ব্যবধানের মধ্যে দর্শক পাঠকের মনে এই সংলাপ ও ভাষা নতুন এক মাত্রা সৃষ্টি করে। বুদ্ধদেবের দক্ষতা এইখানে। প্রচলিত শব্দার্থে যদি তররঙ্গিনীকে বুঝতেন তপস্বী তাহলে তরঙ্গিনীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। তপস্বীর জীবন প্রতিবেশ থেকে শব্দগুলির (চুম্বন, আলিঙ্গণ যে ছবি তার কাছে উঠে আসছে তাঁদের দোষাবহ কিছু অনুভব করেন না তপস্বী।) অবোধ, অপাপবিদ্ধ তপস্বী। দর্শকেরা মারাত্মক এই সময়টা যখন পার হয়, তখন স্পন্দিত হয় প্রতি মুহূর্তে এই আশঙ্কায় যে, যে কোন সময় তপস্বীর বোধদয় ঘটতে পারে। কিন্তু কেবল শব্দপ্রয়োগের দক্ষ জাদুতে মোহিত থাকেন তপস্বী এবং সিদ্ধ হয় তরঙ্গিনীর উদ্দেশ্য। যে কোন সাধারণ মাপের নাট্যকারের হাতে এই অভাবনীয় সংলাপ রচনা ছিল অসম্ভব।

শব্দের মন্ত্রোপম ব্যবহার বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব। আবেগকে সীমিত ও প্রগাঢ় করে বাক্যরচনার অভিজাত প্রক্রিয়া বুদ্ধদেবের আয়ত্তগত।

তরঙ্গিণীঃ ... মেঘ জমল আকাশে, চমক দিল বিদ্যুৎ। বিলোল
হলো বজ্র, নামল বৃষ্টি। জাগল ধ্বনি – প্রতিধ্বনি।
প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়
প্রতিধ্বনি

যৌবনে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

"আমার মনের চূড়ায় চূড়ায় চূড়ায় শব্দ বাজে
চূড়ায় চূড়ায় ঠেকে ভেঙে যায়, ছড়ায় হাওয়ায়
ইতস্তত-
দশদিক থেকে কথা ক'ইয়ে ওঠে প্রতিধ্বনি
গভীর গুহার গহ্বর থেকে গাঢ় কণ্ঠ প্রতিধ্বনি
আমার মনের অপার আকাশে হাযার হাযার প্রতিধ্বনি

ডাইনে ও বামে উপরে ও নীচে এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি

প্রতিধ্বনি!

'কঙ্কা – কঙ্কা – কঙ্কাবতী গো – কঙ্কা, কঙ্কাবতী –

এখানে ওখানে প্রতিধ্বনি"

(কঙ্কাবতী/কঙ্কাবতী ও

অন্যান্য কবিতা)

এই আবেগ থেকে জন্ম হয়েছে পরিণত, ঘণীভূত এই কাব্যনাট্যের ভাষা। এই ভাষা নির্মাণের ব্যাপারে এলিয়টের মেধাবী পরামর্শ আগেই উল্লিখিত – যে কবি মঞ্চের জন্য লিখতে চান তাকে দীর্ঘকাল সাধনার দ্বারা কাব্যশক্তিকে বশে রাখতে হয়। অর্থাৎ কবিতাকে স্বাস্থ্যকর স্বল্পাহারে রেখে তাকে নাট্যমঞ্চের উপযোগিতা দান করতে হয়। কঙ্কাবতী থেকে তপস্বী ও তরঙ্গিনীর কাল শিল্পীর সাধনার জীবনে বস্তুতই 'দীর্ঘকাল'। আর বুদ্ধদেব তুলনাহীন ভাবে সার্থক হয়েছেন এই সংযম প্রদর্শনে।

কেবল বুদ্ধদেবেই নয়, রবীন্দ্রোত্তর কালের প্রায় সকল কবির লেখাতেই কাব্য নাটক দেখা দিয়েছে স্বতন্ত্র রূপশৈলী নিয়ে। যাকে – দৃশ্যকাব্য মাত্রই এক ধরনের কাব্যনাট্য – এ জাতীয় পুরাতন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নেওয়া গেল না আর। তা একান্তই নতুন কালের শিল্প। যার ভাষাশৈলীতে বেজে উঠলো রবীন্দ্র কথিত সেই 'চিরকালের স্তব্ধতা' আর 'চলতি কালের চাঞ্চল্য'।

৮.৪- নাট্যকার বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব বসু(১৯০৮ - ১৯৭৮) প্রথম নাটক লিখেছিলেন তার ছাত্রাবস্থায়। তখন যুবক কবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঐ সময়ে লেখা দু'একটি নাটক ঢাকার জগন্নাথ হলে অভিনয়ের সুযোগও পেয়েছিল। ঐ সময়ে রচিত নাটক 'রাবণ'এর পান্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন ঢাকা থেকে কোলকাতায়। রাবণ অভিনয়ের চেষ্টা অনেকদূর এগিয়ে

গিয়েছিল শ্যাম বাজারের নাট্যমঞ্চে। এই নাটকের অভিনয়ের পরিণতি নিয়ে বুদ্ধদেব স্মৃতিচারণা করেছেন 'আমার যৌবন'-এঃ-

"আমি চেয়েছিলাম পুরোদস্তর মঞ্চোপযোগী হতে। মেনে নিয়েছিলাম শ্যাম বাজারিক সব বিধি বিধান। পাঁচ অঙ্ক, গর্ভাংক, সখীবৃন্দ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নৃত্যগীত – কিছুই আমি উপেক্ষা করিনি। সরমা আছেন সীতা দেবীর সান্ত্বনাদাত্রী, বারণের সমালোচক আছেন বিভীষণ, অশোক বনেও রাবণের সভায় – মঞ্চসজ্জার অবকাশ আছে। সবই বলা যায় গতানুগতিক – আমার নতুনত্ব শুধু এইটুকুই যে, আমার রাবণ পুরোপুরি একটি দুরাত্মা নন, সীতাকে হরণ করে এখন চান হৃদয় দিয়ে তাঁকে জয় করতে – তাঁর মনের একটি অংশে তিনি ভাবপ্রবণ।"

এই প্রথাচ্যুত রোমান্টিক রাবণকে গ্রহণ করলেন হারান ঠাকুরদা – তিনি তখন স্টার ছেড়ে দিয়ে নতুন খুলেছেন নাট্য নিকেতন – মহড়া থেকে পোস্টার পর্যন্ত এগিয়ে গেলো আমার নাটক, আমি মনশ্চক্ষে দেখলাম একটা টাকার থলি শূণ্যে ঝুলছে আমার জন্য। আর তারপর মাসের পর মাস যদিও কেটে কেটে যায়, অন্য নতুন নাটকের উপর পর্দা ওঠে আর পর্দা পড়ে – 'রাবণ'র উদ্বোধন রজনী আর আসে না। ঠাকুরদা মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হবে হচ্ছে করেন, আর বলেন, বুঝলে হে, আমরা হলাম জ্ঞানপাপী আমার নাটকের প্রসঙ্গে যার অর্থ আমি ভেবে পাই না। গুজব শুনি আমার সংলাপে আপত্তি করছেন প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা ...। অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যিনি বিভীষণের ভূমিকা নেবেন কথা ছিলো, আমার প্রতি স্পষ্টত যিনি সহৃদয়, তিনিও একদিন বললেন, আমার ভাষা আর একটু রিমোট হলে ভালো হোতো – আমি বুঝে নিলাম, রাবণ সীতার মুখে সমকালীন চলতি ভাষা বসানো আমার ভুল হয়েছিলো। অগত্যা আমি পাণ্ডুলিপিটির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলাম – তাতেও ব্যর্থ হতে হলো।"

(আমার যৌবন – অধ্যায় ২৮)

রাবণের আগে লেখা একটি নাটক আছে বুদ্ধদেবের। 'একটি মেয়ের জন্য' রচনাকাল ১৯২৭। ১৯৩২ – এ গ্রন্থকারে প্রকাশিত। ঢাকায় ছাত্র থাকা কালে জগন্নাথ হলে এটি অভিনীত হয়। আমার যৌবন এ এই নাটক সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, -

"পুরানা পল্টনে আমার একটি সদ্য যৌবনা প্রতিবেশিনীকে আমি ভালোবেসেছিলাম – বিনা বাক্যালাপে, শুধু রাস্তার এপারে ওপারে চোখের দেখা দেখে। সেই মাত্রা স্পর্শহীন প্রণয়ের বেদনা প্রকাশ করেছিলাম কংসাবতীর দু'একটি কবিতায় – এবং একটি ইচ্ছাপূরণকারী একাঙ্ক নাটকে, যার শিরোনাম ছিল 'একটি মেয়ের জন্য' আর বিষয় ছিল একটি মেয়ের স্বপ্রেমিক গৃহত্যাগ। ঠিক সেই দিনেই, যেদিন তাকে মামুলি প্রথায় কনে দেখবার আয়োজন চলছে বাড়িতে। কন্যার পক্ষে পিতাটির উদ্দেশ্যে স্বভাবতই কিছু বিদ্রুপ ছিলো, নায়ক নায়িকা নিভৃত সাক্ষাতে চুম্বন যোগও ঘটিয়েছিলাম। গুরুজনবর্গের পক্ষে ঠিক মনোরঞ্জনী ঘটোনা বলা যায় না। কিন্তু তবুও আমাকে বিস্মৃত ও পুলকিত করে – অধ্যাপক রমেশ মজুমদার – আমার লেখাটা কে অনুমোদন করলেন, জগন্নাথ হলে অভিনয়ের জন্য...পরের বছর আমার আর একটি একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ হলো, জগন্নাথ হলে, আমার আঙুলে জাগল নাটক লেখার চুলকোনি।" – এসবই রাবণ রচনার আগের কথা। রাবণ রচনার সময়ে আর একটি নাটক লেখা হয়েছিল 'অনুরাধা'। ১৯৩৬ - এ। চট্টগ্রামের পাঞ্চজন্য পত্রিকার ১৩৩৯ এর শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হয় 'অতীতের ছায়া' নামক নাটক। এর পর কার্তিক ১৩৪৩ – এর মৌচাক পত্রিকায় রাম-রাবণের যুদ্ধ নামক একটি নাটক মুদ্রিত হয়। ১৩৪৮ এ কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত বৈশাখীতে ছাপা হয় 'কাঠঠোকরা' নামক একটি নাটক। এবং বুদ্ধদেবের কালো হাওয়া উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া হয়। ১৯৪৪ - এ মায়ামালঞ্চ নামে মুদ্রিত হয়, সে নাটক। কিন্তু এসব কাজ নাট্যকার বুদ্ধদেবের অনুশীলন পর্বের।

এরপর নাটক নিয়ে বুদ্ধদেবের কোন কাজ দেখা যাচ্ছে না। এই প্রয়াসের ২২ বছর বাদে কবি আবার নাটক রচনায় হাত দিলেন। লিখলেন – তপস্বী ও তরঙ্গিনী। ১৯৬৬। বুদ্ধদেবের জীবনী সূত্রকার সমীর সেনগুপ্ত বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ –

"এই ১৯৬৬ সাল থেকে বুদ্ধদেবের জীবনে- বহিরঙ্গে ও অন্তর্জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল। ...পরিবর্তন ঘটলো তাঁর অন্তর্জীবনেও। এই সময় থেকে নাটক লেখার কাল আরম্ভ হল। এর আগে যে সব নাটক লিখেছেন তাঁর সঙ্গে এখনকার নাটকগুলির মৌলিক পার্থক্য আছে। আগেকার নাটক – যেমন অনুরাধা, মায়ামালঞ্চ – সেগুলি লিখেছেন নাটক হিসেবেই, যাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল নাটকীয়তা এবং অভিনয় যোগ্যতা। লিখেছেন, একই সঙ্গে সে নাটকের মহরা চলছে। লিখতে লিখতে বদলেছেন, সে সব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হয়তো কোন কথোপকথন কে বিশেষ কোন অভিনেতার সুবিধার কথা ভেবে বদলে দেওয়া।

কিন্তু এই সময় থেকে, তপস্বী ও তরঙ্গিনী থেকে তাঁর নাট্যরচনার যে পর্যায় শুরু হল। সেখানে দেখতে পাচ্ছি মঞ্চযোগ্যতায় তাদের একমাত্র গুণ নয়। নাটকের ফর্মটি ব্যবহার করে কাব্য-রচনা এবং পুরাণের পুর্ণজন্মদান – এই দুটি এই পর্যায়ের নাটকের আসল লক্ষ্য" (বুদ্ধদেব বসুর জীবন – বিকল্প, প্রকাশনী ১৯৯৮/ পৃ- ৩৪7-৪৮)

তপস্বী ও তরঙ্গিনী – পত্রিকায় প্রকাশ কালে এটি ছিল তিন অঙ্কের নাটক। গ্রন্থবদ্ধ করার সময় আকৃতিতে বড় রকমের রদবদল না করেই নাটকটিকে চার অঙ্কের বিন্যাস দিয়েছেন। নাটকটি রচনার প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কে স্মৃতিচারী বুদ্ধদেব লিখেছেন – 'ঐ নাটককেও কাব্য জাতীয় রচনা বলে ধরে নিচ্ছি – সেটা আমি লিখেছিলাম ৫৮ বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবেমাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি – এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পতিতার বাইরে কিছুই জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপটে। গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত এ সবই আমায় কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন, রূপ কল্পের আভাস জুগিয়ে ছিল এলিয়টের মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখের প্রথম দুটো লাইন – সে দুটি দিয়েই তপস্বী ও তরঙ্গিনীর আরম্ভ, যদিও সাত মাত্রা ছন্দ ও

প্রথম দুটো শব্দ ছাড়া আদি লেখনের আর কিছুই সেখানে রক্ষিত হয়নি।' (কবিতার শত্রু মিত্র – এম. সি. সরকার)

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকটির কাহিনি উৎস নিহিত আছে পুরাণ, সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধজাতক কাহিনিতে। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা পাঠ করে কৈশোরে প্রথম এই কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হন বুদ্ধদেব। তারপর কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের কাহিনি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে শুরু হয় অনুসন্ধান গবেষণা ও নতুন কিছু রচনার প্রয়াস। এছাড়া – Jessie Weston রচিত From Ritual to Romance বইটির থেকেও তিনি ঋণ গ্রহণ করেছেন।

রামায়ণের বালখন্ডে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি আছে। মহাভারতের 'বনপর্বে'র ১১১ সংখ্যক অধ্যায়ে এই কাহিনির উল্লেখ দেখা যায়। বুদ্ধজাতকেও ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির ব্যবহার আছে। অলম্বুষা জাতক ও নলিনিকা জাতকে অবিকল মহাভারতের মতো কাহিনি না হলেও ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যানাশের জন্য ইন্দ্র দ্বারা রমণী প্রেরণের কথা আছে দুটি জাতকেই। অলম্বুষা জাতকের নারীর নাম অলম্বুষা। সে অপ্সরী। আর নলিনিকা জাতকের নারীর নাম নলিনিকা- সে রাজকন্যা।

From Retual to Romance গ্রন্থে যে Jessie Weston প্রাসঙ্গিকভাবে মহভারতের ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় 'The Freeing of waters'- এর কাহিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবের নিজের গল্পের মিল অনেক বেশি। বরং মহাভারতের কাহিনির থেকেও বুদ্ধদেব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন এই গ্রন্থকে। রাজ্যে অনাবৃষ্টি, নারী সম্পর্কে অজ্ঞান ব্রহ্মচারীকে নারীর ছলনায় বিভ্রান্ত নগরীতে নিয়ে আসার কল্পনা – এসব মহাভারতের মতো হলেও মিস্ ওয়েস্টন বর্ণিত কাহিনিতে আছে বৃদ্ধা গণিকা কার্যসিদ্ধি ঘটলেন কিছু সুন্দরীর সাহায্যে নয়, তাঁরই সুন্দরী ও স্বৈরিণী কন্যার সাহায্যে। Weston লিখেছেন –

'An old woman who has fair daughter of irregular life, under takes the seduction of the Hero.' 'পতিতা' কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ একজন নারীর দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গের কথা বলেছেন। অথচ মহাভারতে আছে অনেক নারীর

প্রসঙ্গ। কিন্তু কোথাও সেই স্বৈরিণী নাম – চিহ্নিত নয়। বুদ্ধদেব এই নারীর নাম দিয়েছেন তরঙ্গিনী। তিনি এই নাম কোথায় পেলেন এ সম্পর্কে কোথাও কোন মন্তব্য করেন নি। এ সম্পর্কে একটি ব্যাপার ভাব যেতে পারে, ১৯১১ তে প্রকাশিত 'সাহিত্য' পত্রিকার একুশ বর্ষ বৈশাখ ১৩১৮ সংখ্যায় একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল' কবিতাটির নাম 'স্পর্শমণি'। রচনাঃ- মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ। বসুমতী সংস্করণের শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ এর কাব্যানুবাদ করে একদা প্রশংসিত এই কবি। কবিতাটির বিষয় একটি বৌদ্ধ কাহিনি। উৎস – অবদান শতক। কবিতাটির বিষয় হলো – এক নটী শাক্যমুনি বুদ্ধদেবকে কামনা করেছিল তাঁর নাম পুষ্পশ্রেণী। কিন্তু বুদ্ধদেবের সংসর্গে এসে এসে যে বদলে গেলো, তাঁর বিলাসশয্যা বদলে ফেলে সে নালন্দা বিহারে চলে এলেন তপস্বিনী বেশে। তাঁর বিলাসব্যসনের বর্ণনায় কবির ব্যবহৃত শব্দমালায় পাই –

'ছুটি গেল দ্রুত বেগে
উচ্ছ্বসিত রূপ তরঙ্গিনী'

আর তার সন্ন্যাসিনী বেশের বর্ণনায় আছেঃ-

'নালন্দা বিহার মুখে
নতনেত্রে নব তপস্বিনী'

এই কবিতা বুদ্ধদেবের কৈশোর সময়ের পত্রিকায় বুদ্ধদেব পড়ে ছিলেন কিনা জানি না, হয়তো পরবর্তীকালে 'সাহিত্য' পত্রিকার এই পুরাতন সংখ্যা কখনও বহুপাঠী বুদ্ধদেবের নজরে পড়তে পারে। হয়তো কবিতাটির শব্দ প্রয়োগ তাঁর অবচেতনে ছিল এবং তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের বিষয়বস্তুর সঙ্গে একটি ভাবগত ঐক্য আছে। ফলে নাটকের নায়িকার নাম নির্বাচিত এই কবিতার পরোক্ষ কোনো প্রভাব মনে চলে আসতে পারে।

এই নাটকেরই বিষয় নিয়ে বুদ্ধদেবের একটি কবিতা আছে 'মরচে পড়া পেরেকের গান' নামক কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায়। তপস্বী ও তরঙ্গীণীর প্রকাশের বছরেই (১৯৬৬) এই কাব্যটিও প্রকাশিত। 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' বুদ্ধদেব বসুর প্রথম নাটক যা কবিতায় বা কথা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির সমকক্ষ। পূর্ণাঙ্গ, অভিনয়যোগ্য ও শিল্পমূল্যে উজ্জ্বল এই নাটকের পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর মধ্যে তিনি সঞ্চার করেছেন আধুনিক মানুষের

দ্বন্দ্ববেদনা ও রোমান্টিক আবেগ। লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পূণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো – তপস্বী ও তরঙ্গিনীর মূল বিষয়।

বাবু ও বিবি (১৯৬৬)-

এই দীর্ঘ একাঙ্কিকা। এক বামন দম্পতির অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনি। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় বামনবিবির উচ্চতা ও শরীরবৃদ্ধির ফলে বামন বাবুর সঙ্গে তার মানস দূরত্ব বৃদ্ধির ইতিকথা দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে। এই দূরত্ব ও জটিলতা শেষ অবধি বামনের আত্মহত্যায় গিয়ে থামে নাটকের অন্তিমে।

পাতা ঝরে যায় এই বছরের(১৯৬৬) –

আর একটি একাঙ্কিকা। উচ্চমধ্যবিত্ত এক দম্পতির নিঃসঙ্গ ও বিষন্নতার কথা এ নাটকের বিষয়। পুত্র ও কন্যা উচ্চশিক্ষিত এবং দূর প্রবাসী। কেউ দিল্লী কেউ আমেরিকার অধিবাসী। এখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা – কোলকাতার উপকণ্ঠে বসবাস করেন গভীর নৈঃসঙ্গের মধ্যে। ৬০ এর দশকে যে পারিবারিক সমস্যা শুরু হয়েছিল এখন তা আরো মারাত্মকভাবে সত্য। আধুনিক জীবনের এই অব্যর্থ অসুখের স্বরূপ দেখা দিয়েছিল 'পাতা ঝরে যায়' নাম যুক্ত নাটকের মধ্যে।

সত্যসন্ধ (১৯৬৭) –

এই একাঙ্কিকার বিষয়বস্তুও আধুনিক শিক্ষিত নাগরিক জীবন। নায়ক জয়ানন্দ দীর্ঘদিন উচ্ছল স্বাধীন ও সচ্ছল জীবন কাটাবার পর বিয়ে করে ঊর্মিলাকে। তারপরই তার মনে হতে থাকে ১৯ বছরের এই নারীটার কাছে সে বাধা পড়ে যাচ্ছে। তার এই আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে সে একদিন বালিশ চাঁপা দিয়ে হত্যা করে উর্মিলাকে। পুলিশে জবানবন্দি দেয়। কিন্তু আদালত তাকে বেকসুর মুক্তি দেয়। কারণ জয়ানন্দের স্বীকৃতি কথা ও আচরণে ফুটে ওঠে অস্বাভাবিকতা। অ্যাবনরম্যলিটি। আসলে আদালতের দেয়া মুক্তি বড় কথা নয়। জয়ানন্দের পরবর্তী জীবন ক্রমশ তাঁকে ভারাক্রান্ত ও দুর্বহ করে তুলল। আধুনিক নাগরিক জীবনের এই স্ববিরোধ ও যন্ত্রণা নাটকটির কারুণ্যকে ঘণীভূত করেছে।

কোলকাতার ইলেকট্রা (১৯৬৭, গ্রন্থাকারে ১৯৬৮)-

গ্রিক মিথের এগামেনন ও ক্লাইতেমনেস্ট্রার কন্যা ইলেকট্রা। সে তার ভাই ওরেস্টেসকে প্ররোচিত মা ক্লাইতেমনেস্ট্রা ও তার প্রেমিককে হত্যা করতে। কারণ ক্লাইটেমনেস্ট্রা হত্যা করেছিল এগামেননকে। কোলকাতার নাগরিক জীবনের জটিলতায় এই গ্রীক কথা-সূত্রকে যুক্ত করে দেখার বাসনায় নাটকের এরকম নাম ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্রনাথের স্ত্রী মনোরমা। ইন্দ্রনাথ সৈন্যবাহিনিতে চলে গেলে তাঁকে দেহে মনে আশ্রয় ও সুস্থতা দেয় অজেন। দুজনের বিবাহের সিদ্ধান্তের সময় ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। এবং মনোরমা ও অজেনের চক্রান্তে হিংস্র দাঁতালো জন্তুর দ্বারা নিহত হয়েছে ইন্দ্রনাথ। মেয়ে শম্পা এই দৃশ্য সচক্ষে দেখেছিল। শম্পার মানসিক যন্ত্রণায় মিশে যায় গ্রীক মিথের অনুষঙ্গ। আধুনিক জীবনের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও ছুঁয়ে আছে এই নাটক।

চরম চিকিৎসা(১৯৬৮) –

সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পন্ডিত অধ্যাপক এবং আদালতের বিচারক যে রায় দেন, তা যে কত হাস্যকর তা বোঝবার জন্যই এই প্রতিবাদী শেষাত্মক একাঙ্কিকা রচনা করেছেন বুদ্ধদেব। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই বছরেই সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’ অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হলে বুদ্ধদেব কোর্টে সাক্ষী দেন বইটি আদৌ অশ্লীল নয় বলে। আর পরের বছর ১৯৬৯ সালে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয় রাত ভরে বৃষ্টি(১৯৬৭)। তাই নাটকের বক্তব্যে যে, শ্লেষ ও বিদ্রুপ আছে, তার সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের ক্ষোভ ও অভিযোগ মিশে আছে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় তাঁর গল্প সংকলন ‘এরা আর ওরা এবং আরও অনেকে’র জন্য ১৯৩৩ –এ তিনি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

কালসন্ধ্যা (১৯৬৯) –

দেশ পত্রিকায় ২২জুন থেকে ৫ অক্টোবর ১৯৬৮ তে প্রকাশিত হয়। নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৭-৬৮। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে নাটকটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আকাশবাণীর নিখিল ভারতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল ২৫ এপ্রিল ১৯৬৮। মহাভারতের মৌষলপর্বের কাহিনির নিয়ে লেখা হয়েছে এই দুই অঙ্কের নাটক। এর

সঙ্গে কবি শ্রীমদ্ভাগবৎ ও বিষ্ণু পুরাণের কৃষ্ণকাহিনীও কাজে লাগিয়েছেন। কৃষ্ণবংশধবংসের এই কাহিনীর একটি বৌদ্ধ প্রকারণ এবং জাতক পর্যায়ে ঘটজাতকের সঙ্গেও এর এক সাযুজ্য আছে। তবে বুদ্ধদেব জানান, 'সাধারণত শিথিল গঠন জাতক পর্যায়ে ও এই জাতকটি বিশেষভাবে অসংলগ্ন। এছাড়া এই নাটকে গ্রীক নাট্যকার এস্কাইলাস এর 'মোবাই এর বিরুদ্ধে সাতজন' (অনুবাদ করা নামটি বুদ্ধদেবেরই) নাটকটিরও প্রেরণা আছে বলে বুদ্ধদেব নিজে স্বীকার করেছেন। তবে গ্রীক নাটকে অয়দিপাউস এর দুই পুত্রের মধ্যে রাজত্ব লাভের জন্য হিংসা ও আক্রোশের যুদ্ধ ও ধ্বংস এসেছে। কিন্তু দ্বারকায় কৃষ্ণবংশে নির্মম ও ক্ষমতাকামী মানুষের দ্বন্দ্ব অসংখ্যা মানুষের মধ্যে।

মহাভারতের মুষল পর্বে যাদব কুলের ধবংসের পটভূমি 'কালসন্ধ্যা' নাটকের উপজীব্য। ১৯৬৯ –এর পটভূমিতে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে সিঁদুর মেঘের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল যতদূর মনে হয় বুদ্ধদেব তাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই নাটকের আবরণে।

প্রথম পার্থ(১৯৭০)-

মহাভারতের কাহিনি নিয়ে বুদ্ধদেবের আর একটি কাব্য নাট্য। এখানেও বুদ্ধদেব ঘটিয়েছেন পুরাণের পুর্নজন্ম। এ নাটক রচনায় মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের কাহিনি ছাড়াও বুদ্ধদেব প্রাণিত হয়েছেন রবীন্দ্রয়ান্থের 'কর্ণকুন্তি সংবাদ' এলিয়টের মার্ডর ইনদি ক্যাথিড্রাল এবং মিল্টনের সামসেন এগনিষ্টস এর দ্বারা।

মহাভারতের কর্ণ এই নাটকের নায়ক। দ্রৌপদীকে ঘিরে তার মনের গোপন ইচ্ছা ও দ্রৌপদীর অপমানের জন্য নিভৃত বিষাদ যা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেননি, বুদ্ধদেব সংলাপে এ নাটকে ব্যবহার করেছেন। এই নাটকের উপস্থাপনায় বৃদ্ধদের সংলাপে এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল এর প্রকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। এই বৃদ্ধেরা যেন টমাস বেকেটের একক দৃঢ় সিদ্ধান্তের অবিচলতা থেকে তাকে ভ্রষ্ট করার জন্য এরা নানভাবে চেষ্টা করলেও সত্যরক্ষায় অটুট থাকে তার মৃত্যু সংকল্প। মৃত্যুর মূল্যে বেকেট পেতে চেয়েছিলেন তার ঈশ্বরকে। এ নাটকে কর্ণও সব ত্যাগ করে মৃত্যুকেই বেছে

নিতে চেয়েছে। নিজের সত্যে অবিচলতা ও প্রলোভন জয়ে কর্ণ এলিয়টের স্যামসন এরও স্বগোত্রীয়তা অর্জন করে এইভাবে।

পুনর্মিলন(১৯৭০)-

১৯৬৯ এর শারদীয় দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেবের নাটকের ধারায় আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে 'পুনর্মিলন' নাটকটি একটু স্বতন্ত্র। এ নাটকের সংলাপে গদ্য শৈলী ব্যবহৃত। এবং নাটকটির কোনো অঙ্কবিভাগ পরিকল্পিত হয়নি। বাস্তব পৃথিবীর লোভ রিরংসা ও হিংসা প্রতিহিংসার সূত্র ধরে যে হত্যা মৃত্যু ও অপঘাত মৃত্যু ঘটে তার পরিণাম নিয়ে লেখা এই নাটকে মৃত্যুর পরপারের দৃশ্যভাবনায় সংকেতময় করতে চেয়েছেন নাট্যকার। পুনর্মিলন আসলে বাস্তবে নয়, মৃত্যুর পরলোকে, প্রেতলোকে। প্রায় অবিশ্বাস্য অলৌকিক বাতাবরণে রচিত এই নাটকে বুদ্ধদেবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তেমন পরিস্ফুট হয়নি।

অনাম্নী অঙ্গনা(১৯৭০) –

কাব্য নাটকটির কাহিনির উৎসও মহাভারতের আদিপর্ব। বিদুরের জন্ম বৃত্তান্ত এ নাটকের উপজীব্য। দেশ পত্রিকায় প্রকাশের সময় অনাম্নী অঙ্গনায় যে পাঠ ছিল গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তার অনেকটা বদল লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনির সূত্র বুদ্ধদেব তাঁর নাটকের মূল ঘটনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সত্যবতীর নির্দেশে দ্বৈপায়ন ব্যাস বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বা ও অম্বালিকার ক্ষেত্রে সন্তান দিতে এলে এক নামহীনা দাসীকে অম্বালিকা তার কাছে প্রেরণ করেন। সেই নামহীনার গর্ভে জন্মান মহামতি বিদুর। মহাভারত সে নারীর নাম অবধি রাখেনি। বিদুর জননী সেই দাসীকে অঙ্গনা নামে পরিচিত করেছেন বুদ্ধদেব এই নাটকে। তার যৌবন স্বপ্নে পুরুষ দ্বৈপায়নের শরীরে উপস্থিতি কীভাবে তাকে পূর্ণতার সন্ধান দিল নাটকের উপজীব্য তাই। এই নাটকেও কোথাও দৃশ্য বিভাগ নেই। এবং নেই কোনো পুরুষ চরিত্রও। আর সংলাপ রচিত হয়েছে অসাধারণ গদ্যছন্দের কাব্য-গাম্ভীর্যে।

নেপথ্য নাটক(২০০০)-

১৯৭০ –এর শারদীয় দেশ এ প্রকাশিত হয়। এই নাটকের বিষয়বস্তু আসলে সমকালে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুঃসময়। যেখানে মানুষের নিরুপদ্রব জীবন জাপনের স্বপ্ন টুকরো টুকরো হচ্ছে রাষ্ট্রিক সন্ত্রাস, গুপ্ত হত্যা, বোমা ও গুলির শব্দে।

কিন্তু এর মধ্যেই কি সমাপ্ত হবে সভ্যতা? অপরেশ মজুমদার – এই নাটকের এক বিবেকী চরিত্রের প্রশ্ন তাই – 'কিন্তু হতে কি পারে না? হঠাৎ একদিন নতুন করে ... ।আরম্ভ?' এই প্রশ্ন বুঝি নাট্যকারেরও মনের গভীরের।

কুড়ি বছর আগে অথবা পরে (১৯৯১) –

শারদীয়া 'সুন্দরী' পত্রিকায় ১৯৭০ – এ প্রকাশিত হয়। আসলে এই একাঙ্কিকার আর একটি পার্ট পাওয়া গেল, পরের বছর(১৯৭১) কলকালা পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। তখন এর নাম দেওয়া হয় ২৫ বছর পরে অথবা আগে।

আধুনিক নরনারীর কামনা বাসনা প্রেম প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা এই একাঙ্কিকা। বিজনের স্ত্রী উর্মিলার জীবনে চিন্ময়ের আবির্ভাব ও মিলন ও বিচ্ছেদের দীর্ঘ ২৫ বছর পরে দুজনের সাক্ষাৎ ও স্মৃতি রোমোন্থনের নাটকীয়তার মধ্যে পারস্পরিক মানস জটিলতার স্বরূপ সুন্দরভাবে ধরা হয়েছে এ নাটকে।

হিতাকাঙ্খী- (১৯৯১) –

১৯৭১ –এর শারদীয়া মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত একাঙ্কিকা। এক ছাত্র ও শিক্ষকের সংলাপে লেখা এই একাঙ্কিকা শিল্প হিসাবে তেমন উজ্জ্বল নয়।

সংক্রান্তি(১৯৭৩)-

১৯৭১ এর শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত কাব্যনাট্য। মহাভারতের শল্যপর্ব নিয়ে রচিত এই নাটকটিই বুদ্ধদেবের শেষ মৌলিক কাব্যনাটক। মহাভারতে যুদ্ধের শেষ দিনের কাহিনি এই নাটকের উপজীব্য। নাটকটির সূচনা সেই ভোরবেলা। যেদিন মৃত্যু হবে দুর্যোধনের। আবার দুর্যোধন বধের প্রেক্ষাপটে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে এই নাটকে। দুর্যোধনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ পুত্র স্নেহ, গান্ধারীর জীবিত ও পাপী পুত্রের প্রতি ঘৃণা এবং মৃত প্রাণাধিক প্রাণ পুত্রের প্রতি

অনির্বচনীয় স্নেহের জটিল মনস্তত্ত্ব দক্ষতার সঙ্গে বিধৃত। সংক্রান্তি কাব্যনাট্যে মহাভারতের যুদ্ধে দুর্যোধনদের প্রতি পান্ডবেরা যে অন্যায় করেছেন – এ প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিতে গুরুত্ব দিয়েছেন নাট্যকার। ধৃতরাষ্ট্র বলেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের মৃত্যুর মধ্যে পান্ডবদের চূড়ান্ত অনৈতিকতা ছিল; উত্তরকালের কুরু বংশের কাহিনি সঙ্গে ভূমণ্ডলে কে না বলবে শৌর্যের নয়, বিক্রমে নয়, পৌরুষের নয় – পান্ডবেরা ছলনায় ছিল দক্ষতর, নৃশংসতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মহাভারত কথা নিয়ে গভীর গবেষণারত বুদ্ধদেবের কাছে মহাভারতের এই নিরপেক্ষ সমালোচনা উত্তরকালের গবেষণায় অন্যতর অভিমুখ খুলে দিতে পারে।

নাট্যকার বুদ্ধদেবের দুটি অনূদিত নাটক আছে – ১) প্রায়শ্চিত্ত, ২) ইক্কাকু সেন্নিন।

প্রায়শ্চিত্ত(১৯৭৩) –

গ্রন্থকারে প্রকাশের আগে ‘কল্পবাণী’ পত্রিকায় ১৯৭০ –এ প্রকাশিত হয়েছিল প্রায়শ্চিত্ত আসলে ইয়েটস্ –এর পারগেটরি নাটকের অনুলিখন। আঙ্গিকে কাব্যনাট্য এই রচনায় ইয়েটস্ এর পারগেটরির অনুবাদ করেননি বুদ্ধদেব। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো –

১) কিঞ্চিৎ ২০০ টি পংক্তির মধ্যে ট্র্যাজেডিকে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাট্যকলার সেই অপূর্ব নিদর্শনে কোন ব্যাখ্যা জুড়তে আমার মন সরলো না, - সেইজন্য এটিকে স্থাপন করলাম ভারতবর্ষের বাদশাহী আমল ও সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায়।

২) প্রায়শ্চিত্ত ঠিক অনুবাদ নয়, অনুলিখন। ইয়েটস্ এর আঁটো, ঘন মিতকথন শৈলীকে সম্মান জানিয়ে আমি প্রতিটি ভাষণে – পঙক্তি সংখা মূলের ঠিক সমান রেখেছি, কিন্তু প্রতিটি বাক্যের অনুসরণ করিনি – কিছুটা ছন্দ সৌজন্যের তাগিদে আক্ষরিক আনুগত্য ছেড়ে শুধু ভাবার্থটুকু গ্রহণ করেছি।

ইক্কাকু সেন্নিন(১৯৭৩) –

কলকাতা পত্রিকায় ১৯৭১ এ মুদ্রিত হয়েছিল জাপানি কবি কোম্পারু জেনপো (১৪৫৩-১৫৩২) র নাটক অবলম্বনে রচিত ইক্কাকু সেন্নিন আসলে যতটা অনুবাদ নাটক তাঁর চাইতে অনেক বেশি অনুসৃত নাটক। এ জন্য বুদ্ধদেবকে সাহায্য নিতে হয়েছে তিনটি প্রাসঙ্গিক রচনার ।

১। রোমান হরফে লেখা মূল জাপানি

২। ইকাক্কু সেন্নিনের একটি পঙক্তিনিষ্ঠ আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ।

৩। ...আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদের একটি কাব্যিক পুনর্লিখন।

উল্লিখিত এই নো নাটক বাদে একটি প্রাচীন নো নাটক ও একটি কাবুকি নাটকের প্রসঙ্গ বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন মুখবন্ধে। যেখানে ভারতীয় পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্র ও সেই সংক্রান্ত ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু নাম জানা ছাড়া ওই দুটি বই পড়া সম্ভব হয়নি বুদ্ধদেবের পক্ষে। তবে ভারতীয় পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির উৎস থেকেই যে এই নো নাটক গুলি লিখিত এ বিষয়ে কোন সন্ধেহ নেই। বুদ্ধদেব বলেনঃ 'ইক্কাকু সেন্নিন' থেকেইও বোঝা যায়, হিম দেশ বাসী কিমোনো পরিহিত সাকে পায়ী কবিরা, তাঁদের সিন্তো ও zen প্রসূত মানসতা হিন্দু রস বস্তুকে কেমন চমকপ্রদ নতুন রূপে সাজিয়ে ছিলেন। কিন্তু শুধু রূপান্তর নয়, এটা কে জন্মান্তর বললেও অনুক্তি হয় না।'

ইক্কাকুকে সুন্দরী – নারী সেন্দাকে পাঠিয়ে রাজা যেভাবে বলহীন ও মহিমাচ্যুত করেছেন, সেই প্রয়াসেই ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র ধ্বংস করেছে। কিন্তু উভয় দেশের দর্শন অনুয়ায়ী পার্থক্যও কম নেই।

ইক্কাকুর পতন তাকে শক্তিহীন ও বিধ্বংস করেছে। আর ঋষ্যশৃঙ্গ পেয়েছেন উজ্জ্বল উদ্ধার। তপস্বী তরঙ্গিণীর পাঁচ বছর পরে লেখা ইক্কাকু সেন্নিনে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির গভীরতা ও ব্যপ্তি নেই। জাপানী এই নো নাটকের বিষয়বস্তু যদি ঋষ্যশৃঙ্গের আর্কিটাইপের থেকে ঋণ নিয়েও থাকে তবুও বলা যায় আদি কাহিনির মহিমার ধারে কাছেও যেতে পারে নি উত্তর কালের গল্পটি।

বুদ্ধদেব এই দুটি কাহিনিকে তাঁর দুটো নাটকে ব্যবহার করলেও শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে তপস্বী ও তরঙ্গিনীর দর্শন অনেক বেশি গভীর, ট্র্যাজিক মহিমায় উন্নীত। এই দুটি অনুবাদ নাটক ছাড়া ১৯৪৪ এর দিকে নিজের উপন্যাস – কালো হাওয়া - র একটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন মায়ামালঞ্চ নামে। এবং তা ৩ এপ্রিল ১৯৪৩ শ্রীরঙ্গমে অভিনীত ও হয়েছিল।

নাটক রচয়িতা বুদ্ধদেবের নাট্যমঞ্চভাবনা নিয়ে একটু কথা বলা প্রয়োজন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ঢাকার জগন্নাথ হলের ছাত্রাবাসে তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হবার সময় থেকেই বুদ্ধের মঞ্চ সচেতন মন নিয়েই নাটক লিখেছেন, একাধিক নাটকের পাঠান্তর ঘটানোর মূলেও এই মঞ্চ সচেতনা ক্রিয়াশীল। তাছাড়া নাট্যচিন্তার সামগ্রিক প্রতিফলন তাঁর নাটকের চরিত্র সংলাপ ও দৃশ্য পরিকল্পনায় ছড়ানো আছে। এ ব্যাপারে তাঁর সংবেদনশীল মনের পরিচয় বহন করে তপস্বী তরঙ্গিনীর নাট্য পরামর্শের অংশ। আর নাটকের ব্যবসায়িক দিকটা নিয়েও যে এই রুচিমান নাট্যকার ভাবিত ছিলেন তাঁর প্রমাণ বহন করে তাঁর মেয়েকে লেখা একটি চিঠি –

‘হঠাৎ একটা নাটক লেখায় হাত দিয়েছি – দুটো অঙ্কের খসড়া তৈরি হয়েছে। আর এক অঙ্ক হলে শেষ হয়, কিন্তু সেটাই সব থেকে শক্ত। লিখি আর ভাবি। কি হবে? হয়তো অভিনয়যোগ্য হবে না, বই বেরোলেও বিক্রি হবে।’ (চিঠি, কন্যা রুমিকে ১৯৬৬, ১২ই ফেব্রু)

এই চিঠি লেখার পরও কিন্তু বুদ্ধদেব নাটকের জন্য প্রায় পাঁচ/ছয় বছর কাজ করেছেন। নাটক নিয়ে এবং ‘দৃশ্যকাব্য’ নাটক’কে সুখপাঠ্য করে শ্রুতিগ্রাহ্যতা দানের জন্য একনিষ্ঠ কবি-কর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন আমৃত্যু পরীক্ষণমুখী

৮.৫ অনুশীলনী

১) কাব্যনাটক কী ও কেন? কাব্যনাটকের প্রকৃতি আলোচনা কর।

২) বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনা কর।

৩) কাব্যনাটকের বুদ্ধদেব বসুর অনুপ্রেরণা ও বির্নিমাণের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪) নাট্যকার হিসেবে কাব্যনাটক ছাড়া অন্যান্য নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচনা কর।

৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাটকের বিবর্তন – বৈদনাথ শীল।

২) বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার – কমলেশ চট্টোপাধ্যায়।

৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক – পুলিন দাস।

৪) তপস্বী ও তরঙ্গিণী – লায়েক আলি খান।

৫) বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী তরঙ্গিনী – ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য।

একক ৯- তপস্বী ও তরঙ্গিনী পুরাণের পুনর্জন্ম, সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব

বিন্যাসক্রম

৯.১ নাটকের উৎস ও অনুষঙ্গ

৯.২ পুরাণের পুনর্জন্ম

৯.৩ নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ অনুসারে সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব

৯.৪ অনুশীলনী

৯.৫ উপসংহার

৯.১ নাটকের উৎস ও অনুষঙ্গ

বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিনী কাহিনির মূল নিহিত আছে পুরাণ, সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ জাতকের কাহিনিতে। কালীপ্রসন্ন তাঁর অনূদিত মহাভারতেও বিস্তৃত আকারে এই কাহিনির উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পতিতা কবিতায় দিয়েছেন আর নতুন ব্যঞ্জনা। এছাড়াও বুদ্ধদেব Jessie Weston রচিত From Ritual to Romance বইটির সাহায্যও নিতে পারেন। এই বইটি যে বুদ্ধদেবের সংগ্রহে ছিল তাঁর প্রমাণ কন্যা রুমি(দময়ন্তী) কে লেখা একটি চিঠি যাতে কবি লিখেছেন 'শোনো Lin Yu Tang' এর "Wisdom of India and China" আর Jessie Weston এর 'From Ritual to Romance' এ দুটো বই আমার দরকার, তোকে দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে – এবারে আসার সময় নিয়ে আসিস।" (চিঠি - ১৯/৪/৬৮) এ চিঠি মহাভারতের কথা লেখাকালীন। কিন্তু আগে যে নাটক লেখার সময় বইটি তাঁর সংগ্রহে ছিল এ খবর মেলে এখানে।

রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ-এর কাহিনির উল্লেখ আছে। রাজা দশরথকে পুরাণে বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি শুনিয়েছিলেন সারথী ও মন্ত্রী সুমন্ত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তাকে নিয়ে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সুমন্ত্রের কাছ থেকে দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের যে কাহিনি শুনেছিলেন –

রাজা লোমপাদ ছিলেন অঙ্গদেশের রাজা। রাজ্যে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে তার থেকে মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গকে মায়াবলে রাজ্যে নিয়ে আসতে। কারণ তাঁরা জেনেছিলেন আজন্ম কুমার ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাঁকে নগরে আনতে পারলে দেশে নামবে বৃষ্টি, তাই তাঁরা ছলা কলায় নিপুণা বারাঙ্গনাদের নিয়োগ করলেন। সেই সব বারাঙ্গনা ঋষ্যশৃঙ্গকে মুগ্ধ করে হরল তাঁর কৌমার্য। সংগমতৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজধানীতে আনল তাঁরা। আর তখন দেশে নামল বৃষ্টি এবং রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ হল ঋষ্যশৃঙ্গের।”

তপস্বী ও তরঙ্গিনী প্রকাশের বছরে বুদ্ধদেব বসুর আরও একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মরচে পড়া পেরেকের গান। যার নাম কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়। গত জন্মে ছিলাম ঋষ্যশৃঙ্গ কিন্তু সুখ পাই নি শান্তার বাহুবন্ধে। এই কবিতায় তপস্বী ও তরঙ্গিনী র সৃষ্টি –সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল বলে মনে হয়। এই মহাকাব্যের ভূমিকায় বুদ্ধদেব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’ ও কালীপ্রসন্নের ‘মহাভারতে’র ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা প্রথম পড়ে তারপর আর সারাজীবন ভুলতে পারি নি তাঁর অন্যতম হল ‘পতিতা’। পরবর্তীকালে কালীপ্রসন্ন সিংহের মধ্যস্থতায়, ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনিটি আমাকে বারবার মুগ্ধ করেছে ও ভাবিয়েছে। লুব্ধ হয়েছি তা অবলম্বন করে নিজে কিছু রচনা করতে। সেই চেষ্টারই পরিণত ফল তপস্বী ও তরঙ্গিনী। হয়তো মরচে পড়া পেরেকের গানে তাঁর প্রস্তুতি দেখা গিয়েছিল। মহাভারতের বনপর্বে ১১১ সংখ্যক অধ্যায়ে আছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি। ঠিক ঠিক মূল মহাভারতীয় আখ্যানের সঙ্গে এই কাহিনির যোগ প্রায় নেই। বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে লোমশ মুনি উপাখ্যানটি বলেন। সংক্ষেপে সে কাহিনি হল – ঋষি বিভান্ডকের পুত্র অমিততেজা কুমার ঋষ্যশৃঙ্গ। মৃগী গর্ভে তাঁর জন্ম। তাঁর মাথায় একটি

শৃঙ্গ ছিল। তাই তাঁর নাম ঋষ্যশৃঙ্গ ছিল। তাঁর তপস্যা এবং তেজের প্রভাবে স্বয়ং অনাবৃষ্টির সময়েও জলবর্ষণ করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল এই যে, অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যাচার এবং পুরোহিতের প্রতি অত্যাচার হওয়ার জন্য ইন্দ্র তাঁর রাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করে দিলেন। নগরীতে দেখা গেল দুর্ভিক্ষ ও হাহকার। একজন মুনি রাজাকে উপদেশ দিলেন – সরল এবং নারী পরিচয় বর্জিত আজন্ম বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গকে তাঁর তপোবন থেকে কৌমার্য ভঙ্গ করে অঙ্গরাজ্যে আনতে পারলেই বৃষ্টি হবে। সেই উদ্দেশ্যে ছলনার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে নগরে নিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করা হল চতুরা বারাঙ্গনাদের। কিন্তু তাঁরা ভয় করল ঋষ্যশৃঙ্গের তপোবলকে, শেষ পর্যন্ত সম্মত হল না এই দুরূহ কার্যে। শেষে এক প্রবীণা বারাঙ্গনা প্রচুর উপঠৌকনের শর্তে সম্মত হয় এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে।প্রবীণার পরামর্শে কয়েকজন রূপ যৌবন সম্পন্না বারাঙ্গনা বিলাস বিভ্রমে মুগ্ধ করে ঋষ্যশৃঙ্গকে এবং তাঁরা তাঁকে নগরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের নগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অঝোর বর্ষণ। রাজা লোমপাদ কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন ঋষ্যশৃঙ্গের। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভান্ডক প্রথমে তাঁর পুত্রকে স্বধর্ম ভ্রষ্ট করার জন্য রাজা লোমপাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে পুত্রের ঐশ্বর্য ও বৈভব দেখে খুশি হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজপুরীতে বসবাসের অনুমতি দেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার সন্তান জন্মাবার পর দুজনেই রাজধানী ত্যাগ করে অরণ্য আশ্রমে ফিরে যান।

বৌদ্ধ জাতকেও ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির ব্যবহার আছে। ‘অলম্বুষা জাতক’ ও ‘নলিনিকা জাতক’ – এ এই কাহিনির সাক্ষাৎ পাই আমরা। তবে দুটি জাতকের কাহিনির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও আছে। অলম্বুষা জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম, তাঁর তপস্যায় ইন্দ্রের আতঙ্ক এবং তপস্যা ভঙ্গের জন্য অলম্বুষা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ ও অপ্সার গাঢ় আলিঙ্গনে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রক্ষনাশ; কিছুদিন তপোভ্রষ্টভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনযাপন, শেষে আত্মসংযমের মাধ্যমে কামানুরাগ ছেড়ে তপোবল লাভ করার কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। ‘নলিনিকা জাতক’ ও ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যায় ইন্দ্রের আতঙ্ক এবং তাঁর কাছে রমণী প্রেরণের কথা আছে। তবে প্রথম জাতকের কাহিনির মতো সে রমণী কোন অপ্সরা

নয়। সে রাজকন্যা নলিনিকা। নির্দেশ অনুসারে রাজকন্যা নলিনিকা নরনারী ভেদজ্ঞান দান করে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিলাসবিভ্রমে মোহিত করে শীলভ্রষ্ট করা মাত্রই ইন্দ্রদেব বারাণসী রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন। From Ritual to Romance গ্রন্থে Jessie Weston প্রাসঙ্গিক ভাবে মহাভারতে এই ঘটনার কথা বলেছেন। তাঁর গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায় 'The Freeing of waters' অংশে গেল লিজেন্ড এর আদি পর্বের আখ্যান রূপে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনিকে রেখেছেন। অবশ্য মিস ওয়েস্টটন সরাসরি মহাভারত থেকে আখ্যান গ্রহণ করেন নি, তিনি নিয়েছেন অধ্যাপক Von Schroeder এর দেওয়া মহাভারতীয় কাহিনির উল্লেখ থেকে। লক্ষ্য করা যায় The Freeing of waters এর কাহিনির সঙ্গে মহাভারতের কাহিনির চাইতে বুদ্ধদেবের নাটকের কাহিনি- পরিকল্পনার আশ্চর্য মিল। রাজ্যে অনাবৃষ্টি, নারী সম্পর্কে অজ্ঞান ব্রহ্মচারীকে নারীর ছলনায় বিভ্রান্ত করে নগরীতে নিয়ে আসার কল্পনা – এ সবই মহাভারতের মত; কিন্তু সুন্দরী নারীর সাহায্যে নয়, তাঁরই সুন্দরী স্বৈরিণী কন্যার সাহায্যে Weston

> 'An old woman who has fair daughter of irregular life,
> undertakes the secduction of the hero'
>
> (Jessie L. Weston/ From Ritual to Romance
> New York- 1957-p-30)

তবে Weston জানিয়েছেন যে, Von Schroeder এর উল্লিখিত কাহিনিতে রাজকন্যা স্বয়ং প্রলোভন কারিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব সম্ভবত From Ritual to Romance এর কাহিনির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এবং তরঙ্গিণীর দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গএর কৌমার্য ভঙ্গের ব্যাপারে এই উল্লেখের দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবকে পরিচিত করে – একথা জানিয়েছেন বুদ্ধদেব। এই কবিতার দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি থেকে শুধুমাত্র বারাঙ্গনা বিষয়ক সূত্রটি গ্রহণ করেছেন। রামায়ণের অনেক বারাঙ্গনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন মাত্র পতিতাকে অবলম্বন করেছেন, যে ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলনা করতে গিয়ে তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে নবজন্ম লাভ করেছে।

পতিতা কবিতার নায়িকারও কোন নাম নেই। কার্যসিদ্ধির পর রাজকোষ থেকে দেওয়া উপঢৌকন ও অলঙ্কার রাশি নিয়ে সে রাজমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত। সে ফিরিয়ে দিতে চায় এই সব অর্ঘ্য। এর থেকেও বড় কিছু, অন্যকিছু অর্জন করেছে সে। রাজা ও অমাত্যের ব্যঙ্গ ও উপহাসের প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্ত করে তাঁর অভিজ্ঞতা। নিপুণা সে নারী, অজস্র পুরুষের প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত সেই নারী জানায় এর আগে সে তেমন সত্য কথা শোনে নি – যা শুনিয়েছেন তাঁকে কুমার ঋষ্যশৃঙ্গ। নিপুণা ছলনাময়ীদের বিলাসলাস্য থেকে উদ্ধার করে তাঁকে যখন নম্র পরিসেবায় ঢেকে দিয়েছিল সে; তখন –

"তাপস কুমার চাহিলা, আমার
মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম-রমণী দরশ মুগ্ধ
সে দুটি সরল হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাযায় উঠিল বজ্র ভেরি।
… … …
কহিল কুমার চাহি মোর মুখে –
"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।"

এই পতিতা জানিয়েছে –

'মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি-
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা
শুনিনি এমন সত্যবাণী।
… … …
আমিও দেবতা ঋষির আঁখিতে

এনেছি বহিয়া নতুন দিবা

অমৃত সরস আমার পরশ

আমার নয়নে দিব্য বিভা।

… …। …।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে

আনন্দময়ী মূরতি তুমি,

ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,

ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'

এর ফলে আদ্যন্ত বদলে গেল সে রমণী। বিলাসকলার প্রমোদ ভবন থেকে চিরনির্বাসন ঘটলো তাঁর। ঋষিকুমারের পূজা বন্দনায় দেবত্বে উন্নীত হলো সে নারী। তাঁর এই দৈবী রূপান্তরের অনুভব নিয়ে সে বলে –

'দেবতারে তুমি দেখছ তোমার

সরল নয়ন করেনি ভুল,

তোমার পুযার গন্ধ আমার

মনোমন্দির ভরিয়ে রবে

সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার

যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।'

'পতিতা'তে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন তাঁর অনুভূত সেই সত্য প্রেমের স্পর্শ, ক্লেদাক্ত জীবন থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার করেছে পতিতাকে শারিরীক কামনা যখন বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বন্দনায় পর্যবসিত হয়, তখন এই অলৌকিক রূপান্তর ঘটে লৌকিক নারীর জীবনেও। সুন্দরের সংস্পর্শে ঘটে তাঁর জন্মান্তর। ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মান্তর ঘটিয়েছেন এই পতিতার। রবীন্দ্রনাথও বদলে নিয়েছিলেন পুরাণ কথা কে নিজের বক্তব্য প্রতিপাদনের জন্য। পতিতা নারী মন্ডলী থেকে একজন ঋষ্যশৃঙ্গের সেবায় উৎসর্গীকৃত আত্মা হয়ে নিজেই উদ্ধার পেয়েছিল – একথা রামায়ণ কাহিনিতে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পতিতা নারীর এই রূপান্তর সূত্রটি প্রথমাবধি বুদ্ধদেবকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তবু কেবলমাত্র

রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গের এই মিথকে সামগ্রিক ভাবে তাঁর আদিম সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করে এই নাটকে যেভাবে উপস্থিত করলেন, রবীন্দ্রনাথের পতিতায় সেভাবে তা নেই।

রামায়ণ, মহাভারত কিংবা জাতক কথায় মূল কাহিনি এক হলেও ছোটোখাটো কিছু পার্থক্য আমাদের নজরে পড়ে, সেগুলি সাধারণ ভাবে নিম্নরূপঃ-

১। রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনিকে অলৌকিকতার সাংকেতিক ঘটনা নির্ভরতা এবং এক রিচ্যুয়াল ,অশ্রিত আদি কালের মিথ হয়ে ওঠার প্রবণতা আছে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনের মধ্যে বৃষ্টি বীর্য প্রজনন, ফসল সৃষ্টির যে কামনা এক সূত্রে জড়িত রয়েছে এ গল্পে তাঁরই সাংকেতিক ইশারা লগ্ন। বুদ্ধদেব এ প্রসঙ্গটিকে তাঁর নাটকেও ব্যবহার করেছেন।

২। রামায়ণ কাহিনিতে ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলাকলায় ভুলিয়ে নগরে এনেছে একদল বারাঙ্গনা। বিশেষ একক কোন নারী নয়।

৩। মহাভারতকথায় কাহিনির আর একটু বিস্তার দেখতে পাই। সেখানে অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও অপমানের কারণে দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কথা আছে।

বুদ্ধদেব তাঁর নাটকে এ তথ্য গ্রহণ না করে রাজদূত চরিত্রের মুখে এর বিরোধিতা করেছেন। বরং তাঁর বিশ্বাসে রাযার অক্ষমতাই রাজ্যের সার্বিক অনুর্বরতার হেতুঃ-

‘রাজপুরোহিত। অক্ষম আজ অংরাজ, বীর্য তার নিঃশেষ

শুষ্ক তাই মৃত্তিকা, রিক্তনভোতল।’

৪। অনেক বারাঙ্গনা নয়, একজন চতুর ও প্রবীণ বারাঙ্গনা ঋষিকে ভুলিয়ে আনার দায়িত্ব নেয়। সেই প্রবীণা বারযোষার নাম ছিল না মূলে। বুদ্ধদেবের নাটকে তার নাম আছে লোলাপাঙ্গী। আবার সে প্রেরণ করে একদল যুবতী লাস্যময়ীকে। যারা মিলিতভাবে সম্পন্ন করে ঋষ্যশৃঙ্গের যৌন অভিজ্ঞতা। বুদ্ধদেব রমণীদের এই যৌথ উদ্যোগের ব্যাপারটি বর্জন করেছেন। বরং এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’র

কাহিনিতে তিনি আস্থাশীল। রবীন্দ্রনাথও সে নারীর নাম ব্যবহার করেননি। বুদ্ধদেব করেছেন তরঙ্গিনী বলে।

৫। মহাভারতের কাহিনিতে দেখি বৃদ্ধা বারাঙ্গনা একদল যুবতীর সাহায্য নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেবে দেখি লোলাপাঙ্গী তার কন্যা তরঙ্গিণীকে এ কার্যে নিয়োগ করেছে। সম্ভবত কাহিনির এই রূপান্তর ঘটিয়েছেন বুদ্ধদেব 'গ্রেট লিজেন্ডের' অনুসরণে। সেখানে বৃদ্ধা গণিকা নিজের কন্যার সাহায্যে কার্যসিদ্ধি ঘটিয়েছেন।

৬।মহাভারতের কাহিনিতে বিভান্ডক চরিত্রের সম্পূর্ণ রূপ বুদ্ধদেব গ্রহণ করেননি। বেদব্যাসের মহাভারতে আছেঃ 'পুত্রকে অমরনাথের ন্যায় বিরাজমান – গ্রাম ঘোষাদির অধীশ্বর ও পুত্রবধূ শান্তাকে সৌদামিনীর ন্যায় শোভামানা অবলোকন করিয়া তাঁহার রোষানল একেবারে নির্মাণ হইয়া গেল। তিনি নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুত্রকে তথায় বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয়কার্য সকল সর্ব প্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে।

তাছাড়া, মহাভারতে ঋষ্যশৃঙ্গের জননী এক মৃগী। বুদ্ধদেব কিন্তু বিভান্ডকের এই তির্যক যোনি ব্যবহারের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম যে এক কিরাত রমনীর গর্ভে – এ তথ্য ব্যবহার করেছেন।

এবং ঋষ্যশৃঙ্গ পরিণতিতে পিতার পরামর্শই কার্যে পরিণত করেন।কিন্তু বুদ্ধদেবের নাটকে উভয় ক্ষেত্রেই রূপান্তর ঘটে গেছে। ঋষ্যশৃঙ্গকে ক্ষমা করেননি বিভান্ডক। পুত্রের কাজে তিনি ক্ষুব্ধ। সেই ক্ষোভ ও অনুসূয়া প্রকাশেও আতিনি স্পষ্টবাক লক্ষ্য করি আমরা। আর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার শত চেষ্টাতেও আশ্রমে ফেরেন নি।নাটকের অন্তিমে বিফল বিভান্ডক ফিরে যাচ্ছেন এইভাবে।

বিভান্ডক ঋষ্যশৃঙ্গকে একবার আলিঙ্গন করলেন, তারপর ধীরে ধীরে নতশিরে বেরিয়ে গেলেন। তরঙ্গিণীর কাছেও ফেরেননি ঋষ্যশৃঙ্গ। ফেরা অসম্ভব বলেই।

'কেউ কি কোথায়ও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিনী?

আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন'

অথচ মুল মহাভারতের অনুবাদে আছে 'মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ অনুমতি প্রতিপালনপূর্বক যথাসময়ে আশ্রমে গমন করিলেন। শান্তা ও তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন।'

৭। জাতক কাহিনির সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির মিল থাকলেও পরিণতিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য স্পষ্ট। জাতকের দুটি কাহিনি কোন একটিতেও বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে নগরে নিয়ে আসার কথা নেই। এছাড়া এ নাটকের গঠন ও পরিকল্পনায় কখনও এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল কিংবা রবীন্দ্রনাথের চন্ডালিকা অথবা চিত্রাঙ্গদা প্রভাব দেখেন কেউ কেউ।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেনঃ-

'The Background of famine, village women the exalted moment of the first exchange of glances between the boyish mendicant and a sophisticated prostitute – all these were seized by the author's imagination in light of Eliot's Murder in the Cathedral' – Buddhadeva Bose. Sanhitya Akademi, 1977, chapter VI, p-56'

৯.২ পুরাণের পুনর্জন্ম

তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'সর্বোপরি স্মর্তব্য, এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার পরিচিত এবং রচনাটিও শিল্পীত – অর্থাৎ একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমত করে নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ব বেদনা। বলা বাহুল্য, এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাঁকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।' বস্তুত রচনায় পুরাণ প্রসঙ্গের ব্যবহার সব দেশের কাব্যের কৃৎ কৌশলের এক সুপ্রাচীন রীতি। পুরাণের ঋকবেদের কাহিনি উল্লেখ বা রামায়ণ মহাভারতে পুরাণ বা বৈদিক ঘটনার পুনর্ব্যবহার সেই উদ্দেশ্যেই হয়ে এসেছে।

পুরাণ ব্যবহারের সুবিধা এই যে, নতুন যুগের পাঠককে পুরাতন অনুষঙ্গের সাহায্য নিয়ে লেখক তার বক্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারেন সহজে। নূতন সময়কালের মনের সঙ্গে

পুরাণকালের যোগ মাধ্যম হয়ে ওঠে পুরাণ প্রসঙ্গে উল্লেখ। কোন সময় এই রচনা নিছক রূপক বা তুলনা হিসেবেই উপস্থিত হয়েছে। কখনও বিদগ্ধ কবি শিল্পীর হাতে সেই উল্লেখ সংকেতবাহী হয়ে ওঠে। আধুনিক মানুষ হৃদয়ের গভীরে সুদূর স্মৃতি অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন বিশ্বপরিশ্রুত অভিজ্ঞানবহন করে না, স্মৃতি সত্তায় বহন করে মানব সভ্যতার ইতিহাস-অভিজ্ঞান। মিথ মানুষের নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের অংশ। এ জন্যই মিথের প্রতি সৃষ্টিশীল ব্যক্তি স্বভাবতই আকর্ষণ বোধ করেন। তাছাড়া প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে সাহিত্য মিথ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার সমকালীন জীবনচেতনা শাশ্বত মিথ অভিজ্ঞানের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে, সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে। ব্যক্তি অভিজ্ঞতা ও পুরাণ অভিজ্ঞানের মিথষ্ক্রিয়ায় সাহিত্য পাই শাশ্বত কালমাত্রা। এইভাবে ভাবেন ওপার বাংলার সমালোচক মাহবুব সাদিক তার কবিতায় মিথ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ গ্রন্থে।

দুদুটোর বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ধ্বংস যজ্ঞের পর যন্ত্রসভ্যতায় প্রাজ্ঞসর পাশ্চাত্যের লেখকেরা নতুন তাৎপর্যে মিথের সমান্তরাল কাহিনি নির্মাণ এবং প্রকৃতি প্রকরণ প্রয়োগ করেছেন। যুদ্ধ ও ধ্বংস প্রবণ সভ্যতার অন্তঃসারশূণ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের কবিকে মিথের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। অনুরূপ কথা বলেন – Philip Wheel Wright তার Poetry Myth and Reality’ নিবন্ধেঃ-

The role of myth in great Poetry of the past may throw some light upon the predicament of the poet and the unpromising estate of poetry in our non-mythological present. The poet of today – and by that I mean the poetic impetus in all of us today – is profoundly Inhibited by the dearth of shared consciousness of myth.

ব্যক্তি অভিজ্ঞতা শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণে না মিলতে পারছে ততক্ষণ তা সাহিত্যে মূল্যহীন বলেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ।(স্বগত/ কাব্যের মুক্তি সঙ্গে, ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সমন্বয়। প্রাচীনকালেও প্রায় অনুরূপ উদ্দেশ্যে মিথের ব্যবহার ছিল বলে মনে করেন বিষ্ণু দে। তিনি বলেনঃ-

'সাহিত্যে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজসত্তার অসঙ্গতি এড়াবার জন্যে সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকতো।' (সাহিত্যের ভবিষ্যৎ/ সিগনেট ১৩৫৯/পৃ-১৯৬)

একালের সাহিত্য সৃষ্টিতেও কেবল সমাজ সত্তার সঙ্গে অসঙ্গতি এড়াবার জন্যই মিথের ব্যবহার হয় না, পুরাণের অবিস্মরণীয় উৎস উৎসারিত রূপক চেত্না দ্বারাই বর্তমান জটিল বিশ্বের দ্বারোদঘাটন করতে করতে চান একালের কবি।বর্তমান জীবন অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ অভিজ্ঞানের জন্ম দেয় তখনই কবি মিথের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চান। কারণ মিথ মানব প্রজাতির সত্তার অভিজ্ঞানের আঁধার। আধুনিক মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সত্তা ও খন্ডিত জীবনবোধে মিথ-চেতনাই সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত 'মানব মূল্যবোধ'।

তিরিশের পরবর্তী কবিদের মধ্যে মিথ ব্যবহারের প্রণোদনা জুগিয়েছিল আধুনিক সাহিত্যের এই মিথমুখী প্রবণতা। তাঁদের সামনে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের চাইতে আদর্শ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাশ্চাত্যের ইলিয়ট, পাউন্ড, জেমস্ জয়েস্, টমাস মান, ফ্রানজ কাফকা প্রমুখ শিল্পী। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ এই মিথ প্রয়োগে উৎসাহী ছিলেন। বিষ্ণু দে তো প্রথম পর্বে প্রবল ভাবে মিথাশ্রয়ী। পুরাণ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ সাহিত্যজীবনের সূচনা পর্ব থেকেই। কবিতা ছাড়াও নাটকও কাব্যনাটকে তিনি মিথের ব্যবহার করেছেন শিখরস্পর্শী সাফল্যে। নাটকে তিনি দেশী ও বিদেশী মিথ ব্যবহার করেছেন শিখরস্পর্শী সাফল্যে। নাটকে তিনি দেশী ও বিদেশী মিথ ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ভারতীয় পুরাণ কাহিনী ব্যবহার হয়েছে 'কাল সন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি', 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'তে। গ্রীক পুরাণের ইলেকট্রা কাহিনি ব্যবহৃত হয়েছে 'কলকাতার ইলেকট্রা'য়। অবশ্য বুদ্ধদেবের মিথ চেতনা ভারতীয় পুরাণ প্রসঙ্গেই বেশি সাড়া দেয়। পাশ্চাত্য পুরাণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বিষ্ণু দের মতো প্রবল নয়।

বুদ্ধদেব বসুর মিথ আশ্রয়ের কারণ খুঁজতে গিয়ে সমালোচক বলেন, 'বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বস্তু বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এককও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা। অভিযোজন সামর্থ্যের অভাবের কারণে তিনি জনবিচ্ছিন্ন। তাঁর অন্তর্মানসের বিশিষ্টতার জন্য তিনি বিচ্ছিন্ন ।

জনবিচ্ছিন্ন এই ব্যক্তি সত্তা বহির্জগতের দ্বন্দ্বময় গতিশীল পৃথিবীর শক্ত বহিরাশ্রয়ের সন্ধান না পেয়েই মিথাশ্রয়ী হয়েছেন।

সাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, - 'পুরাণ কথার ধর্মই এই যে, তা একই বীজ থকে শতাব্দী পেরিয়ে ভৌগোলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোঁটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।

কবিতা রচনার প্রথম পর্ব থেকেই বুদ্ধদেব ভারতীয় পুরাণকে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের তির্যক বাহন করেছেন। বন্দীর বন্দনা থেকে সে প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে। কিন্তু মহাভারতের কাহিনিকে উপজীব্য করে তাঁর নিজস্ব কথা বলার শৈল্পিক দায় থেকেই তিনি মাধ্যম বদলের চেষ্টা করেছেন। কাব্য থেকে কাব্যনাট্যের পরিধিতে তাঁর এই বক্তব্য স্পষ্টতা পেয়েছে। বুদ্ধদেবের ব্যক্তি প্রাধান্য তাঁকে প্রায়শই আত্মমগ্ন করেছে কাব্যে তিনি সমাজ বিমুখ, কথাসাহিত্যে চেতনা প্রবাহে বিভোর। আর কাব্যনাট্যগুলিতে তপস্বী তরঙ্গিনী অনাম্নী অঙ্গনা, প্রথম পার্থ কাল অসন্ধ্যা কালচৈতন্য আশ্চর্য ভাবে সংযোজন। এবং অতীতের ক্রমান্বয়ে পথে পরিক্রমায় সমান্তরাল হয় বর্তমানের জীবন অন্বেষাকে মিলিয়ে দিতে আগ্রহী, একথা স্পষ্ট গোচর মহাভারতের কথার অভিনব বিশ্লেষণে।'

বুদ্ধদেবের কবি সত্তার আগাগোড়া অনুসন্ধান ছিল কাম ও প্রেমের সম্পর্কে। কামনা ও রিরংসাময় যৌবনের যজ্ঞবেদি থেকে নিরন্তর উন্নয়নপিপাসু এক সত্তা, পৃথিবীর রূপের প্রসাদে অমেয় সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বর্গ নির্মাণ করতের আমরণ চেষ্টায়রত। সেই চেষ্টা থেকে বুদ্ধদেব ও পুরাণকথাকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন তপস্বী ও তরঙ্গিনী। এবং সেই পুরাণ কাহিনিতে তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন।

'লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তাঁরই প্রভাবে, দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো' নাটকটির মূল বিষয় হলো এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকা বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো। একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রম্ভচারীর হলো পতন আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম' – যেভাবে রবীন্দ্রনাথের পতিতায় বর্ণিত

আছে, সেইভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম' – অর্থ হলো কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব 'অবিচল' অবস্থা নির্বিশেষে, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি – যার প্রতীক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান, এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা"।

যতদূর মনে হয় এরূপ পৌরাণিক ঘটনা বুদ্ধদেবকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিল এই কারণে। কাম থেকে প্রেমের পথে উত্তরণের ইতিহাস এখানে আছে। তাই শান্তার বাহুবন্ধে সুখী ছিল না সে প্রেমিক ঋষি, যে প্রথম পেয়েছিল তরঙ্গিণীকে। 'মরচে পড়া পেরেকের গানে' যার কথা বলেছে এক মরচে পড়া পেরেক। গত জন্মে যে ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ। সে বলেছিলঃ

'হেসে উঠলো সে
যেন নির্ঝরিণী; যেন ডুবন্ত কলসির কলস্বর।'
সে দেখেছিল সেই মানবীকে –
যার 'বুকের দুটি মাংসপিণ্ড
নৈবেদ্যের মত বিদগ্ধ ও বর্তুল।'

সেই অনাস্বাদিতপূর্ব দেহমনের অতলান্ত স্নান সেরে শুদ্ধতম তাপস সাধারণ নারী শান্তার মধ্যে তৃপ্ত হতে পারেনি। তার অন্যতর, ভিন্নতর প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছিল সংসারে। নতুন যুগ জীবনের এই বক্তব্যের মূল বুদ্ধদেব রোপণ করতে চাইলেন পৌরাণিক অনুষঙ্গে। ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনিকে এজন্য বেছে ছিলেন তিনি। (মরচে পড়া পেরেকের গান – একই বছরে প্রকাশিত হলেও কবিতাটিই আদি সৃষ্টি বলে অনুমান) এই কাহিনি ব্যবহারে বুদ্ধদেব একথা বোঝাতে উদগ্রীব যে, আদি পুরাণে কামের এই তাৎপর্য – এর সদ্‌গতি সূত্রটি এ যুগের জটিল জীবনে যতখানি সত্য ততখানি আর কোনো সময়ে ছিল না। বিপরীতে একথাও মিথ্যা নয়, নাট্যকার পুরাণকে নিজের মনের মতো করে সাজাতে গিয়ে নিছক যুগপৎ পরিবর্তনের ধারায় নিয়ে আসেন নি। বরং এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আদিম অলৌকিকতাধর্মী আখ্যানের নিগূঢ় তাৎপর্য এবং সংকেতটিকে অবিকলভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য গ্রন্থ 'From Ritual to Romance' এর The Freeing of

waters থেকে তিনি ভিন্নতর এক তাৎপর্য অনুধাবন করে ফেলেন আমাদের পৌরাণিক কাহিনিটির। বর্ষণহীন দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আসবেন ঋষ্যশৃঙ্গ। যিনি আসবেন কৌমার্য ভঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়ে। নরনারীর শরীর মিলনের অনুষঙ্গ, যৌনতা সব পুরাণেই উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত। - এ কাহিনিতে তারই দ্যোতনা আবিষ্কার করেন বুদ্ধদেব।

'From Ritual to Romance' –এ Weston বলেনঃ-

'There is no doubt that a ceremonial marriage very frequently formed a part of 'Fertility ritual and was supposed to be specially efficacious in bringing about the effect desired'।

বৃষ্টি নামানোর জন্য, ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য আদিম মানব সমাজে যে জাদু ক্রিয়ামূলক আচরণ ছিল তার প্রধান উপাচার ছিল একটি পুরুষ ও একটি নারীর যৌন মিলনের ভূমিকা।

ওয়াট মাণ্ডি আদিম উপজাতিরা বসন্তকালে এক উৎসব পালন করত। তাঁর একটা রিচ্যুয়াল এইরকম ছিল – মাটিতে একটা গর্ত খুড়ে ঝোপে ঝাড়ে তাঁকে আবৃত করা হতো। এবং তাঁর চারিদিকে উদ্যত বর্ষা নিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচ করতে করতে সেই আবৃত গহ্বর বিদ্ধ করত তাঁরা বর্ষায়, বলা বাহুল্য তাঁদের কাছেও এই আচরণবিধিতে গুল্ম আচ্ছাদিত গহ্বরটি স্ত্রী যোনি ও উদ্যত বর্ষা ছিল পুরুষাঙ্গের প্রতীক। সম্ভবত এই অনুষঙ্গকে কাজে লাগিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর ঘোড়সওয়ার কবিতা লিখেছিলেন 'চোরাবালিতে'। চোরাবালির সমালোচনা সূত্রে বিষয়টির সঙ্গে বুদ্ধদেবের পরিচয় ছিল নিশ্চয়। আদিম কাল থেকেই মানব সমাজের চেতনায় পুরুষের বীর্য এবং আকাশের বৃষ্টি পরস্পর পরিপূরক। বুদ্ধদেবের বিশ্বাস ও তাই। সেই বিশ্বাস থেকে তপস্বী ও তরঙ্গিনীতে বুদ্ধদেব তরঙ্গিণীর সংলাপ রচনা করেন সেই উচ্চারণঃ-

'জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত
গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ব্যাপ্ত হোক গতি।
পূর্ণ হোক বৃত্ত। জয়ী হোক প্রাণ। হয়ী হোক মৃত্যু।

ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল।

... ...

জাগল জন্তু। ভাঙল নিদ্রা। সুপ্ত হল যারা যারা

জাগ্রত ছিল। চঞ্চল হল মনোরথ, উচ্ছবল হল।

নির্ঝর। মেঘ জমল আকাশে, চমক দিল বিদ্যুৎ, বিলোল হল বজ্র।

নামল বৃষ্টি। জাগল ধ্বনি – প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে,

অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায় – প্রতিধ্বনি।

মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরীক্ষে তৃষ্ণা,

ধরণী দেয় তৃপ্তি।...

তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি।

আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি।

সর্প তোলে ফণা ফেনিল হয় সমুদ্র

জলে মন্থন – মন্থন মন্থন।

দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী

বর্ষণ – বর্ষণ - বর্ষণ’

নরনারীর যৌন মিলনের এমন শব্দচিত্র, এমন সরল অকুণ্ঠ বিবৃতির বিস্তার, কাব্য নয় নাটকের শরীরে কোন জাদুমন্ত্র সঞ্চার করেছিলেন বুদ্ধদেব, ভাবলে বিস্মৃত হতে হয়। অবশ্য এখানেও তাঁকে মুক্তি দিয়েছে মিথ পুরাণের পটভূমি।

১৩৮১ তে প্রকাশিত মহাভারতের কথা ভুমিকাতে বুদ্ধদেব লিখেছেন, ‘আজ থেকে প্রায় ১১ বছর আগে আমি একবার মার্কিন দেশের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার অধ্যাপনার একটি প্রসঙ্গ ছিল তুলনামূলক ইন্দো ইউরোপীয় এপিক – মহাভারত বিষয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছে সেই সময়েই আমার মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। ......

ভেবছিলাম গুছিয়ে বসেই লিখতে শুরু করে দেব, কিন্তু যথোপযুক্ত অবকাশ আর জোটে না, মাস বছরে অন্য নানা ব্যাপারে কেটে যায়। এমন নয় যে, অন্তর্বর্তী সময়ের

মধ্যে মহাভারতের সঙ্গে আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটেছিল – বরং আমি যে ক্রমশ আরও জড়িয়ে পড়েছিলাম, আমার সাম্প্রতিক অনেক নাটকে ও কবিতায় নির্দশন আছে।' এই সূত্রেই লেখক টের পান তাঁর মনের দু একটা পূর্বাজিত ভ্রূণাকার ভাবনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে উঠেছে। এই নতুন যুগের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করতেই বুদ্ধদেব পুরাণের কাহিনির সাহায্য নিয়েছিলেন, মাইকেলের মত পুরাণ কে নতুন যুগের জিজ্ঞাসার মুখে দাঁড় করানো নয়, কেবল বরং তিনি পুরাণের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন, এই সব লেখালিখিতে এ থেকে মহাভারতের কথা পূর্ব চেষ্টা হিসেবে তপস্বী ও তরঙ্গিনীর রচয়িতার মোটিফটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে তিনি সচেতন ভাবে তাঁর সহপাঠী অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীতা দিয়ে পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন।

সমালোচক যথার্থই বলেছেন –

'বুদ্ধদেব পুরাণের নাট্যভাষা রচনা করতে বসেননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধ্যানের একটা যোগ্য আর্কিটাইপ, আধুনিক লেখকেরা সকলেই খুঁজে ফেরেন।'

তপস্বী ও তরঙ্গিণীর কাহিনি তাঁর কাছে সেই আর্কিটাইপ হয়ে উঠেছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি নির্বাচিত মিথ কাহিনিতে অনেক উদ্বৃত্ত ঘটনাকে স্থান দিয়েছেন। যেমন – ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তি, বিষাদ কিংবা তরঙ্গিণীর দর্পন সামনে রেখে ঋষির দেখা মুখশ্রীর সন্ধান। আসলে, আমাদের কালের অনুর্বরতা, হতাশা, কামক্লীষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে এক জীবনের আশ্বাস উত্তরণের ইশারা খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাণের মধ্যে।

পুরাণ উপাদানের এই নাটকে বুদ্ধদেব প্রধান দুটি নতুন সূত্র যোগ করেছেন।

১। ব্যক্তি জীবনের ওপরে রাষ্ট্র তথা সুপার স্ট্রাক্চার এর প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ।

২। আধুনিক দাম্পত্যের অসুখী সহ-অবস্থান প্রসঙ্গকে পৌরাণিক জীবন-দৃশ্যে সংযোজন।

৩। তাই ঋষ্যশৃঙ্গ বা তরঙ্গিনী, শান্তা ও অংশুমান তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জীবন জাপন করতে পারে না।

তাই শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গ পরস্পরকে করেচ চলেছেন প্রতারিত। মূল পুরাণকথায় এই জটিল আধুনিক সমস্যার ছায়া ছিল না। এ সব আধুনিক কালের নাট্যকার বুদ্ধদেবের সৃষ্টি।

৯.৩ তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের অঙ্ক ও দৃশ্য অনুসারে নাটকে সংলাপ ও ভাষার গুরুত্ব

তপস্বী ও তরঙ্গিনী ৪ অঙ্কের নাটক। নাটকটির অঙ্ক গুলির মধ্যে দৃশ্য বিন্যাস মুছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি অধ্যায়ে দৃশ্য বিন্যাস পরিকল্পনায় নাট্যকার সচেতনভাবে এক একটি সূত্র রেখে গেছেন যা থেকে নাট্যপরিচালক এই অনুদৃশ্যগুলিকে ভাগ করে নিতে পারেন। লক্ষনীয় ভাবে প্রতিটি অংকে অনুদৃশ্যের সংখ্যা ৫। ঘটনাস্রোত বিন্যাসে নাট্যকারের সেই পরিকল্পনাকে আমরা ভাগ করে নিতে পারি।

প্রথম অঙ্ক

১.গায়ের মেয়েদের গান থেকে প্রস্থান পর্যন্ত।

২. দূতদের সংলাপ থেকে দূতদ্বয়ের প্রস্থান পর্যন্ত।

৩. রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের সংলাপ থেকে পুরোহিতের প্রস্থান পর্যন্ত।

৪. শান্তার প্রবেশ থেকে শান্তার প্রস্থান পর্যন্ত।

৫. শান্তার প্রস্থান থেকে নাটকের যবনিকাপাত পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. ঋষ্যশৃঙ্গ এর আশ্রমে ঋষ্যশৃঙ্গএর সংলাপ থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ এর পাদ্যঅর্ঘ্য আনার জন্য প্রস্থান ও তরঙ্গিনীর একোক্তি অবধি।

২. ঋষ্যশৃঙ্গ এর পুনরাগমন থেকে তরঙ্গিনীর প্রস্থান অবধি।

৩. বিভাণ্ডকের প্রবেশ থেকে প্রস্থান অবধি।

৪. ঋষ্যশৃঙ্গ এর একোক্তি থেকে তরঙ্গিনীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করা ও মঞ্চে অন্ধকার নামা অবধি।

৫. আবার মঞ্চে আলো জ্বলা থেকে যবনিকাপতন অবধি।

তৃতীয় অঙ্ক

১। সূচনা থেকে চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী অপসারণ অবধি।

২। লোলাপাঙ্গী তরঙ্গিণীর সংলাপ থেকে লোলাপাঙ্গীর দ্রুত প্রস্থান অবোধি

৩। চন্দ্রকেতুকে নিয়ে পুনপ্রবেশ থেকে তরঙ্গিণীর কক্ষান্তরে চলে যাওয়া অবধি।

৪। চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর সংলাপ থেকে প্রস্থান অবধি।

৫। তরঙ্গিণীর একোক্তি থেকে যবনিকাপতন অবধি।

চতুর্থ অঙ্ক

১। সূচনা থেকে শান্তার অন্তঃপুরে প্রস্থান অবধি।

২। বিভাণ্ডকের প্রবেশ থেকে বিভান্দকের প্রস্থান অবধি।

৩. ঋষ্যশৃঙ্গ এর একোক্তি থেকে তরঙ্গিনীর প্রস্থান অবধি

৪। অংশুমান শান্তার সংলাপ থেকে রাজমন্ত্রী শান্তা ও অংশুমানের প্রস্থান অবধি।আলিঙ্গনে আবদ্ধ করা ও মঞ্চে অন্ধকার নামা অবধি।

৫. চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর প্রবেশ থেকে যবনিকাপতন অবধি।

প্রথম অঙ্ক শুরু হয়েছে গায়ের মেয়েদের বৃষ্টির প্রার্থনা দিয়ে। মেয়েরা এসেছে দারুন দহনে বিষন্নপ্রায় গ্রামাঞ্চল থেকে। তাদের সংলাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে শুধু শস্যহীনতার সমস্যা নয় আরো ব্যপক বিপর্যয়ের কথা। যেন তাঁদের হাহাকারে ব্যঞ্জিত হয়েছে এ যুগের বন্ধ্যা সভ্যতার পিপাসার কথা। তাঁদের সমবেত সঙ্গীতে এই ভাবনার প্রকাশ। বুদ্ধদেব জানান বিষয়টির পরিকল্পনায় এলিয়টের 'Murder in the Cathedral'' নাটকের প্রেরণা আছে।

আলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত জানানঃ

"The Background of Famine, village women, the exalted moment of the fast exchange of glances between the boyish mendicant and sophisticated Prostitute – all these were seized by the author's imagination in the life of Eliot's murder in the Cathedral."

মন্তব্য

মেয়েদের এই প্রার্থনা সঙ্গীতে চার পংক্তির পাঁচটি স্তবকে বিন্যস্ত। ছোটবড় মোট কুড়িটি পঙক্তি আছে। প্রথম স্তবকের শেষ পংক্তিঃ- বৃষ্টি নেই এই দুটি শব্দে রচিত। আর পঞ্চম তথা শেষ স্তবকেরও মাত্র দুটি শব্দঃ- বৃষ্টি দাও!

নাটকে বিন্যস্ত কবিতাটি মেয়েদের জন্য রচিত হলেও নাটকের ভঙ্গীতে সংলাপ বিন্যস্ত নয়। অর্থাৎ কে কোন অংশ বলবে তা নির্দিষ্ট নেই – এ রীতি রবীন্দ্র নাটকে আমরা প্রথম দেখেছি ফাল্গুনীতে প্রযোজনা সংক্রান্ত পরামর্শে বুদ্ধদেব অবশ্য ব্যাপারটা রাবীন্দ্রিক দুঃসাহসিকতায় ছেড়ে দেন নি চরিত্রাভিনেতা বা নির্দেশকের ওপর। যদিও বলেছেন, 'আমি ইচ্ছে করেই নাটকের মধ্যে মঞ্চ নির্দেশ বেশি দিন।' তবু গাঁয়ের মেয়েদের ভাষণটি কীভাবে আবৃত্তি করা হবে সে বিষয়ে তার ধারণা জানিয়ে দিয়েছেন।

১ম স্তবক –	১ম মেয়ে।
২য় স্তবক –	
১ম ও ২য় পঙক্তি	২য় মেয়ে
৩য় ও ৪র্থ পঙক্তি	৩য় মেয়ে
৩য় স্তবক –	
১ম পঙক্তি	১ম মেয়ে
২য় পঙক্তি	২য় মেয়ে
৩য় পঙক্তি	(প্রথম অংশ) ব্যাঙের ছাতা করে সাযাবে পৃথিবীরে – ৩য় মেয়ে
	(২য় অংশ) ডাকবে উল্লাসে দুর্দর – ২য় মেয়ে
৪র্থ পঙক্তি	১ম মেয়ে
৪র্থ স্তবক	
১ম, ২য় পঙক্তি	২য় মেয়ে
৩য় পঙক্তি	৩য় মেয়ে
৪র্থ পঙক্তি	২য় ও ৩য় মেয়ে

৫ম স্তবক –

১ম পঙক্তি	১ম মেয়ে
২য় পঙক্তি	২য় মেয়ে
৩য় পঙক্তি	৩য় মেয়ে
৪র্থ পঙক্তি	তিনজন সমস্বরে।

এই পরামর্শ থেকে দেখা যাচ্ছে মঞ্চে উপস্থিত প্রতিটি চরিত্রকে সচল রাখার জন্য এই বিন্যাস। সংলাপ এখানে কোন চরিত্রকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেয়নি। হিসেব অনুযায়ী এই অঙ্কে উপস্থিত পাত্রপাত্রীর সংখ্যা -১১

নাটকের Exposition এ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে – দেশে অনাবৃষ্টির সংবাদ। দুই রাজদূত – এর থেকে বিভিন্ন দেশের সাহায্য চেয়েছিলেন। নানান দুর্বিপাকে সেসব সাহায্য পথেই বিনষ্ট হয়েছে। দুজনে এও প্রকাশ করেছে যে ব্রাহ্মণকে অপমান করার জন্য অঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ – এ তথ্য সঠিক নয়। ঋষ্যশৃঙ্গকে সে যদি নিয়ে আসে নগরের তার কৌমার্য ভঙ্গ করে।

শান্তার উপস্থিতিতে অংশুমান শান্তার একটি এপিসোড স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে রাজ পুরোহিত ও গ্রামের মেয়েদের প্রার্থনা অংশ ছাড়া আর সমস্তটাই গদ্যের সংলাপে রচিত। বলাবাহুল্য এ গদ্য কবির গদ্য। শিশির দাস তার 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, নাটকের নিজস্ব সংলাপ অনুসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ প্রথম পর্বে শেক্সপীয়রের অনুষঙ্গী হয়েছিলেন কিন্তু ১৯০৮ এ প্রকাশিত শারদোৎসব থেকে তিনি অর্জন করেন নিজস্ব নাট্য সংলাপের গদ্য। যা কবিতার মতো ধ্বনিঋদ্ধ। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষাও এই দুত্যিময় গদ্যেরই অবয়ব অর্জন করেছিল। এই গদ্যেরই রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর অসাধারণ কাব্যভুবন রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

তপস্বী ও তরঙ্গিনীতে উত্তমর্ণ রবীন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকার করে নিয়েছেন বুদ্ধদেব। জীবনের প্রথমপর্বে প্রায় তারুণ্যের প্রথমে, রামায়ণের কথা নিয়ে যে নাটক(রাবণ) লিখেছিলেন, তার ভাষা ছিল রচয়িতার সমকালের ভাষা। সে ভাষায় সীতা ও রামচন্দ্রের সংলাপ দর্শক ও স্রোতার সংস্কারে আঘাত হানতে পারে বলে সে নাটক প্রযোজনার

চেষ্টা থামিয়ে দেন প্রযোজকরা। এ প্রসঙ্গে স্মৃতিচারী বুদ্ধদেব জানান – 'শুনতে পাই আমার সংলাপে আপত্তি করেছেন প্রধান অভিনেত্রী শ্রীমতি নীহার বালা... অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আমার প্রতি স্পষ্টতই যিনি সহৃদয়, তিনি ও একদিন বললেন আমার ভাষা আর একটু রিমোট হলে ভালো হতো – আমি বুঝেছিলাম রাবণ সীতার মুখে সমকালীন চলতি ভাষা বসানো ভুল হয়েছিল।'

উত্তরকালে বুদ্ধদেব শিক্ষিত হয়ে উঠেছেন বলা বাহুল্য। তাই দেখা যাবে এই নাটকে গদ্য সংলাপ ও অসাধারণ কাব্যময় এবং শব্দ ব্যবহারে একটা পরিমন্ডলগত প্রাচীনত্ব রক্ষা করবার চেষ্টা আছে সবর্ত্র।

১ম দূত। রাজমন্ত্রী – সঙ্গে রাজপুরোহিত। কূটালাপে মগ্ন, আনতশীর – কিন্তু না, এই তো রাজমন্ত্রী আকাশের দিকে তাকালেন। তার মুখমন্ডল উৎফুল্ল। তার ওষ্ঠাধরে আশার উদ্ভাস...।

কিংবা,

তরঙ্গিণী।...

তাকিয়ে দেখব, তার অধর স্ফুরিত নয়নকোণ রক্তিম, কণ্ঠমনি স্পন্দমান।

মা, আমাকে আশীর্বাদ করো,- প্রভু আমাকে পদধূলি দিন – কন্দর্প, অতনু, পঞ্চশর, আমার সহায় হও।

গদ্যের এই সঙ্গীত বিভঙ্গ। বাক্যের এই ঐয়িন্দ্রজালিক আবেশ সাধারণ প্রচলিত নাটকের রূপ থেকে এ নাটককে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে দেয়। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে। নাটকের ক্লাইমেক্স ও এই অঙ্কেই পরিকল্পিত এই দৃশ্যটিতে সবথেকে বেশি পড়েছে রবনীন্দ্রনাথের প্রভাব। এখানে প্রধান ভাবে উপস্থিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী। বিভান্ডক এসেছেন সম্পূর্ণ নাটক ঘটে যাবার পর। পিতা পুত্রের সংলাপের ভিতর দিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের উপলব্ধি হবে তরঙ্গিনীকে। এরপ পরিকল্পিত দৃশ্যে তরঙ্গিণীর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গের সজ্ঞান আত্মাহুতি এবং তরঙ্গিনীর সঙ্গে তার নগর গমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামার পরিকল্পনায় দৃশ্যের পরিসমাপ্তি।

ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রথমে দেখি তার নাটকীয় একোক্তিতে। নাট্যদৃশ্য পরিকল্পনায় লক্ষণীয় দিকটি হল এই যে ঋশ্যশৃঙ্গের দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তার জীবন যাপন রীতি, তার ভাবনা পরিধি আনন্দ আস্বাদনের ভঙ্গী ও রুচি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। নাট্যসংহতি গড়ে উঠেছে একক সংলাপে। অন্য চরিত্রের উপস্থিতির সাহায্য নিয়ে সংলাপ ভঙ্গীতে লিখলে এইসব তথ্য পরিবেশনার জন্য অনেক বেশি সময় লাগত। কিন্তু এই অঙ্কের পার্ট যোগ্যতা যতটা আস্বাদ্য, দৃশ্যনাট্য হিসেবে অংশটি ততটা উপাদেয় হয়নি। যদিও এই বক্তব্য কে চারটি অংশে বিভক্ত করে ভিতরে ভিতরে নেপথ্যের দূরাগত বাঁশির ধ্বনি ব্যবহার করে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবৃতিধর্মী সংলাপের ত্রুটি মোচনের চেষ্টা হয়েছে। তবু মনে হয় শেষ রক্ষা হয়নি। তবুও এই নাটকে আরও একটি ব্যাপার দেখানো সম্ভব হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রে। তা হলো তার নিবিষ্টতা ও একাগ্রতা । প্রথম অঙ্কের প্রবাদও কম। এই ঋষির মৌলিক ও মনোগ্রাহী এই রূপ ছবি দর্শক ও পাঠককে অনেকক্ষণ বেঁধে রাখতে পারবে এই ভরসাই বুঝি নাট্যকার এ ঝুঁকি নিয়েছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপে ভিতর সায়নকালে, এই সব সংলাপ তো আসলে ঋষ্যশৃঙ্গের মনোজগতে নিভৃত ভাবনা। এই দীর্ঘ একোক্তিতে যে পটভূমি নির্মাণের চেষ্টা আছে তার উদ্দেশ্য ঋষ্যশৃঙ্গের ভাবনার চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো এবং তাই নাটক হিসেবে অংশটি প্রায় দুর্বল।

শব্দের ওপর অসাধারণ আধিপত্যে এই নাট্যদৃশ্য রচনায়। সবচেয়ে ঝুঁকি পূর্ণ ছিল এই অংশের নাট্যায়ন। শব্দের ব্যবহারে স্বগত ও প্রত্যক্ষ সংলাপ ব্যবহারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এখানে। মিলন দৃশ্য রচনায় অদ্ভুত ভাবে পরিকল্পিত হয়েছে চরিত্রদুটির অবস্থান।একই সনহগে লালসা জৈব আকর্ষণের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সদ্য লব্ধ কৌমার্য ভ্রষ্ট তরুণের অনন্ত কৌতুহল ও আকর্ষণ। ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম অজ্ঞান আত্মদানের মায়াবী দৃশ্যে সুনিপা তরঙ্গিণীর অসাধারণ অভিনয় নাটকের দৃশ্য ও পরিকল্পনা হিসেবে চূড়ান্ত সফল।

দ্বিতীয় গৌণ হয়ে গেছে মায়া ও স্বপ্ন। সত্য হয়ে উঠেছে নিরাবরণ। পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গের আত্ম উপলব্ধি নারী তরঙ্গিণীর আত্মপ্রকাশের অনুভবও যর্থাথ উঠে এসেছে সংলাপে –

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিণী কুমার তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিণী। তুমি আমার প্রিয় তুমি আমার বন্ধু।

তুমি আমার মৃগয়া তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভোক্ষ্য।

তুমি আমার বাসনা।

আমি তোমাকে চাই – তুমি প্রয়োজন।

তরঙ্গিণী। তবে চলো – চলো আমার সঙ্গে......

ঋষ্যশৃঙ্গ। কোথায় জাই কী এসে যায়?

কোথায় থামি কি এসে যায়?

আমি চাই তোমাকে

আমি চাই তোমাকে (বাহু বিস্তার)

তরঙ্গিণী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা, - আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহেনী, এসো মোহিনী। আমাকে তৃপ্ত করো।

একদিকে ঋষ্যশৃঙ্গের আজন্মের তপস্যা ব্রম্ভজ্ঞানের সাধনা অন্যদিকে নারীর দেহ মনের বৈভব। কোন দিকে যাবেন তিনি। বিভান্ডকের ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত সমস্যার সহজ সমাধান করলেন ঋষ্যশৃঙ্গ নারীতে উপগত হয়ে। সমালোচক বলেন – ‘তার চিত্তে নিশ্চয়ই দুই চৈতন্যের সংঘর্ষ হয়েছিল। নিশ্চয়ই দ্রুত শোণিত সঞ্চালিত হৃদপিন্ডের ধ্বনি তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল; কোনদিকে তিনি যাবেন। তপস্যা, সংযম, ব্রম্ভজ্ঞানী পিতার উপদেশ নাকি নারী, মোহিনী, মায়াবিনী। একদিকে আশৈশব আচরিত তপস্যা অন্যদিকে অকস্মাৎ বিস্ময়।’

এরপরে রংমঞ্চে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসার নির্দেশ। আর অস্পষ্ট আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা গেলো আলিঙ্গনাবদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীকে। তারপর অন্ধকার। অতঃপর আবার মঞ্চ আলোকিত হলে দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। চম্পা নগরের রাজপথ।

আকশে ঘন মেঘ। বিদ্যুতের চমক। নেপথ্যে জনতার কলরোল। তরঙ্গিণী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ রংমঞ্চ পার হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর শব্দে বৃষ্টি নামল। সবটার জন্য নেপথ্যের সাহায্য নিয়েছেন কবি। মেয়েদের স্বর পুরুষদের স্বর ও মেয়ে পুরুষদের সমবেত স্বর – সবই নেপথ্য থেকে ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের সূচনা তরঙ্গিনীকে নিয়ে। এযে তরঙ্গিণী বিবর্তিত। অজস্র পুরুষ- সঙ্গে অভ্যস্ত এই নারীর জন্মান্তরিত দশা দেখাবার জন্য পরিকল্পিত এই দৃশ্য। রাজপথের পাশে তরঙ্গিণীর ঘর জানলা দিয়ে দেখা যায় পথ। নাট্যপরামর্শে আছে – এই অংশে রাজপথ ও গৃহাভ্যন্তর একসঙ্গে দেখা যাবে। রাজপথে ঘোষক জানাচ্ছে রাজা লোমপাদ তার জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবন রাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। দিনক্ষণ নির্ধারিত। মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী তিথি। পুষ্যা নক্ষত্র।

এ সংবাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে তরঙ্গিণীর মধ্যে। বাইরে রাজপথে চন্দ্রকেতু ও অংশুমানের সংলাপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ২য় অঙ্কের ঘটনার প্রতিক্রিয়া। ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গের ঘটনায় তরঙ্গিণীর ঘটেছে জন্মান্তর। বুদ্ধদেব বলেছেন –

"একই মুহূর্তে জেগে উঠল তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের হৃদয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো পতন বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম' যেভাবে রবীন্দ্রনাথের পতিতায় বর্ণিত আছে, সেইভাবেই' এই জাগরিতা নারীকে দেখানোর প্রয়াস তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে। আবার প্রতিক্রিয়া চন্দ্রকেতুর মধ্যে যে তরঙ্গিনীতে অভ্যস্ত ছিল যার জন্য উন্মুক্ত ছিল তরঙ্গিণীর গৃহের দরজা। সে আজ বিচলিত। কেন না তরঙ্গিণীর মন নেই আজ তার চন্দ্রকেতুতে"।

তৃতীয় প্রতিক্রিয়া অংশুমানের জীবনে। যে শান্তাকে পেতে চেয়েছিল অথচ এই আকালের প্রতিকারের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হলও নগরে। শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হলো। এটা সম্ভব ছিল না কিছুতেই। যদি না তরঙ্গিণী ভাবগত ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নিয়ে আসতো সেই নগরে।

ঘোষকের দ্বিতীয় ঘোষণার পর বিষয়টা স্পষ্ট করে দিলেন নাট্যকার। রাজ্যে অর্ধমাসব্যাপী উৎসবের সংবাদে তিনটি চরিত্রের নিজস্ব মনোভাব অনুয়ায়ী তিন প্রতিক্রিয়াঃ

তরঙ্গিণী। (অভ্যন্তরে অস্ফুট তীব্রস্বরে) উৎসব।

অর্ধমাসব্যাপী উৎসব! যুবরাজ!

অংশুমান। উতসন! ... অসহ্য!

অংশুমান ঋষ্যশৃঙ্গ – বিষাক্ত ঐ নাম!

অংশুমান। যদি ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কখনও না হোতো! যদি এখনো ঋষ্যশৃঙ্গের অস্তিত্ব মুছে যায়!

চন্দ্রকেতু। আশ্চর্য তুমি যে আমারই মনের কথা বললে। আমিও ভেবেছি আমার দুঃখের মুল ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিণী তাঁকে ধ্যান ভ্রষ্ট করলে – বিরাট এই কীর্তি – কিন্তু তারপর থেকে সে নিজে আর স্বচ্ছ নেই। অংশুমান তোমার কি মনে হয় না এ দুয়ের মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

এই অংশে পৌঁছোবার পর চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে যায় দর্শকের কাছে। সাথে সাথে নাটকীয়তায় পড়ে আপাতত ছেদ।

চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর সংলাপ দৃশ্যে এসে কামনাতুর চন্দ্রকেতুর দূতী হিসেবে লোলাপাঙ্গীর আচরণ নতুন করে পাঠক দর্শক মনে জীবিত করে নিষিদ্ধ এক উত্তেজনা। সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কহীন এই নারী ও পুরুষের আচরণ ও সংলাপ উঠে এক সুপ্রাচীন কাহিনির মোড়কে ফ্রয়েড কথিত আমাদের একালের বাসনাময় জীবন।

পরবর্তী অংশে লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণী সংলাপ। তরঙ্গিণী চরিত্র উদঘাটনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিঞ্চিৎ দীর্ঘ এই অংশে দক্ষ লোলাপাঙ্গী – দূতি ও জননী চরিত্রের সম্মিলনে – অদ্ভুতভাবে বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। তবে সাধারণ মাপে রচিত তার অভিনয় সংলাপ। তরঙ্গিণী এই অংশে অসাধারণ কৃতিত্বে অঙ্কিত। বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন নাটকীয়তা ছিল না। সংবাদ একটিই – জীবনে প্রথম রমণী দর্শন মুগ্ধ পুরুষের আবির্ভাবে আপ্লুত, অভিভূত তার হৃদয়। সে তার যাপিত, অভ্যস্ত জীবন থেকে বিচ্যুত। তার এই

জন্মান্তরিত জীবনের বাইরে স্থির প্রশান্তিও নিস্পৃহতা। এবং তার অন্তরের অতলে অফুরন্ত তোলপাড় চলছিল একটি পুরুষকে ঘিরে। এই ব্যাপারটি ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যদৃশ্যে তার জননী লোলাপাঙ্গীর উপস্থিতি ঘটিয়েছেন নাট্যকার। পরিকল্পনার দিক থেকে প্রশংসনীয় এই অংশ। তার চেয়েও বড় কথা, একটা ঘটনা অবতারণা করে একই সঙ্গে দুটো চরিত্রকে উন্মোচিত করেছেন কবি, নাট্যকার নয়, ঔপন্যাসিকের দক্ষতায়। দৃশ্য-সংলাপের মঞ্চনির্ভরতায় ছাপিয়ে এই অংশ কথাসাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভিপ্রায়ী হয়ে উঠেছে। নাটক মার খেয়েছে। কিন্তু তার ক্ষতিপূরণে এসে দাঁড়িয়েছে মনস্তত্ত্ব। একইসঙ্গে বিষয়মুখী জননীর জীবনে আবির্ভূত পুরুষের ইতিহাস। তরঙ্গিণীর পিতার স্মৃতিচারণার সুবাদে তার কৌতুহলী জিজ্ঞাসায় Dissolve হয়ে যাচ্ছে বারবার নিজের ঐ প্রেম অভিজ্ঞতার অনুভবঃ

তরঙ্গিনী। হঠাৎ মা, আমার পিতা কে ছিলেন তা তুমি জানো?

লোলাপাঙ্গী। কোমল স্বরে জানি, বাছা। কিন্তু তার কথা কেন?

লোলাপাঙ্গী। আমিও তাঁকে মন থেকে মুছে দিলাম।

তরঙ্গিনী। মুছে দিলে?

লোলাপাঙ্গী। মুছে গেলো – যাবেই। অনুরাগ, অভিমান, মনোবেদনা – এই পদার্থগুলো সারবান নয়, কর্পুরের মতো উবে যাওয়া।

ওদের স্বভাব।

তরঙ্গিনী। তোমার সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। মনে পড়ে নি

লোলাপাঙ্গী। আর দেখা হয়নি। মনেও পড়েনি।

তরঙ্গিনী। মনেও পড়েও নি।

লোলাপাঙ্গী। বারাঙ্গনারা স্মৃতি নিয়ে বিলাপ করেনা। তরু, স্বর্কমে

যাঁদের নিষ্ঠা আছে, তারা অন্য সব ভুলে যায়।

তরঙ্গিনী। কিন্তু – প্রথম যখন দেখা হলো – তিনি কি মুগ্ধ ছিলেন? কেমল করে তাকাতেন তোমার দিকে? তোমার মনে পড়ে? কখনও কি তোমাকে বলেছিলেন – ‘তুমি ছদ্মপবেশী দেবতা? তুমি মূর্তিমতী আনন্দ?’ তোমার মনে পড়ে?

আসলে তরঙ্গিনী মায়ের স্মৃতির দর্পনে নিজস্ব লব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণা করেছে। পরবর্তী অংশে চন্দ্রকেতু ও তরঙ্গিণীর সংলাপে খুব স্পষ্ট করে দেওয়া হল তরঙ্গিণীর জীবনে ঋষ্যশৃঙ্গ ছাড়া আর সব পুরুষ সাধারণত ম্লান, প্রথাবদ্ধ জীবনের শিকলে বাধা। আর তরঙ্গিণীর নিজস্ব অনুভবে ঋষ্যশৃঙ্গের আবির্ভাব, তার মুগ্ধ প্রশংসা তার স্তুতি ও অভ্যর্থনা অনন্য, অভাবিত। ফলত চিরকাল প্রার্থিত সেই অভিজ্ঞতা যা একবার সত্যই এসেছিল তার জীবনে আজ সত্যতর তার অনুপস্থিতি।

কিন্তু আমি যা চাই, তা কি তুমি দিতে পারবে –

"আমি চাই আনন্দ। প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ, প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাব। দেখতে পাব আমার অন্য মুখ, যা কেউ দেখেনি, অন্য কেউ দেখেনি (যেন তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠে ক্ষণকাল পরে) আমাকে মার্জনা কর, আমি অসুস্থ আছি। বিদায়।"

এখানেই এই অঙ্কের সমাপ্তি হতে পারত। কিন্তু এর পরেও চন্দ্রকেতুও লোলাপাঙ্গীর – সংলাপ ও ঘোষকের উপস্থিতিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর বিবেচনায় তরঙ্গিনী এক দুর্বধ্য অসুখের শিকার। হয়তো বা ঋষির তপভঙ্গের কারণে তার দ্বারা অভিশপ্তা এই লাস্যময়ী নারী। শিবের তপভঙ্গের কারণে মদনের আত্মাহুতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে চন্দ্রকেতু বিষয়টাকে আরও বিশ্বাস্য করে তুলতে চেয়েছে। মূল কাহিনি থেকে এই বিস্তার বা বিচ্যুতি যে নাট্যকারের কাঙ্ক্ষিত নয়, তরঙ্গিনী যে সর্বাত্মক ভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা গ্রস্ত তার বিশ্বাস্য গহন জটিল এক রূপ তুলে ধরে। এই দৃশ্যের যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন নাট্যকার। এই পরিকল্পনায় গভীর ভাবে চন্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদার ঋণ অনুভূত হয়। চন্ডালিকার মা এর ভাবনা স্মরনীয়ঃ "বাছা মন্ত্র করেছে কে তোকে" – দীর্ঘ হলেও এই গুরুত্বপূর্ণ নাট্যপরিকল্পনাটি আমাদের নির্বাক ও অভিভূত করে রাখে। সুখপাঠ্য সেই কাব্য সংলাপে তরঙ্গিণীর বিপর্যস্ত মানস- অবস্থা কে দৃশ্য বদ্ধ করেছেন কবি নাট্যকার।

তরঙ্গিনী।	দর্পন বলো সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সেকি দীর্ঘাঙ্গী।

আমার চেয়ে আরও তন্বী। তার অধর আরও রক্তিম/

বক্ষ আরও সুগন্ধি? তার বাহুতে কি আরও বিশাল

অভ্যর্থনা?

অঙ্গে অঙ্গে লাস্য আরও উচ্ছবল ?...

রাজকুমারী শান্তা! জামাতা! যুবরাজ! তুমি কি তৃপ্ত?

আমার লজ্জা আমার গর্ব, আমার যন্ত্রণা! আমি রিক্ত আমি

সর্বশান্ত ...

(দর্পণে গভীর ভাবে তাকিয়ে) এই কি সেই মুখ, যা তুমি

দেখেছিলে? 'তাপস তুমি কে?

কোন স্বর্গের দূত? কোন ছদ্মবেশী দেবতা?' এই মুখ এই

দেহ এই বসন, এই অলঙ্কার। তুমি কি আমাকেই

দেখেছিলে, এই আমাকে? 'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ

তোমার চরণে, স্মরণীয় পতিতাঃ ছুটে আনন্দ

নয়নে তোমার ছুটে আনন্দ, চরণ চুমি' কজ্জ্বল, অলক্তক, লোধ্ররেণু – আমি কি তোদের কাছে ঋণী।

বসন ভূষণ, মালা , চন্দন তোদের কাছে?

(এই অংশের ভাবনায় চিত্রাঙ্গদার মনস্তত্ত্বের ছলক স্পষ্ট)

কিন্তু এ তো তুমি দেখেছিলে – এই ত্বক, মাংস, মেদ, কান্তি – এই শরীর! আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি – জাগরণে দেখি না কেন? কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন? ... নাকি আমারই ভ্রান্তি? নাকি তুমি যাকে দেখেছিলে সে অন্য কেউ? আবরণ নয়, প্রসাধন নয়, মাংস কান্তি নয় – সে কে তবে?

এই দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে কাব্য ও নাটকের অপূর্ব মেলবন্ধন দেখি আমরা। তরঙ্গিণীর একক অভিনয়ে তার মনো জগতে এক একটি স্তর উন্মোচিত হয়েছে। অভিনয়ে এই

সুর স্বরকে; এই উদার উদাস হিংস্র ও স্বার্থপর মানসভূমিকে পর্যায়ক্রমে ছুঁয়ে আসবে তরঙ্গিনী। সব শেষে তার তীব্র নায়িকা বৃত্তি থেকে উঠবে প্রবল চ্যালেঞ্জ।

“আমি তরঙ্গিনী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারব না?”

সংলাপের এই অংশে আমরা, দর্শকেরা নাটকের সম্ভাবনায় আর একবার উজ্জীবিত হওয়া মাত্রই মঞ্চে নাটকীয় ভাবে যবনিকা নেমে আসে।

চতুর্থ ও শেষ অঙ্ক মূলত ঋষ্যশৃঙ্গ নির্ভর। যেমন তৃতীয় অঙ্ক নির্মিত হয়েছে তরঙ্গিণীর মানস অবস্থাকে অবলম্বন করে। চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্য পরিকল্পনা এইরকমঃ

“রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ সংলগ্ন কক্ষের অংশ দেখা যাচ্ছে। অলিন্দে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশে দাঁড়িয়ে। কক্ষে শান্তা উপবিষ্ট, সে কেশ বিনাশ করছে, সামনে দর্পণ ও কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য। বাইরে আকাশে পড়ন্ত বেলা। লক্ষণীয় তৃতীয় অঙ্কের শেষে তরঙ্গিণীর হাতেও দর্পনের ব্যবহার ঘটিয়েছেন নাট্যকার। দর্পনের সঙ্গে তরঙ্গিণীর অবচেতন স্তরের দু একটি সংলাপ ও ব্যবহৃত হয়েছে।”

কিন্তু মনে রাখতে হবে তৃতীয় অঙ্কের শেষ ও চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় সময় গত ব্যবধান ঘটে গেছে। ঋষ্যশৃঙ্গের ঔরসে শান্তার গর্ভে সন্তানের ভূমিষ্ট হবার পর পরিকল্পিত হয়েছে এই দৃশ্য। বাইরের আকাশে পড়ন্ত বেলায় কি ঘনীভূত হয়েছে তপস্বীর পৌঢ়জীবন? যদিও তরুণ ঋষির নগরে প্রবেশের পর মাত্র এক বছর অতিবাহিত হল? নাকি এই পড়ন্ত সূর্য বিগতকাম ঋষ্যশৃঙ্গের মানসভূমির ইশারা ধারণ করে আছে?

অলিন্দ থেকে কৃতার্থ নারী ও পুরুষদের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ যখন দেখ করছিলেন, তখন ঘরের মধ্যে শান্তা ছিল প্রসাধন কর্মে নিযুক্ত। দুজনে ছিলেন দুজনের থেকে নদীর গিরির ব্যবধানে। এই অসীম ঐশ্বর্য, এই রাজবেশ, এই স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা থেকে বিযুক্ত, বিরক্ত এক অন্য হৃদয় নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন অলিন্দে। আর শান্তা শান্তবধূ, আত্মমগ্ন নারী ছিলো সুখী গৃহকোণে।

কিন্তু শকুন্তলা নাটকের হংস্পদিকার মত এক গান গেয়েছে শান্তা। সে গান যুগপৎ রাজবেশী ঋষ্যশৃঙ্গের দীর্ঘ সংলাপকে ভেঙে তার স্তরে স্তরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে

শান্তার গানের বিস্তার। দীর্ঘ সংলাপের ক্লান্তি কাটিয়ে গান ও আবৃত্তিতে; সুর ও স্বরে সমৃদ্ধ হয়েছে দৃশ্য। এবং অথবা উভয়ের পরিপূরক ব্যাখ্যা হয়ে উঠেছে।

নাটকের এই অংশে প্রায়োগিক দিক থেকে পরিকল্পনাগত একটি ত্রুটি ঘটেছে বলে মনে হয়ঃ

একই কক্ষের অলিন্দে ঋষ্যশৃঙ্গ আর অভ্যন্তরে শান্তা যে ধ্বনি উচ্চারণ করছেন গানে ও কথায়(কবিতায়) তা কি পরস্পরকে সচেতনভাবে বিদ্ধ করছে না? দর্শক হিসেবে আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু নাট্য প্রয়োজন হিসেবে বুদ্ধদেবের প্রতিপাদ্য – দুজনেই আত্মমগ্ন। নিজস্ব জগতে তাঁরা নিমজ্জিত। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ দুই আকাশের দুটি ধ্রুবতারার দিকে – এক তরঙ্গিনী দুই অংশুমান। ফলে তাঁদের উচ্চারণে দর্শক আমরা সচেতন হয়ে উঠলেও, থিয়েটার ও যাত্রার পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখে ধরেই নেবো যে, অলিন্দ ও কক্ষের দূরত্ব জাই থাক এই স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে শোনেননি। তবেই যথার্থ হবে। শান্তার উপস্থিতি টের পেয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের উক্তিঃ

শান্তা, এ মুহূর্তে তোমার দর্শন পাবো ভাবিনি।

এই অংশে ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার রাজবাড়ির গতানুগতিক জীবনের একটি সাধারণ চিত্র আছে। যে ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্কের প্রথমের দিকে উচ্চারণ করতে শুনেছিলামঃ

বিস্বাদ – এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা,

আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,

বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।

আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী।

ওরা জানে না, কেউ জানে না –

আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

যে শান্তা গেয়েছিলঃ

সুন্দর তুমি পেটিকা,

অন্তরে নেই রত্ন

পাত্র এখনো মণিময়

নিঃশেষ তার সৌরভ।

সেই ঋশ্যশৃঙ্গ কি চতুর ব্যবস্থাপনায় অভ্যস্ত হয়ে প্রশংসা করেন শান্তার শাড়ীর রঙের। সেই শান্তা কেমন পারদর্শিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের সেবা ও শুশ্রূষায় নিরত। একেই জীবন বলে? এই গড্ডালিকা প্রবাহ। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ, প্রেমিক ঋষ্যশৃঙ্গ, সত্যবাদী ও সত্যদ্রষ্টা ঋষ্যশৃঙ্গ আজ কোথায়? এক তৃপ্তিহীন দাহ, এক গোপন সন্ধান নিয়ে রাজ অন্তঃপুরের সেবা ও সম্মানের পাহারায় বন্দী জন্তুর মত ঋষ্যশৃঙ্গ আত্মত্রাণের মুহূর্ত খোঁজেন এইভাবেঃ

শান্তা। ...আপনি এখন অন্তঃপুরে আসবেন না?

ঋষ্যশৃঙ্গ। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) সূর্যাস্তের এখনো কিছু বলম্ব আছে। আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করি।

শান্তা। কিন্তু অধিবেশনের সময় প্রায় উর্ত্তীণ। আবার কোনো দর্শনপ্রার্থী এলে –

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি সতর্ক থাকবো।

শান্তা। যদি শ্রান্তি বোধ করেন –

ঋষ্যশৃঙ্গ। তোমার মত সান্ত্বনাদাত্রীকে যে পেয়েছে, সে কি কখনও ক্লান্ত হয়?

উভয়ের জীবন জাপনের এই অন্তঃসার শূণ্যতাটুকু অব্যর্থ ভাবে নাট্যায়িত হয়েছে এখানে। শান্তার সাবধান সাংসারিক ভাবনাকে দুদুবার প্রায় মাঝপথে থামিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কথা ওঠার মধ্যে আছে শান্তার থেকে তার পলায়নী মনোবৃত্তির কৌশলী প্রয়োগ- প্রক্রিয়া।

এই অঙ্কের পরবর্তী অংশ শুরু হলো বিভাণ্ডকের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। বিভাণ্ডক এসেছেন পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তিনি রাজপুরীর ক্লেদাক্ত, ভোগ পিচ্ছিল জীবন স্রোত থেকে পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। তিনি ঋশ্যশৃঙ্গের মধ্যে এই ভোগাসক্তির ভেতরে এক বিরক্ত সন্ন্যাসীকে খুঁজে পেলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি এই অন্য কিছুর সন্ধানী আসলে কি চায়, কাকে খোঁজে। পিতৃ স্নেহে বিবশ বিভাণ্ডকের

মনে ঋষ্যশৃঙ্গের তপোভ্রষ্ট হবার কষ্টও ছিল। তবে কোনটা বেশি তা স্পষ্ট ছিল না। ঋষ্যশৃঙ্গ স্পষ্ট দেখলেন দুর্বলচিত্ত এক স্নেহার্ত পিতাকে। এও ঋষির যোগ্য নয়। আর সেই পিতার একান্ত অনুরোধের জবাবে ঋষ্যশৃঙ্গের সুদৃঢ় শপথের মতো উচ্চারণ শুনি নাটকেঃ

ঋষ্যশৃঙ্গ। (পিতার দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে) কিন্তু আমারও

কিছু প্রয়োজন আছে পিতা। আমিক চাই (থেমে গিয়ে)

কি চাই জানি না। (হঠাৎ দৃঢ় স্বরে) না, আমি ফিরে জাবো না। আমি এখানেই থাকবো। অন্য এক প্রতীক্ষায় অন্য এক প্রতীজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।

বিভান্ডকের ব্যর্থ মনোরথ ফিরে জাবার পর ঋষ্যশৃঙ্গের একক উচ্চারণ দিয়ে এই অংশের সমাপ্তিঃ

পতি - পিতা- যুবরাজ – আমি

ব্রম্ভচারী – বনবাসী – আমি?

না – না – আমি তোমার।

অসহ্য নগর – অসহ্য জনতা –

কিন্তু এইখানেই আমার অপেক্ষা – তোমার জন্য । তোমার জন্য।

অংশুমান ও ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ দিয়ে এই অঙ্কের পরবর্তী অঙ্ক শুরু তীব্র নাটকীয়তার মধ্যে অংশুমান ও শান্তার সম্পর্কটি উন্মোচিত হবে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। একে তিনি সত্যের প্রকাশ মনে করেন। সহজে নিয়েছেন এই সত্যকে। এরপর তিনি উদ্যত হয়েছেন তার নিজের অন্তরের সত্য উন্মোচন করতে। খুব সহজে ঋষ্যশৃঙ্গও তরঙ্গিণীর জন্য তার উন্মুখতা প্রকাশ করতে পারতেন এখানে। কিন্তু নাট্যকার সংগত ভাবে বিষয়টিকে পরিবেশন করেছেন নাটকীয় ভঙ্গীতে। এখানেই দৃশ্যে প্রবেশ করেছে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু। তাঁদের কাছ থেকে ঋশ্যশৃং সন্ধান পাবেন তরঙ্গিণীর। এই দৃশ্য পরিকল্পনায় দুটি বিষয় আমাদের ভাবায়-

১। তৃতীয় অঙ্কের শেষে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতু বেরিয়েছিল ঋষ্যশৃঙ্গের উদ্দেশ্যে। চতুর্থ অঙ্কে তারা পৌঁছল। মাঝে সময়ের ব্যবধানটা বড় বেশি বলে মনে হয়। নাট্যকার বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাকাল একই দিন। এই দুটি ঘটনাকে যদি কাছাকাছি ভাবি তবে বুঝতে হবে দ্বিতীয় অঙ্ক ও তৃতীয় অঙ্কের মাঝখানে অবিশ্বাস্য রকমের সময়ের ব্যবধান ঘটেছে। নাটকের উল্লেখ থেকে যার সময়গত দূরত্ব মাত্র এক বছর।

২। দ্বিতীয় যে বিষয়টি ভাবতে হয় তা হলো তরঙ্গিণীর সন্ধানের জন্য এক বছর মনের ভিতরে গুমরে মরা ঋষি রাজজামাতা কোন ভাবেতরঙ্গিনীর সন্ধান নেবার চেষ্টা করলেন না – এটা কতখানি বিশ্বাস হয়েছে? শেষ অবধি তরঙ্গিণীই তাঁকে খুঁজে এলেন? তপস্বী তো পারেন নি।

তাহলে কি জনগন ও রাজগৃহের মধ্যে এতোটা দূরত্বের কথা ভাবতে হবে আমাদের। অথচ এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতিনিয়ত প্রজা সন্দর্শন। কীভাবে তাঁকে এই নগরে আনা হয়েছে, কে এনেছে তা কি বুঝতে না পারার মতো অবস্থায় ছিলেন ঋষি? এতো দিনেও তা জানা সম্ভব হয় নি সেই ঘোরের জন্য? এই ফাঁক নাট্যকার লক্ষ্য করেননি।

লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর প্রবেশে পর নাটকে নতুন দৃশ্যের সূচনা হয়। তখন শান্তা ও অংশুমানের কাছে তরঙ্গিনীকে ঘিরে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চাইছেন ঋষ্যশৃঙ্গ। সে কথা ঋষ্যশৃঙ্গের একটি স্বীকারোক্তিতে না রেখে একটি দৃশ্যে ছড়িয়ে দিলেন নাট্যকার। ফলে নাটক আর একটু দীর্ঘ হলো। শুধু তাই নয় প্রতিটি চরিত্র ফিরে পেল তাঁদের নিজস্ব ভূমি। ঋষ্যশৃঙ্গের পুরুষোচিত ঘোষণায় কঠোর সত্যের মতো উদ্‌ঘাটিত হলো তপস্বী ও তরঙ্গিণীর সম্পর্কঃ

ঋষ্যশৃঙ্গ। শান্ত হও সকলে শোন – আমি সকলের সামনে বলছি
এই যুবতী আমার ইপ্সিতা।
আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে
পুরুষ তাও জানতাম না।

সে আমাকে জানিয়ে ছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ তার কাছে।

সে আমার পরিত্যজ্যা নয়, সে আমার অন্তরঙ্গ।

তার কাছে – অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে – আমি

ত্রাতা নই, অন্নদাতা নই, যুবরাজ নই- মহাত্মা নই-

একমাত্র তাঁরই কাছে কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নই আমি।

চতুর্থ অঙ্কের নাট্যকৌশল নিয়ে বুদ্ধদেব সচেতন ছিলেন। তাই প্রযোজনার জন্য পরামর্শে তিনি জানিয়েছেনঃ 'চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের ভূমিকাটি অভিনেতার বিশেষ কলানৈপুণ্যের দাবি করবে। অন্তর্বতী এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন। শিখেছেন রাজপুরুষোচিত বৈদগ্ধ্য ও কপোটতা, বেকিয়ে ও ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন অথচ তার সহজাত শুদ্ধতা এখনো অস্পৃষ্ট জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরি, শ্লেষ এবং এক অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা – এই বিভিন্ন ভাগগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই সাংসারিকতা রাজবেশের মতোই তার ছদ্মবেশমাত্র;

এবার যে দ্বিতীয় অঙ্কের ঘোটনাটি উল্টে গেল অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গেই চাইলেন তরঙ্গিনীকে ভ্রষ্ট করতে, আর তরঙ্গিণী খুঁজল ঋষ্যশৃঙ্গের সেই স্বর্গ, যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন, এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গই তরঙ্গিনীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। নায়ক - নায়িকার এই বিবিধ পরিবর্তন প্রসূত ঊর্ধ্বতন যতটা কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যাবে ততটাই এই নাট্যাভিনয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা। '

লক্ষণীয়, বুদ্ধদেবের একটি বাক্যাংশ – নায়ক নায়িকার এই বিবিধ পরিবর্তন প্রসূত উদ্বর্তন – ব্যাপারটা কেবল উল্লিখিত দুটি চরিত্রেই নেই। শান্তা ও অংশুমান, চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গী – প্রত্যেক যুগলের মধ্যেই এই উদ্বর্তন ঘটেছে।

আমাদের অভ্যাসের সমস্ত সংস্কারকে গুড়িয়ে নাটক এগিয়ে চলে। একটি সন্তানের জন্মদাত্রী শান্তা ঋষির ইচ্ছায় ফিরে কৌমার্য। ফিরে পাই তার বাঞ্ছিতকে। পুরাণ এখানে এই সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হয় মাত্র। আসলে আমাদের আধুনিক মনের ইচ্ছার এক

স্বপ্নবয়নে ঋষিকথা প্রেরণা হয়ে আসে। যেহেতু নির্মম এই সত্য ঋষ্যশৃঙ্গই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি কিছুই বিস্মৃত হয় নি। শান্তা, এত দিনে বলার সময় হলো। রাত্রে অন্ধকারে – তুমি যখন আমার বাহুবন্ধে ধরা দিতে আমি কল্পনা করতাম তুমি শান্তা নও। সেই অন্য নারী।...

ঋষ্যশৃঙ্গ। হয়তো তুমিও কল্পনা করতে আমি ঋষ্যশৃঙ্গ নই, আমি অংশুমান। সেই ছলনা আজ শেষ হলো। আজ শুভদিন।

অতএব ঘটনা পরিবেশনায় চরিত্রের এই মুহূর্মুহূ অবস্থান – বদলের নাটক চতুর্থ অঙ্কে সবচেয়ে বেশি আছে বলে নাট্যকার ভাবিত ছিলেন অংশটির অভিনয় – সাফল্য নিয়ে।

তবে এই অঙ্কের সবচেয়ে অভাবনীয় অংশ হল – চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর পরিণাম। বাস্তবে যে এমন সম্পর্ক ঘটে না কোথায়ও তা হয়তো নয়। আর লোলাপাঙ্গীদের জীবনযাত্রায় তো এমন পরিনাম খুব অসম্ভবও নয়। কিন্তু দর্শক ও পাঠকের সংস্কারে কোথায় অজানন্তে যেন পাঠকের কোথায় আঘাত করে বসে এই অংশ দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। এক্ষেত্রে দৃশ্য বিন্যাসে নাট্যকারের আরও সতর্কতা দরকার ছিল বলে মনে হয়।

ঋষ্যশৃঙ্গের গৃহত্যাগের পর অংশুমান শান্তা রাজপুরোহিতের প্রসঙ্গ শেষ করে।

নাটকের সূচনা অংশ যেমন, তেমনি অবশ্যই সমাপ্তির অংশ ও দর্শক মনে প্রভাব তৈরি করে। তাই তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকের বক্তব্যের যে গাম্ভীর্য পরিশ্রমী নাট্যকার তুলে ধরেছেন তা কি লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুর সংলাপ দিয়ে রচিত পরিণতিসূত্র বহন করে (Catastrophe) বহন করেছে।

চন্দ্রকেতু। আমরা দুজনে এখন সমদুঃখী। চলো।

লোলাপাঙ্গী। আমি এখনো বৃদ্ধা হইনি। চলো।

এই উপসংহতি সম্পর্কে কবিও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন বুঝি। তাই তিনি বলেনঃ “তবে এ প্রসঙ্গে আমার একটি বক্তব্য না জানিয়ে পারছি না। লোলাপাঙ্গী চরিত্রটি যেন কখনোই ‘কমিক’ হয়ে না ওঠে (অভিনেত্রী অসর্তক হলে তা হতে পারে না তা নয়) তার কোনো

কথা বা ভঙ্গিতে দর্শকের যদি প্রবল হাস্যোদ্রেক হয়, সেটা হবে নাটকের বিষয়বস্তুর পক্ষে অত্যন্ত বেসুরো, এবং নাট্যকারের পক্ষে মর্মান্তিক। (সারা নাটকটিতেই কোন উচ্চ হাসির অবকাশ নেই, অন্তত আমার অভিপ্রায়ের তা সম্পূর্ণ বহির্ভূত)। কখনও কখনও লোলাপাঙ্গী আমাদের মৃদু কৌতুক জাগাতে পারে, কিন্তু অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতার যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি তার মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম।

নাটকের সর্বশেষ মুহূর্তে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর অভিনয় হবে অতি সুকুমার, বোঝাতে হবে যে তাঁদের দুঃখটা মেকি নয়, কিন্তু তাঁদের পক্ষে জীবনের গ্রাস অপ্রতিরোধ্য। কিছুটা অচেতনভাবে আত্মপ্রতারণা করছে তাঁরা, কেননা তরঙ্গিনীকে হারবার পরেও তাঁদের বেঁচে থাকতে হবে। তার ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং ঈষৎ করুণ; যেহেতু তারা ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং ঈষৎ করুণ; যেহেতু তাঁরা সাধারণ, এবং পরাজিত, তাই আমাদের অনুকম্পা তাঁদের প্রাপ্য।" এসব কথা যদি মেনেও নিই তা হলেও আমাদের বক্তব্য প্রত্যাহারের কোনো কারণ দেখি না। কেননা নাকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলঃ

'লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হ'লো – নাটকটির মূল বিষয় হলো তাই।'

সেই কারণে আমাদের মনে হয় নাটকের উপসংহতি সেই বক্তব্যের পরিবেশনায় ব্যর্থ হয়েছে। যেন চন্দ্রকেতু লোলাপাঙ্গীর সমস্যাই এখানে লেখকের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। তপস্বী ও তরঙ্গিনীকে ঘিরে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্যকে নাটকের অন্তিম উপস্থাপনের বেলায় সম্পূর্ণ সফল হননি নাট্যকার। এক বিচলিত শিল্পী মানস শান্তা অংশুমান, লোলাপাঙ্গী চন্দ্রকেতুদের জীবন সমস্যার সমাধান সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে এত যত্নে গড়ে তোলা নায়ক নায়িকার গভীর ও গম্ভীর সমস্যাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছে। ৪র্থ অঙ্ক যেন বড় দ্রুত সমাপ্ত হয়েছে। হয়তো বা পঞ্চমাংক নাটক রচনা করবার সচেতন ইচ্ছাতেই ৪র্থ অঙ্কের এত ঘটনাবহুল ও জটিল করে তুলেছে। কবি বুদ্ধদেব নাটকের একাধিক এপিসোডের এই উপসংহার রচনায় নাট্যকার সুলভ স্থিরতার পরিচয় দিতে

ব্যর্থ হয়েছেন। মুখ্য প্রতিপাদ্য থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলে, তপস্বী ও তরঙ্গিণীর উপসংহারের গঠনগত ত্রুটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না

৯.৩ অনুশীলনী

১) তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের উৎপত্তিগত বিস্তার ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা কর।

২) তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকে পুরাণের বিনির্মাণ কীভাবে ঘটেছে নাটকের বিশ্লেষণ করে দেখাও।

৩) দৃশ্য বিভাগের গ্রন্থনের মধ্যে দিয়ে কাব্যিক সংযোজনের কি কোন বিশেষ দিক তোমার চোখে পড়ে?

৪) তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে সংলাপের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫) তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে ভাষার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যক্ত করো।

৯.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাটকের বিবর্তন – বৈদ্যনাথ শীল।

২) বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার – কমলেশ চট্টোপাধ্যায়।

৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক – পুলিন দাস।

৪) তপস্বী ও তরঙ্গিণী – লায়েক আলি খান।

৫) বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী তরঙ্গিনী – ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য।

একক ১০- তপস্বী ও তরঙ্গিনী নাটকের চরিত্র নির্মাণের বৈচিত্র্য

বিন্যাসক্রম

১০.১ নাটকের চরিত্রায়ন

১০.২ ঋষ্যশৃঙ্গ

১০.৩ তরঙ্গিনী

১০.৪ শান্তা

১০.৫ লোলাপাঙ্গী ও বিভান্ডক

১০.৬ অংশুমান

১০.৭ চন্দ্রকেতু

১০.৮ রাজমন্ত্রী

১০.৯ রাজপুরোহিত

১০.১০ শ্লীলতা ও অশ্লীলতা এবং তপস্বী তরঙ্গিণী

১০.১১ অনুশীলনী

১০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১৩ উপসংহার

১০.১ চরিত্রায়ন

‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ নাটকে প্রধান চরিত্র মাত্র দুটি। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী। কিন্তু এই দুটি চরিত্রকে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলতে নান দিক থেকে আলো ফেলে সাহায্য করেছে আরও কয়েকটি গৌণ চরিত্র। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভান্ডক। তরঙ্গিণীর জননী লোপাপাঙ্গী এবং তরঙ্গিণীর প্রেমিক চন্দ্রকেতু। এছাড়া কাহিনির মধ্যে এসেছে অন্য একটি বিভাগ। শান্তা ও অংশুমান প্রসঙ্গ। এজন্য শান্তা –অংশুমান চরিত্র বাদে এখানে আছেন রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিত। গৌণ চরিত্রের তালিকায় আরও আছে গাঁয়ের মেয়েরা, দুইরাজদূত এবং ঘোষক। এছাড়া তরঙ্গিণীর সখীদের উপস্থিতি আছে, সংলাপ নেই নাটকে।

১০.২- ঋষ্যশৃঙ্গ

এই নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। পুরাণ কাহিনির এই চরিত্রে বুদ্ধদেব সঞ্চারিত করেছেন আধুনিক মানুষ- ভুবনের দ্বন্দ্ব ও বেদনা। পুরাণের এই চরিত্রটি নির্মাণে বুদ্ধদেব কয়েকটি স্তর অনুসন্ধান করেছেন। সেই গুলি হল –

১। ঋষি তপস্বী ও অস্খলিত পৌরুষ।

২। প্রথম নারীর সংসর্গে তাঁর জাগ্রত পৌরুষের অনুভব। বারাঙ্গনার শরীর ছুঁয়ে অপার্থিব কাম তৃষ্ণার আস্বাদ।

৩। তাঁর বিবাহ উত্তর জীবন- অভিজ্ঞতা। বিস্বাদ ও ক্লান্তিকর যৌন জীবন
যাপনের মধ্যে তরঙ্গিণীর সঙ্গে সম্পৃক্তির প্রথম অলৌকিক স্বাদের ব্যর্থ
সন্ধান।

৪। সব শেষে পৌরুষের প্রেরণায় দীক্ষাদাত্রী নারী অনুধ্যানে যথার্থ। প্রেম
এবং কামোত্তীর্ণ অনুভবে মহানিষ্ক্রমণে যাত্রা।

ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব এইখানে যে তিনি আজন্ম কুমার। শুদ্ধ ব্রম্ভচারী। পৌরাণিক পটভূমিতে এমন ঘটা সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। কেন না নরনারীর যৌন সম্পর্কের অভিজ্ঞতাহীন একাধিক চরিত্রকে আমরা সাহিত্যে পেয়ে যায়। মিরন্দা কিংবা শকুন্তলা চরিত্রকে এই সূত্রে মনে পড়ে যায়। যদিও শকুন্তলার পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল পরোক্ষে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক। তাঁর সখীরা হয়তো তাঁকে এই

ব্যাপারে শিক্ষিত করে তুলে ছিল। কিন্তু মিরন্দা জানত না নারী – পুরুষের সম্পর্ক। নির্জন দ্বীপে একাকিনী সে কেবল তাঁর পিতাকে দেখেছিল। ফার্দিনান্দকা দেখার পর সে প্রথম প্রশংসায় মুগ্ধ হয়েছিল। মিরন্দা একাকী যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, অসংকোঁচে সে পিতার কাছেও তা প্রকাশ করেছিল।

“Lord, how its looks about believe me, sir,

It carries a grave form. But it’s spirit.” (The Tempest)

ঋষ্যশৃঙ্গেরও সেই অজ্ঞতা। যে অজ্ঞতা থেকে অসংকোঁচে তিনি বিবৃতি দেন তাঁর পিতার কাছে তাঁর সমস্ত যৌন অভিজ্ঞতার।

১। তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায় নন, দেবতার

মতো কান্তিমান। কনক তুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়;

তাঁর মস্তকে নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের গ্রীবা; দুই

কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমন্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন

উদ্ভাসিত উষা; বালার্কের মতো করুণ বর্ণ তাঁর কপোল।

তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগ নির্লোম; বক্ষে দুটি মনোহর মাংসপিন্ড

নৈবেদ্যের মতো বর্তুল ......

ঋষ্যশৃঙ্গের এই বর্ণনার পাশাপাশি বুদ্ধদেবের অন্য রচনা উদ্ধার করা যায়। নারীর বুকের বর্ণনা এক সজ্ঞান যৌন সচেতন পুরুষের অভিজ্ঞতায়ঃ

আলো জ্বেলে দেখলুম সুন্দর একটি ছবি। মালতী ঘুমিয়ে আছে, শাড়িটা উঠে গিয়ে নিটোল একটা পএ দেখা যাচ্ছে হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত, আঁচল সরে গিয়ে একটি স্তন সম্পূর্ণ বেরিয়ে পড়েছে –

২। ঋষ্যশৃঙ্গ।... সেই অলোকলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী আমাকে আলিঙ্গন করলেন – যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে লতা। তাঁর মুখ আমার মুখের উপর ন্যস্ত করে অধরের সঙ্গে অধরের সংযোগ চুম্বন করলেন আমাকে – যেমন পুষ্পকে চুম্বন করে ভৃঙ্গ। আমার দেহে জাগলো অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, আমার সত্তায় সঞ্চারিত হলো অমৃত স্পর্শ।

এই রমনীয় অভিজ্ঞতার অবোধ, অসাধারণ অভুব্যক্তি দর্শক-পাঠককে আবিষ্ট করে রাখে। কেবল মনের ভেতর থেকে একালের পক্ক মন মাথা দুলিয়ে বলতে থাকে ‘অসম্ভব’, ‘এ সম্ভব’- আর তখনই আধুনিক ঋষ্যশৃঙ্গদের স্তব্ধ করে দিয়ে আমাদের সামনে এসে দাড়ান পৌরাণিক ঋষিকুমার। নারী ও পুরুষ সম্পর্কে বোধ বুদ্ধিহীন। একালের পক্ষে প্রায় অভাবিত এইসব সংলাপ অবাক বিস্ময়ে কান পেতে শুনি আমরা তাঁর মুখেঃ-

১। নারী? পিতা, নারী কাকে বলে?

২। নারী, ... নারী... নারী।নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা।

নূতন এক জগত। ... মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপ মন্ত্র

আমার। ...

আমি অস্নাত থাকব তোমার স্পর্শের শিহরণ জাতে জাগ্রত থাকে।

আমি অভুক্ত থাকব, তোমার চুম্বনে অনুভূতি জাতে লুপ্ত না

হয়। আমি অনিদ্র থেকে ধ্যান করব তোমাকে।

এই দ্বিতীয় নির্জ্জান থেকে সজ্ঞানের তীরভূমিতে ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটবে ঋষ্যশৃঙ্গের। প্রথম নারীর শরীরী সম্ভোগের অভিজ্ঞতা নিয়ে আদি পুরুষ আদমও বুঝি এই পুলকিত শিহরণ অনুভব করেছিলেন স্বর্গের উদ্যানে। এই বনাঞ্চলে ঋষ্যশৃঙ্গের পিতার নির্দেশ ছিল ইন্দ্রিয় রোধের জন্য। আর সেই ব্যাকুল মনোভাবের মুহূর্তে এলো সেই নারী – চোখে, মুখে, সারা অবয়বে যার সর্বনাশের আমন্ত্রণ। সেই জ্ঞান অর্জন করতে অধীর ঋষ্যশৃঙ্গ গ্রহণ করতে চাইলেন রমণী তরঙ্গিনীকে। ঋষ্যশৃঙ্গ এখন ক্ষুধা নিয়ে কাম নিয়ে এগিয়ে চলেছেন বারাঙ্গনার দিকে আর তরঙ্গিণীর ১ম অঙ্কে যে ছিল ছলনাময়ী বারাঙ্গনামাত্র, এখন সে হয়েছে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত। বুদ্ধদেব এই অনুভবটিকে বোঝাতে গিয়ে বলেন,-

একই মুহূর্তে জেগে উঠল তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রম্ভচারীর হলো; পতন’ আর

বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে রোমান্টিক প্রেম......’

এই অনুভূতির সূচনা ঘটেছে দুটি চরিত্রের এই সব সংলাপে

তরঙ্গিনীঃ   '... কোথায় সেই স্নিগ্ধ সকরুণ দৃষ্টি আপনার? কোথায় সেই উদার আনন্দিত মূর্তি?

ঋষ্যশৃঙ্গঃজেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনীঃ   কুমার আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গঃআমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।'

পিতার সাবধানবাণীকে অগ্রাহ্য করে ঋষ্যশৃঙ্গ বরণ করলেন রমনীকে। একদিকে তপস্যা, ব্রম্ভজ্ঞান, অন্যদিকে রমনীর রূপমাধুরী। নারীর শরীরী বৈভব। তাঁর মনে নিশ্চয় দুই অনুভবের সংঘর্ষ হয়েছে দীর্ঘক্ষণ। কোনদিকে তিনি যাবেন? তপস্যা, সংযম, পিতার উপদেশ? নাকি নারী, মোহিনী, মায়াবিনী আবাল্যের আচরিত তপস্যা? নাকি সদ্য উপলব্ধ বিস্ময়!' ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে অবধারিত ভাবে গ্রাহ্য হলো তরঙ্গিনী। নারী তাঁর নূতন 'প্রয়োজন'।

আমার লুণ্ঠন তুমি। আমি তোমাকে চাই – তুমি প্রয়োজন'। এই অংশটির নাট্যসিদ্ধি অসাধারণ বুদ্ধদেবের হাতে। কাম থেকে প্রেমের পথে উত্তরিত তরঙ্গিনী যখন বলে এসো প্রেমিক, এসো দেবতা – আমাকে উদ্ধার করো।' তখন সরল থেকে কামনার নিবিড় অশ্লেষে আবিষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের উচ্চারণ -

'এসো দেহিনী, এসো মোহিনী – আমাকে তৃপ্ত করো।'

কৌমার্য হরণের নাটকীয় অভিজ্ঞতার পর সেই মোহিনীর সাথে সাথে চম্পা নগরে প্রবেশ করলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। অবিশ্বাস্যভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ সঙ্গচ্যুত হলেন তরঙ্গিনী। রাজধানীর চক্রান্তের কাছে ধরা দিলেন তিনি। বলা বাহুল্য সেই চক্রান্তের শরিক ছিল তরঙ্গিনীও। সেই বৃষ্টিও জলাধারার সময় জনতা উল্লসিত হুল্লোড়ে কি হারিয়ে গিয়েছিল তরঙ্গিনী কামার্ত যুবক ঋষ্যশৃঙ্গের দৃষ্টির বাইরে? এ নাটক দেখানো হয়নি মঞ্চে। পুরাণ কথাও কবিকে সাহায্য করেনি এখানে। কিন্তু এই মিলন অভিজ্ঞতার এক বৎসরের ব্যবধানে রূপান্তরিত তরঙ্গিনীকে নিয়ে আঁকতে হয়েছে তৃতীয় অঙ্ক। যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গময় তরঙ্গিণীর বিরহ দশা দেখানো হয়েছে। এই এক বৎসরে পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গের মানসিক

যন্ত্রণা ও বৃদ্ধদশার ছবি উঠে আসছে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম থেকে।ঋষ্যশৃঙ্গ ভুলতে পারেন না সেই মিলন স্মৃতি সেই সুখ সেই অপার্থিব দেহ সম্ভারে স্বপ্নলীন অভিজ্ঞতা। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে রাজধানীর এই জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। এক বছর কাল ঋষ্যশৃঙ্গ সন্তান সঙ্গে যাপন করেছেন বিবাহিত জীবন। কিন্তু-

'বিস্বাদ – বিস্বাদ, এই রাজপুরী বিস্বাদ
জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,
বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।'

একই অনুভবে সমকালে লেখা কবিতা 'মরচে পড়া পেরেকের গান' এ ঋষ্যশৃঙ্গের জবানীতে বুদ্ধদেব লেখেন –

'আমার কাছে রাজপুরী বিস্বাদ, বিস্বাদ আমার পরিণীতা রাজকন্যা
বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন, তিক্তকামরাত্রি, তিক্ত আমার মন্ত্রপূত মিলন,
উৎপীড়িত আমার বিস্রোত যার তেজে বৃষ্টি নামে ফসল ফলে,
যে দেশে হস্রধারা নামিয়েছি, একা আমি শুকনো।'

তপস্বীর এই একক অনুভব নাটকে পেয়েছে বহুমাত্রিক বিস্তার। প্রাক্তনীর উজ্জ্বল স্মৃতি ও বর্তমানের অসহ্য উপস্থিতিতে দগ্ধ রাজা ও ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ এর থেকে উদ্ধার চান। চান মুক্তি। 'শান্তি' যার প্রতিশব্দ হতে পারে, তরঙ্গিনী তাঁর মধ্যে যে জাগরণ ঘটিয়েছে তাঁর আলোয় শুরু হয়েছে স্বাভিজ্ঞান খুঁজে ফেরা। আর সকলে তাঁকে এক একটা খাপে বন্দী করতে চেয়েছে। কোনোটা ছোটো আবার কোনোটা বড়ো, দিতে চেয়েছে এক একটা সজ্ঞার্থে ভূমিকা – ত্রাতা, অন্নদাতা, যুবরাজ, মহাত্মা, কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। একমাত্র তরঙ্গিণীর কাছে সে জানতে পেরেছে তার অবিকলত্ব।"

(সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়/ আধুনিক জীবন ও জীবন ছায়া/ প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ)

এই যন্ত্রণার কথা নাটকে সর্বজন সমক্ষে প্রকাশও করেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন তরঙ্গিণীরও। সকলের সামনে সেও শোনে তাঁর পক্ষে মর্যাদাময় ঋষ্যশৃঙ্গের এই স্বীকারোক্তি-

"আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়ে ছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে। হে আমার পরিত্যাজ্যা নয়, সে আমার

অন্তরঙ্গ। তাঁর কাছে – অঙ্গদেশে একমাত্র তাঁর কাছে – আমি ত্রাতা নই, অঙ্গদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই, - একমাত্র তাঁরই কাছে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নই একমারে তাঁরই কাছে আমি অনাবিল ভাবে আমি ঋষ্যশৃঙ্গ। ...” এর পরই ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রের সবচেয়ে জটিল স্তর স্পর্শ করেছেন নাট্যকার।

এই স্তরই নাটকের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়ও। এই স্তরে ঋষ্যশৃঙ্গের আচরণ সম্পর্কে সমালোচক সাধারণ প্রশ্ন তোলেন –

‘তরঙ্গিনী ইপ্সিতা ঘোষণা করে, এবং তাঁকে অধিকারিনী স্বীকার করেই কেন ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকে ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পানে

বিদায় নিলেন তাঁর হেতু স্পষ্ট নয়। তিনি তো তরঙ্গিণীর জন্য প্রতীক্ষমান ছিলেন। কিন্তু যার জন্য প্রতীক্ষা, যার জন্য আশ্রম জীবন ত্যাগ, তাঁকে পুনর্বার পাওয়া মাত্রেই কেন ত্যাগ করলেন ঋষ্যশৃঙ্গ।’

এর জবাব অনুসন্ধানেই ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের সৌন্দর্যের আবিষ্কার সম্ভব। অধ্যাপক অমিয় দেব জানান,

“যে তৃষ্ণা তাঁকে, অঙ্গদেশের যুবরাজ ও শান্তার পুত্রের জনক ঋষ্যশৃঙ্গকে, তলায় তলায় অস্থির করে তুলেছিলো, যার শান্তি তিনি ভেবেছিলেন, সেই নারীর সঙ্গে পুনর্মিলনে, যে প্রথম তাঁর দেহে কাম জাগিয়েছিলো, সেই তৃষ্ণাই তরঙ্গিণীর প্রভাবে রূপ বদলে হয়ে উঠলো এক আত্মঅন্বেষা।”

আসলে ঋষ্যশৃঙ্গের এই রূপান্তরের পিছনে আছে পর পরচ ঘটে যাওয়া

কয়েকটি ব্যাপার।

১) পিতা বিভাণ্ডকের ধিক্কার, প্রেরণা। এই স্থলিত, বন্দী নাগরিক জীবনের স্বরূপ ও অন্তঃসার শূণ্যতা সম্পর্কে নিয়ত জাগরুক সুপরামর্শ।

২) প্রেমিকা ও প্রথম লব্ধ নারীর অসাধারণ আর্তি ও পুজার প্রতিক্রিয়া। তপস্বীর সেই মুখ সেই দৃষ্টি, সেই প্রশান্তিকে তরঙ্গিনী এই নাগরিক মানুষটির চোখে মুখে দেখতে না পেয়ে আর্তনাদ করেছে, ঋষিপ্রেমিকের তা আত্ম সন্ধানে তা প্রেরণা দিয়েছে –

তরঙ্গিনী। আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই চোখ, জাগরণে দেখেছি সেই চোখ। আর এখন আমি তোমাকে দেখছি... তোমাকে?

সত্যি তোমাকে? কিন্তুব কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে জাচ্ছ? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?" এই প্রশ্নের তীক্ষ্ণতা আমূল বিদ্ধ করেছে নিশ্চয়ই তপস্বীকে। তাই শান্তার সঙ্গে অভ্যস্ত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে তপস্বীকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আত্ম সংশোধন নয়, আত্ম নির্মাণ তার উদ্দেশ্য। তাই তরঙ্গিণীর আহ্বানেও ঋষ্যশৃঙ্গের আর ফেরা সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞানে ঋষি, প্রেমিক জানতে পারেনঃ

কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিনী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। এ আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তরঙ্গিনী।

এই বোধ নির্মাণে শান্তা-অংশুমান সংবাদও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রাণিত করেছে নিশ্চয়ই। শান্তার কাছে ঋষ্যশৃঙ্গই তো সবচেয়ে বেশী কাছের মানুষ। অথচ সব থেকে দূরেরও। চতুর্থ অঙ্কের সূচনা অংশে শান্তার নিঃসঙ্গ সঙ্গীত ও ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, শিখেছেন রাজ পুরুষোচিত বৈদগ্ধ্য ও কপটতা। বেকিয়ে ও ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন – অথচ তাঁর সহজাত শুদ্ধতা এখনো অস্পষ্ট। জ্বালা, বিক্ষোভ, চাতুরী, শ্লেষ এবং এক অপ্রকাশ্য বিশাল কামনা – এই বিভিন্ন ভাবগুলির সন্নিপাতে দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই সাংসারিক রাজবেশের মতোই তাঁর ছদ্মবেশ মাত্র; যে মুহূর্তে লোলাপাঙ্গীকে দেখে তাঁর চমক লাগালো(মাতাকে দেখে কন্যাকে মনে পড়া স্বাভাবিক) তারপর যখন তরঙ্গিনী নামটি শুনতে পেলেন, সে মুহূর্ত থেকেই জেগে উঠতে

লাগলো তাঁর মৌলিক ঋজুতা ও নির্মলতা; তরঙ্গিণীকে চোখে দেখার পর থেকে নিজের বা অন্যদের সঙ্গে তাঁর কোনো লুকোচুরি আর রইলো না। তাই, যখন তিনি তপস্বী বেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মধ্যে দেখা দিলো এমন এক স্বপ্রকাশ মহত্ব, জা অন্যেরা সহজে ও সবিনয়ে মেনে নিলে।'

প্রশ্ন উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গ যার জন্য উৎকণ্ঠ, উদ্গ্রীব ছিলেন তাঁকে ফিরে পাবার পর কেন গ্রহণ করলেন না, কেন অভ্যস্ত জীবনের বাইরে জাবার সময় সঙ্গী করলেন না। কেবল কি শুদ্ধতম কামনা উৎত্রিত জীবন-সন্ধানে? নাকি কেউ কোথাও আর ফিরে যেতে পারবে না বলে? আমাদের মনে হয় তপস্বীকে পুনর্বার জাগিয়ে ছিল যে তরঙ্গিনী সেই কি একথাও বুঝিয়ে দিল তাঁকে যে, তরঙ্গিণীর চোখে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। তাঁর পতন ঘটেছে দৈহিক ও মানসিক ভাবে। যে তপস্বীকে তরঙ্গিনী দেহমনে আকাঙ্ক্ষা করে এখানে এসেছে, তাঁকে আর পুনর্বার মিলনে আবিষ্কার করতে পারবে না সে। প্রভূত সম্ভোগ দক্ষ ও ভোগতৃপ্ত পুরুষ ঋষ্যশৃঙ্গ আর তরঙ্গিনীও যোগ্য নয়। তাঁকে নতুন করে আত্মনির্মাণের সাধনায় ডুবতে হবে। তাই এই প্রত্যাখ্যান। এই বিচ্ছেদ বাঞ্চিত, অনিবার্য, সুন্দর। ঋষ্যশৃঙ্গের এই মনোভাব পাই তাঁর উক্তিতেঃ

১। সহস্র নয় – একজন। আমি ঘুমন্ত ছিলাম সে আমাকে জাগিয়েছিল। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল সে। সে-ই আমার বন্ধন, সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব।

২। হয়তো আমার সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। ...... মেধা নয়, শাস্ত্র পাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয় – আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূণ্যতায়।

অতএব এইসব পরিস্থিতির শিকার ঋষ্যশৃঙ্গের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাই স্বাভাবিক ছিল এই নিষ্ক্রমণের। কাম থেকে শুদ্ধতম জীবনবোধে সচেতন যাত্রায়। তাই যখন চতুর্থ অঙ্কে তরঙ্গিণী এসে ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে সেই 'তরুণ তাপস' কে না দেখতে পেয়ে নিরাশ হলো, তখনই সচেতন হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ।

এবং সবশেষে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রেরণা হয়ে রইলো সেই তরঙ্গিণী। তারই সূক্ষ্ম প্রত্যাশা ভোগী ও 'বিরক্ত' ঋষ্যশৃঙ্গকে সাহায্য করলো রাজবেশ ত্যাগ করতে। বাধ্য করলো তরঙ্গিণীর জন্য দীর্ঘ এক বছরের পোষণ করে চলা মেধাবী যন্ত্রণাকে মুহূর্তে প্রশান্তিতে বদলে ফেলতে। সেই অভিজ্ঞান থেকে ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকে বুঝিয়ে দেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা।

১০.৩ তরঙ্গিণীর চরিত্র আলোচনা

তরঙ্গিণী এই নাটকের আলম্বন বিন্দু, ঋষ্যশৃঙ্গকে ঘিরে কাহিনির যে বলয় নির্মিত হয়েছে তাঁর মাঝখানে তরঙ্গিণীর স্থান। নাটকে স্থান দখলেও তপস্বীর চাইতে তরঙ্গিনী সম্ভবত এগিয়ে। পরিসংখ্যান নইলে দেখা যায়ঃ ৪ অঙ্কের এই নাটকটির সব কটি অঙ্কে তাঁর উপস্থিতি।

৩য় অঙ্কে তো শারিরীক ভাবে তপস্বী নেই। তেমনি নেই প্রথম অঙ্কেও। অবশ্য মঞ্চে শারীরিক উপস্থিতিই কেবল চরিত্রটির গুরুত্ব বোঝায় না। কিন্তু দৃশ্যকাব্য হিসেবে ব্যাপারটার একটা মহিমা আছে।

গণিকাশ্রেষ্ঠা তরঙ্গিনী চম্পা নগরীর উজ্জ্বল রমণীরত্ন। পুরাণকথায় কোথাও তাঁর নাম ছিল না। বুদ্ধদেবের দেয়া এ নাম। তরঙ্গিনী তাঁর জননী লোলাপাঙ্গীর শিক্ষায়, কলাবতী; নিপুণা নায়িকা বৃত্তিতে সুশিক্ষিত, মোহিনী। রাজা লোমপাদের রাজ্যে খরা ও দুর্ভিক্ষের নিরাকরণের জন্য রাজপুরোহিত ও রাজমন্ত্রীর পরামর্শে তরুণ ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নাশের জন্য সে নির্বাচিত। নাটকে তাঁর উপস্থিতির আগে তাঁর সম্পর্কে রাজ পুরোহিতের বিবৃতিঃ

এইমাত্র নগরপাল আমাকে জানালেন যে চম্পা নগরের গণিকাদের মধ্যমণি এখন তরঙ্গিণী। রূপে লাস্যে ছলনায় তাঁর নাকি তুলনা নেই। আবাল্য তাঁর মাতারই ছাত্রী, সর্বকলায় বিদগ্ধ। শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃতদ্রংষ্ট্রা কুরূপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে, আর তরঙ্গিনী স্বভাবতই মোহিনী।

রাজমন্ত্রী ও লোলাপাঙ্গীর সাক্ষাৎকারে জানা যায় তরঙ্গিনীকে কোন্ কোন্ বিদ্যায় পারঙ্গম করেছে সে। আর রাজমন্ত্রীর একটি কৌশলী জিজ্ঞাসা ছিল তরঙ্গিনীকে

- ।

রাজমন্ত্রী। তুমি কি কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত?

তরঙ্গিনী। আমার ধর্ম বহুর পরিচর্যা।

রাজমন্ত্রী। এমন কোন পুরুষ কি নেই যাকে তুমি সর্বস্ব দিতে চাও?

তরঙ্গিনী। প্রভু আমার সর্বস্ব বলতে আর কি আছে – শুধু এই শরীর।
তাঁর অধিকারী কে নয়, বলুন – রাগী, উন্মাদ, নপুংসক ও
ভিখারী ছাড়া? যে আমাকে মূল্য দেয় তাঁরই জন্য আমি
অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি – শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান,
কুৎসিত আমার কাছে সকলেই সমান।

রাজমন্ত্রী। কখনও বিশেষ কারো প্রতি তোমার পক্ষপাত জন্মেনি?

তরঙ্গিনী। অমন পাপ চিন্তা যদি বা কখনও জাগে, আমি প্রাণপনে তা
ঠেকিয়ে রাখি।

প্রিয়া নয়। জায়া নয়, একান্ত ভাবেই রমণী, মোহিনী এই তরঙ্গিণী রাজকীয় চক্রান্তে জড়ালো। তাঁর কোন ভালোবাসার একক পুরুষ, একান্ত পুরুষ থাকলে তাঁর পক্ষে এই দায়িত্ব পালন হয়তো অসম্ভব হবে। এই আশঙ্কা থেকেই রাজমন্ত্রী কৌশলী প্রশ্ন তুলেছিলেন। সে পরীক্ষায় তখনকার মত উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তরঙ্গিনী। কিন্তু তপস্বীকে জয় করার পর হিসেবে বদলে গেল। তাঁর জীবনের এই রূপান্তর উত্তরকালে শান্তা – ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনে কি প্রতিফলন ঘটিয়েছে নাটোক-কাহিনিতে তাঁর সংবাদ থাকবে। সে অভিনয়ে পারঙ্গমা বলে তাঁর মাতার শিক্ষা ও প্রেরণা তাঁর চালিকা শক্তি বলে, সে গ্রহণ করল সেই চ্যালেঞ্জ। আজন্ম কুমার কঠোর ভাবে ব্রম্ভচর্যে নিয়োজিত ঋষ্যশৃঙ্গকে কামনার জালে বাধতে চলল। ভালোবাসা দিয়ে নয়, প্রেম নয়, কেবলই কামকলা, কেবলই কপোট চাতুরালি তাঁর অস্ত্র। যথার্থই বিদ্ধ হলেন পুরুষ। প্রকৃতির ছলনা জালে। আপাপবিদ্ধ তরুণ জানতেন না কাকে বলে নারী, কাকে বলে পুরুষ। তরঙ্গিনী

তাঁকে জানালে। আর আশ্চর্যজনক ভাবে নিজে যে কি তাও জানল তাঁর কাছ থেকে। জানলো গণিকা নারীর ভিতর কার শুদ্ধতমা দীপশিখার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের পতিতা কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে শোনা গিয়েছিল যেমন বিস্ময়াবিষ্ট স্তুতি, এনাটকেও ঋষ্যশৃঙ্গ উচ্চারণ করলেও সেই অবোধ প্রশংসা –

ঋষ্যশৃঙ্গ। আপনি কি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা?... কি দীপ্ত আপনার।

তপোপ্রভা, কি স্নিগ্ধ আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার ভাষণ,

কি লাবণ্যঘন! আপনাকে দেখে আমি দুর্লভ চিত্তপ্রসাদ অনুভব

করছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার মনে হচ্ছে, আপনি চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি।

...সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ

যেন নির্ধুম হুমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন

ঋক্ ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে

আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে, বিশ্ব করুণার বিকিরণ।

বলাবাহুল্য, এই ভাশাচিত্র নির্মাণে বুদ্ধদেব নিশ্চিত ভাবে রবীন্দ্রনাথের পতিতার দ্বারা পরিচালিত। 'পতিতা'র ঋষিকুমার বলেছিলেন,

ক)　কোন দেব আজি আনিলে দিবা

তোমার পরশ অমৃত সরস,

তোমার নয়নে দিব্য বিভা,

২)　কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে

আনন্দময়ী মুরতি তুমি

ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার

ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।

এইসব স্তব তরঙ্গিনীকে আপ্লুত করেনি কেবল, আমূল আলোড়িত করেছে। তাঁর ছদ্মরূপ ভেদ করে এই সত্য দ্রষ্টা তাপস কি দেখলেন আজ? তরঙ্গিনী তো স্তাবকতা শুনতে অভ্যস্ত ছিল এতকাল। লোভী রিরংসু পুরুষের প্রশংসা শুনেছে সে অনেক। আজ

এ কি নতুন বন্দনা শুনলো সে। এ মন্ত্র কাঁপিয়ে দিল তাঁর ভেতরকার যথার্থ সত্তাকে। যে নারী যে দেবী যে প্রিয়া মহীয়সী। সেই তরঙ্গিনী রাজপুরুষের কথায় গৃহীত তাঁর 'চ্যালেঞ্জের' কাছে হেরে যেতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংক্ষিপ্ত অবয়বে যেন ব্যাপারটা তাৎক্ষণিক ঘটেছে। নাটকে এই পরিণতি ঘটাতে সময় লেগেছে দেখি।

প্রথমে ঋষির এই সব বাণীকে তির্যক ব্যঙ্গের সুনিপা নারী উপভোগ করতে চেয়েছিলঃ

'... সত্যি কি তিনি ভাবছেন আমি মুনি, ছদ্মবেশে দেবতা?(মৃদু স্বরে হেসে ওঠে) বালক, বালক! কখনো কোন নারী দেখেননি, কখনো যুবাও দেখেননি। ...

আমি জানি আমি কুরূপা নই, চম্পা নগরে সুন্দরী বলে খ্যাতি আছে আমার কিন্তু অমন করে অন্য কেউ কেন বলে না? (ক্ষণকাল নীরব) কেমন করে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে, যাকে দেখছিলেন সে কি আমি? (নিজের বাহু উরু ও চরণের দিকে তাকিয়ে)

মা সত্যি বল আমি কি এত সুন্দর? আমার চম্পা নগরের প্রণয়ীরা, বলো – আমি এত সুন্দর? ক্ষণকাল নীরব থেকে তারপর হেসে ওঠে) কৌতুক হবে – উত্তম কৌতুক, যখন ফিরে গিয়ে ওদের সভায় এই কাহিনি শোনাবো...

কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মই ভূমিক্ষয় হচ্ছিল তরঙ্গিণীর সচেতন ছলনার নিরন্ধ্র প্রাচীরে। তপস্বীর অবোধ প্রশংসায় যথার্থই মুগ্ধ হয়েছিল এই মোহিনী নারী। যে মুগ্ধতা থেকে জেগেছিল তাঁর চোখেও প্রশংসাঃ

'কিন্তু এই বনে কি সরোবরে নেই? কোন ভাদ্রের নির্বাত অপরাহ্নে, কোনো সরোবরের স্থির স্বচ্ছ জলে তিনি কি নিজেকেও দেখেননি কখনও? সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল! কে কাকে বলছে!'

এই মাত্র একটি সূত্র ধরেই তরঙ্গিনী চরিত্রটির বিবর্তন ঘটে গেল। তপস্বীকে ঘরে ফিরিয়ে ছিল যে পৌরাণিক পতিতা তাঁর পরবর্তী মানস প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথের আগে আর কোথাও মেলে না। বুদ্ধদেব সেই পথে আরও অগ্রসর হয়েছেন। পুরাণের ধূসর জগৎ থেকে তরঙ্গিণীকে একালের রক্তমাংসময়ী প্রেম ও প্রতীক্ষার প্রিয়া ও তাপসী করে নির্মাণ করেছেন। তরঙ্গিণীর এই পরিণতিই অবশেষে নাটকের সমস্ত চরিত্রের ভাগ্যরেখা বদল করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের ৪র্থ অনুদৃশ্যে পৌঁছে দেখা যায় তরঙ্গিণী রূপান্তরিত হয়েছে ভেতরে ভেতরে। আর তার আসঙ্গের রম্য আস্বাদ বদলে দিয়েছে ঋষিকেও। এ ব্যাপারটা মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করে এমন অসাধারণ নাটকীয় যে, গোটা নাটকের মর্মবাণীটি ধরা আছে এখানে। নাট্যকার জানান, "দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারী হলো পতন আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম' – যেভাবে রবীন্দ্রনাথের পতিতায় বর্ণীত আছে, সেইভাবেই।"

তরঙ্গিণী। কোথায় সেই স্নিগ্ধ সকরুণ দৃষ্টি আপনার?

কোথায় সেই উদার আনন্দিত মূর্তি?

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

(এই প্রথম তরঙ্গিণীর ওষ্ঠে ঋষিকে 'তুমি' সম্বোধন। সহসা, যখন দর্শকদের সমগ্র মনোযোগ তীব্রভাবে আকর্ষণ করে রেখেছে ঋষ্যশৃঙ্গের রূপান্তর; অজ্ঞ বটুক থেকে প্রাজ্ঞ পুরুষকারের বিন্দু স্পর্শের রূপান্তর মুহূর্তটি – ঠিক তখনই রূপান্তরিত-তরঙ্গিণীর সম্বোধন বদলের ব্যাপারটি ঘটে যায়। ভূমিকা ভণিতা ছাড়াই এবং সচেতন পাঠকের অজ্ঞাতে। অবশ্য এই অঙ্কের প্রথম দিকে, বিভান্ডকের আশ্রমে প্রবেশের আগে তরঙ্গিণীর শেষ সংলাপে 'তুমি' আছে। তা অবশ্যই তপস্বীকে সম্বোধন হিসেবে নয়, তরঙ্গিণীর মন্ত্রোপম কবিতায়।)

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিণী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া।

তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার

বাসনা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণীতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিণী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

তরঙ্গিণী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই – তুমি – প্রয়োজন!!

তরঙ্গিণী। তবে চলো – চলো আমার সঙ্গে। চলো সেখানে,

যেখানে আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারবো

ঋষ্যশৃঙ্গ। কোথায় যাই কী এসে যায়? কোথায় থামি কী এসে যায়?

আমি চাই তোমাকে। আমি চাই তোমাকে।(বাহু বিস্তার

করে এগিয়ে এলেন।)

তরঙ্গিণী এসো প্রেমিক, এসো দেবতা – আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী – আমাকে তৃপ্ত করো।

প্রশ্ন উঠতে পারে ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্পূর্ণ জয় করার মুহূর্তে আদ্যন্ত রূপান্তরিত তরঙ্গিণীর উক্তি ছিলঃ 'ছিলো সেখানে, যেখানে আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারবো।' অর্থাৎ সে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল তপস্বীকে ঘিরে নাগরিক ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে। যার অন্যতম শরিক সে নিজেও। তবুও সে ঋষ্যশৃঙ্গকে তুলে দিলো কেন এই ষড়যন্ত্র জালে। এর উত্তর নাটকে তুলে ধরা হয়নি। মূল গল্পেও তাঁর আভাস নেই। পুরাণের তরঙ্গিণী থকে বুদ্ধদেবের তরঙ্গিণীর দূরত্ব সৃষ্টির সূত্রটা এখানে নিহিত। তরঙ্গিণীর আত্মার এই জাগর মুহূর্তে সেও ছিল অসহায়। সুপার স্ট্রাকচারের কাছে দায়বদ্ধ। কৃতঋণ। যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মনির্মাণ এরপর থেকে শুরু হবে তা ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে পৌঁছে দেবার আগে অনুভব করার অবস্থায় ও কি ছিল তরঙ্গিণী! এই জন্য সময়ের দরকার। নাট্যকার সেই সময় গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের ব্যবধান এক বৎসর। এই সময়ের ব্যবধানে আমরা তরঙ্গিণীর পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ লক্ষ্য করি।

ঘোষকের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গিণীর অস্ফুট তীব্র স্বর শুনি 'লোমপাদের জামাতা! যুবরাজ!' আর লোলাপাঙ্গী যখন তরঙ্গিনীকে যে সারাদেশে যে বৃষ্টি, শস্য, ঋষি এসেছে

তার মূলে আছে তরঙ্গিণী। তাঁর জবাবে রাজশক্তির কাছে দায়বদ্ধ, অসহায় এক ব্যর্থ মনোরথ নারীর কথা ঝরে পড়েঃ ‘না, মা – আমি কেউ নই। শুধু যন্ত্র, শুধু উপায়।’

এখানেই নতুন যুগের প্রেক্ষিতে সমগ্র কাহিনির পুনর্বয়ন করেন বুদ্ধদেব। এই তৃতীয় অঙ্কেই। অংশুমান–শান্তা; চন্দ্রকেতু তরঙ্গিণী আর ঋষ্যশৃঙ্গ প্রত্যেকেরই জীবন-বৃত্তকে গ্রাস করে ফেলে রাজকীয় এই চক্রান্ত। সময়ের শুশ্রুষায় অন্যদের জীবনের ক্ষত পূরণ হলেও তরঙ্গিণীর ক্ষত পূরণের কোনো সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। তাই তপস্বী ও তরঙ্গিনীকে খুঁজে নিতে হয়েছে ভিন্নতর আনন্দের সন্ধান।

কিন্তু তাঁর আগে তৃতীয় অঙ্ক জুড়ে চলেছে তরঙ্গিণীর নিজস্ব জগতে পরিক্রমা। নিজেকে খুঁজে দেখার দুঃসহ প্রয়াস। জননীর যৌবন স্বপ্ন থেকে শুরু সেই অন্বেষার।

তরঙ্গিণী। আমার যেন মনে হয় তোমার মুখের তলায় অন্যমুখ
লুকিয়ে আছে। আমার পিতা তাই দেখেছিলেন।

আর চন্দ্রকেতু ও তরঙ্গিণীর সংলাপে স্পষ্ট হয়েছে তরঙ্গিণীর এই অনুভব। এই অংশে নাট্যপরিকল্পনায়, চরিত্র নির্মাণের জটিল রেখা অঙ্কনে, অবচেতনলোকের নিপুণ উদ্‌ঘাটনে উপন্যাস ও নাটকের আস্বাদনযোগ্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন কবি বুদ্ধদেব।

তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু, সত্যি বলো – আমি রূপবতী? (চন্দ্রকেতুর কাছে
এগিয়ে এসে) দ্যাখো – নিবিড় চোখে তাকিয়ে আমার দিকে।

আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য মুখ লুকিয়ে আছে।
তুমি দেখতে পাচ্ছ?... আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ
ছিলো – আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি – আমি খুঁজি
সেই মুখ ছিলো – আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি –
আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো?...

এসব উক্তিতে তরঙ্গিণী আসলে ফিরে পেতে চায়, এক বছর আগের সেই অভিজ্ঞতা। ফিরে যেতে চাই সেইখানে, যেখানে একবছর আগে মন্ত্রমুগ্ধ মুহূর্তে সে শুনেছিল প্রথম রমণী দরশ মুগ্ধ এক ঋষি পুরুষের কণ্ঠে নতুন ঋক্ঃ যে মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে দেখেছিলেন, আপনি যেন তাদেরই একজন। সুন্দর আপনার আনন,

আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্ব করুণার বিকিরণ। এই মন্ত্রে উজ্জীবিতা শুদ্ধস্নাতা তরিঙ্গিনীকে চন্দ্রকেতু কী নতুন প্রশংসা শোনাবে রূপের? তরঙ্গিণী কেন চন্দ্রকেতুতে আকৃষ্ট হবে আর? লোলাপাঙ্গীরা বুঝবে কি এই প্রত্যাখ্যানের হেতু। নাট্যকার এই সিচুয়েশনকে অব্যর্থ ভাবে তুলে ধরেছেন নাটকে। একাজে সাফল্য এসেছে, অন্য কোন আয়ুধে নয়, ভাষার নিপুণ প্রয়োগেঃ

চন্দ্রকেতু। তুমি সুন্দর। তুমি মনোহারিণী। তুমি নিরুপমা।

তরঙ্গিণী। সত্যি? আমার রূপের বর্ণনা দিতে পারো?

চন্দ্রকেতু। পঞ্চাশরের ধনু তোমার ললাট, ধনুর্গুন তোমার ভুরু,
পঞ্চবাণ তোমার কটাক্ষ, তাঁর তূণ তোমার গ্রীবা,
তোমার সর্বাঙ্গ তাঁর অভিসন্ধি। তুমি শ্রী, তুমি দীপ্তি,
তুমি বিশ্বকর্মার প্রথমা।

তরঙ্গিণী। (হেসে উঠে) চন্দ্রকেতু, তুমি কাব্য পড়ছো! তুমি বিদগ্ধ,
তুমি সজ্জন। কিন্তু আমি যা চাই তা কি তুমি দিতে পারবে?
আমি চাই আনন্দ – প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ
– প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয়
আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্যমুখ,
যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি...

লোলাপাঙ্গীদের হিসেবের বাইরে ‘অন্যপথে’ চংক্রমণ শুরু করেছে তরঙ্গিণী। তাই তাকে ফিরে পাবে না আর চন্দ্রকেতু লোলাপাঙ্গীরা, ছুঁতে পারবে না আর। এক অসুস্থ, অস্বচ্ছ তরঙ্গিনীকে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকাপাতের আগে আমরা দেখতে পাই। যার মর্মমূলে বিদ্ধ হয়ে আছে সেই নতুন মন্ত্রে স্নাত হওয়া মুহূর্তের প্রতিক্রিয়া। আরও গভীর, আরও বিশাল, আরও ভিন্নতর – ঈর্ষা ও আত্মধিক্কারে – জটিলতর প্রতিক্রিয়া।

তরঙ্গিণী। দর্পন, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী

আমার চেয়ে? আরও তন্বী? তার অধর আরও রক্তিম?
বক্ষ আরও সুগন্ধী? তার বাহুতে কি আরও বিশাল
অভ্যর্থনা?... তুমি কি আমাকে দেখেছিলে? এই আমাকে?
'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে' কজ্জ্বল,
অলক্ত, লোধ্র রেণু – আমি কি তোদের কাছে ঋণী? বসন,
ভূষণ, চন্দন – তোদের কাছে?

তরঙ্গিণী চিত্রাঙ্গদা নয়। যদিও তরঙ্গিণীর আত্মবিকলনের ওপর বাংলা সাহিত্যের পাঠক আবিষ্কার করে চিত্রাঙ্গদার অনিবার্য সংক্রাম। যে রূপ দিয়ে, লাবণ্য দিয়ে সে অর্জুনকে বিদ্ধ, মুগ্ধ করেছিল, যে চ্যালেঞ্জে জয়ী হয়েছিল তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তে কি শুরু হয়নি তার আত্মদাহ? যতদিন না তার রূপের মলাট খুলে ফেলে সে অসংকোচে ধরা দিতে পেরেছে অর্জুনের কাছে। যে সে নিজে একান্ত চিত্রাঙ্গদা – তাকে কি অর্জুন চেনে? চায়? ভালোবাসে? সেকি এই নারী যাকে অনঙ্গের বর নিয়ে মুগ্ধ করতে হয়েছে তার বাঞ্ছিতকে? এই আত্মধিক্কারকে অঙ্গীকার করেই চিত্রাঙ্গদার ট্র্যাজেডি নাট্যায়িত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তরঙ্গিণী চিত্রাঙ্গদা নয়। তরঙ্গিণীর যুদ্ধ

১। নিজের সঙ্গে, ২। শান্তার সঙ্গে। ৩। লোলাপাঙ্গী আর চন্দ্রকেতুর সঙ্গে। এই রক্তাক্ত নারী নায়িকা সন্ধান করে তার রূপের প্রতিমায় যথার্থ কি দেখেছিল তার প্রেমিক? তার দেখার মধ্যে সেকি ছিল নতুন এক 'আবিষ্কার'? নাকি এই ক্লেদ পঙ্কিলতার রমনীদেহের লীলা ও লাস্য ভঙ্গী ও মুদ্রার ভেতর যর্থাথই আছে 'কিছু', অন্য কিছুঃ

'কিন্তু এ তো তুমি দেখেছিলে – এই ত্বক, মাংস, মেদ কান্তি – এই শরীর! আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি – জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন?...'

নাকি আমারই ভ্রান্তি? নাকি তুমি যাকে দেখেছিলে সে অন্য কেউ? আবরণ নয়, প্রসাধন নয়, ত্বক মাংস মেদ কান্তি নয় – সে কে তবে? বল, দর্পণ, সে কে? এক মুখ – একই মুখ ফুটে ওঠে বার বার – অন্যমুখ নেই? এসো – বেরিয়ে এসো দর্পণের গভীর থেকে – বেরিয়ে এসো আমার সেই মুখ!

আমি কি তবে স্বপ্ন দেখেছিলাম? সব কি আমার মতিভ্রম – সেই আকাশ, তরুণ সূর্য, আমার হৃদয়ে সূর্যোদয়?

মা মতিভ্রম নয় – নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর বাস্তব।

তিনি আজ যুবরাজ – তিনি আজ লোকপাল।

তুমি লজ্জিত নও? রাজপথে বিবর্ণ তোমার নাম, প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে তুমি ধূসর। ... 'আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো' পাপিষ্ঠা, কপটভাষিণী, পারলি কই? অন্যের হাতে অর্পণ করলি, সঁপে দিলি শান্তার বাহুবন্ধে। ...

প্রিয়

আমার প্রিয়,

আমার প্রিয়তম,

কেন আমি তোমাকে নিয়ে

চলে যাইনি –

দূরে,

বহু দূরে –

যেখানে শান্তা নেই,

লোলাপাঙ্গী নেই,

চন্দ্রকেতু নেই –

যেখানে তোমার নামে

কেউ জয়কার দেয় না?'

তরঙ্গিণীর সংলাপের দীর্ঘ উক্তির উদ্ধৃতিতে ইচ্ছাকৃতভাবে আমি দূরত্ব রেখেছি, ফাঁকা যায়গা ছেড়ে ছেড়ে। এই ফাঁকাগুলোর মধ্যে যোজন যোজনের ব্যবধান আছে। একটি উক্তির অংশ থেকে আর একটি অংশে যাবার সেই শূণ্যস্থানে বসাতে হবে তরঙ্গিণীর মনের বহুধা বিভক্ত দ্বন্দ্বদীর্ণ অনেক তরঙ্গিনীকে। এই আত্মদংশন, এই ঈর্ষা, আত্ম

অনুশোচনার অগ্নিবলয় থেকে উঠে আসে এক 'যাজ্ঞসেনী' তরঙ্গিণী। এক অলৌকিক সম্পদে ঋদ্ধ, স্থির অকম্পিত, সম্ভাবনাময় রমণীঃ

কিন্তু আমি পারি – এখনো পারি – এখনো আমি তরঙ্গিণী!(দ্রুত ভঙ্গিতে দর্পন তুলে নিয়ে)

'সুন্দর তোমার আনন,
তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল।
বল দর্পণ, সব সত্য।
চেয়ে দ্যাখ তোমার হাসি।
নে আমার গাত্রের সুগন্ধ।
শোন আমার কঙ্কণের ঝঙ্কার।
আমি, তরঙ্গিণী, তপস্বীকে
লুণ্ঠন করে ছিলাম,
আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে
জয় করতে পারবে না।'

যবনিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিণীর এই চ্যালেঞ্জ এর সহমর্মী হয়ে উঠি আমরা সবাই। আমরা মনে মনে চাই তরঙ্গিণীর প্রেমের জয় হোক। কিন্তু এ প্রত্যাশা জীবনের হলেও শিল্পের নয়। চতুর্থ অঙ্কে নাটক সেই প্রত্যাশিত শিল্পের দিকে অগ্রসর হয়। তপস্বীর জীবনে তরঙ্গিণীর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যায় সময় ব্যয় হয় কিছুটা। তারপর আমরা চলে আসি মূল সমস্যায়। তপ্রঙ্গিনীর জীবনের সঙ্গে জড়িত তপস্বীর যন্ত্রণার পথ বেয়ে আবিষ্কার করি শিল্পের নিগূঢ় ও নিষ্ঠুর সত্যকে। যার দেনা শোধ করতে হবে সেই 'যাজ্ঞসেনী' তরঙ্গিনীকে। সে দুঃখের হোমানলের আলোয় আবিষ্কার করবে সেই 'আর এক সত্য'। যা শিখিয়ে দেবেন তপস্বী।

তৃতীয় অঙ্কের প্রত্যাশা নিয়ে আমরা তরঙ্গিণীর সঙ্গে চলেছিলাম। চতুর্থ অঙ্কে গ্রীক নাটকের মত সব প্রত্যাশা বিন্দুকে পরিহার করে আর এক নাটক ঘটাতে দেখি তরঙ্গিণীর জীবনে। অধ্যাপক অমিয় দেব ব্যাপারটাকে বুঝতে চেয়েছেন এইভাবেঃ

চতুর্থ অঙ্কের তরঙ্গিণী এক উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক প্রেমিকা, তার অন্বিষ্ট সেই তপস্বী, যে তাকে সরলতায় দীক্ষিত করেছে। অন্যপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ এখন অভিজ্ঞ প্রণয়ী। প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরের যে ভূমিকা ছিল, তা এখআনে উল্টে গিয়াছে – তরঙ্গিণীই যেন খানিকটা তপস্বী, তার তপস্বী 'তরঙ্গিণী'।(দর্পণে দুই মুখ/ বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ)

এখানেই কিন্তু ব্যাপারটা সমাপন নয়, যেমন ভেবেছেন বিদগ্ধ অধ্যাপক। তরঙ্গিণী এই অঙ্কেই সম্পূর্ণ হয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গও অবশ্যই। এই সম্পূর্ণতা কিভাবে ঘটিয়েছেন নাট্যকার? কতটা শিল্পসম্মতভাবে সেটাই প্রশ্ন?

নাটকের অন্তিমে দেখি দুই আকাঙ্ক্ষা আশ্চর্যজনক ভাবে একই উৎস থেকে জাগ্রত হয়েও প্রায় দুই আকাশ মেলেছে শাখা। দুই নদী এক উৎস থেকে বেরিয়ে দুই ভিন্ন সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। ঋষ্যশৃঙ্গ বীতকাম হয়ে চলেছেন নিঃসঙ্গতায় সাধনায়। জানেন না তা মোক্ষের জন্য কিনা। অধরা সৌন্দর্যের ঋক্‌মন্ত্রে উদ্বোধিত সত্তা নারী প্রহত প্রেমের অভিঘাতে অতিক্রম করেছে প্রাক্তন অভ্যস্ত জীবনকে। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তাঁরই প্রভাবে দুজন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো – তপস্বী ও তরঙ্গিণী মূল বিষয় হলো এই।

যদিও সমালোচক উত্থাপন করেছেন প্রশ্নটা – পুণ্যের পথে বেরিয়ে গেল কারা? ঋষ্যশৃঙ্গ তো জানেন না তিনি কোন উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছেন। তার সামনে সব অন্ধকার, অন্ধকারেই নামতে হবে তাঁকে। তরঙ্গিণীর যাত্রা ও তো তাই। ফলে তাঁকে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের মতো নিঃসন্দিগ্ধ বিদায় বলে গ্রহণ করবো কেমন করে?

নারী-তপস্বিনী জীবনের পুরাতন তটরেখা লুপ্ত ও নতুন দিগন্ত যখন দৃষ্টির অগোচর, তখনই সমাপ্ত হচ্ছে নাটক। তরঙ্গিণীর জীবনে নাটকের অন্তিমে তার কোনো প্রার্থনা নেই। কোনো আকাঙ্ক্ষাও নেই। এই উপসংহারের কারণ কোথায়? সেকি লৌকিক প্রণয় থেকে অলৌকিক প্রেমের পথে এগিয়েছে বলে?

অথচ তৃতীয় অঙ্কের সূচনায় সে তো শুরু করেছিল একটা লৌকিক চ্যালেঞ্জ দিয়ে। যে তরঙ্গিণী বেরিয়ে ছিল জয় করতে এক জামাতাকে। গৃহী ও কামসম্ভোগী পুরুষকে। সে তরঙ্গিণী, যে তপস্বীকে জয় করেছিল একদা। এখানে কিন্তু সে হেরে গেল সম্পূর্ণ।

এই পরাজয়ের সূত্র সন্ধানের মধ্যে নিহিত আছে তরঙ্গিণীর নিরুদ্দেশ যাত্রার কারণ। কেবলই কাম থেকে প্রেম, রতি থেকে আরতির পথে যাত্রা নয় তার, তরঙ্গিণীর যাত্রাপথে আছে আশাভঙ্গের এক সুতীব্র ট্র্যাজেডি। সেই অর্থে এই নাটকের বিচারে, তপস্বীর কোনো ট্র্যাজেডি নেই। ট্র্যাজেডি তরঙ্গিনীরই। এবং তার মূল অবলম্বন তপস্বী। তরঙ্গিণীর সঙ্গসুধার স্মৃতি এবং শান্তার সঙ্গে কাম চরিতার্থতার প্রক্রিয়া পেরিয়ে তার যাত্রা পরিপূর্ণতার সন্ধানে। হয়তো তরঙ্গিণীর দ্বিতীয় উপস্থিতিতে তিনি উল্লসিত হননি। তার সাধনাশুদ্ধ আহ্বানকে গ্রহণ করার যোগ্যতাও হয়তো তিনি হারিয়েছেন তখন।

নাটকের সূচনা লগ্নে বারাঙ্গনা যে স্তবমালায় ভূষিতা হয়ে ছেড়ে দিয়ে ছিল তার যাপিত জীবনের বৈভব, চন্দ্রকেতুদের প্রথাবদ্ধ নিবেদন, সে নারী নিজের মহিমায় যে দ্যুতি খুজেছিল সেই পুরুষের চোখে, যে তাঁকে প্রথম দেখেছিল সেই জ্যোতির্ময়ী দেবতারূপে। তাই সে তাঁকে জয় করতে চলেছিল।

কিন্তু চতুর্থ অঙ্কে এসে সে কী দেখলো তপস্বীর মধ্যে? এর কোন পুরুষ? রাজপুরীর বিলাস, ব্যসন, বেশবাসে কুটিল জটিল বাক্‌শুল্পী এ কোন ঋষ্যশৃঙ্গ? এতো তার স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নয়। এর জন্যই তার এত ব্যাকুলতা! মুহূর্তে সে স্বর্গচ্যুত হলো। এবং নাগরিক মানুষটির আর কিছুতেই মেলানো গেল না তার অন্তর্লোকের পুরুষের সঙ্গে।

তরঙ্গিণী। আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই চোখ, জাগরণে দেখেছি সেই চোখ। আর এখন আমি তোমাকে দেখেছি। ... তোমাকে? সত্যি তোমাকে? কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে জাচ্ছ? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না?

তপস্বীর কাছে এই আঘাতটা জরুরী ছিল। চরিত্র দুটির টার্নিং পয়েন্ট ঠিক এই যায়গায়। এইখান থেকেই শুরু হবে তরঙ্গিণীর সন্ধান ও তপস্বীর সাধনা। তাই তো রাজর্ষি বলেনঃ

তরঙ্গিণী, আমার শেষ কথা তোমারই সঙ্গে। তুমি আমাকে জা উপহার দিলে আমি এখনো তার নাম জানি না। কিন্তু হয়তো তার মূল্য বুঝি। আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী থাকবো। তোমাকে আমি অভিনন্দন করি।

আশাহত তরঙ্গিণী যখন স্পষ্ট জানলো এই পুরুষ তার স্বপ্নের তরুণ ঋষি নন। তখন এক অসীম শূণ্যতায় নিমজ্জিত হলো সে। তাই নাটকের ঘটনাসূত্রে উচ্চারিত তার উক্তিতে দ্যোতিত হলো এক নতুনতর মাত্রা;

প্রিয়তম আমার প্রিয়তম

আমি কি আর কোনদিন তোয়াকে দেখব না?

তপস্বী। আমাকে বাধা দিও না তরঙ্গিণী।

তুমি তোমার পথে যাও।

হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।

এই পরিনামের জন্য তপস্বীর কোন বেদনাবোধ নেই। কিন্তু তরঙ্গিণীর অসীম শূণ্যতার রোদন অবরুদ্ধ হয়ে আছে এখানে। তপস্বী একটু আগে যে চরম সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন তরঙ্গিণীর কাছে তা উপলব্ধি করছে এখন সে, 'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিণী?'

তাই তরঙ্গিণীর আশ্রয় হারা প্রেম আর বাধা দেয়নি তপস্বীকে। আজ তার কোনো দাবি নেই, আর্ত হাহাকার নয়, অভিযোগ নয় – কেবলই নিষ্ক্রমণঃ

'আমি কি হব তা জানি না। আমার কি হবে তা জানি না। শুধু জানি আমাকে যেতে হবে।' যে পথে তার যাত্রা সে পথে কোনো চন্দ্রকেতু নেই লোলাপাঙ্গী নেই, শান্তা নেই রাজর্ষি নেই; রাজমন্ত্রী পুরোহিত নগর, রাজধানী নেই – সেখানে আছে এক স্বপ্নময় মন্ত্রধবনিঃ

'সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল ...আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ'

কিন্তু সবটাই অন্তর্গত অনুভববেদ্য। অসম্ভব রকমের অসহ্য যন্ত্রণাময়। এই আশ্রয়হীন নিরালম্ব আধুনিক। নৈসঙ্গতাকে পুরাণ থেকে উৎখাত করে এনে রোপন করে দিল একালের কঠিন বাস্তবের মাটিতে। যেখানে থেকে বসবাস করে কেবলই দীর্ঘ শাসিত উচ্চারণে বলা যায়ঃ

"I am looking for the face, I had

Before the world was made."

১০.৪ শান্তার চরিত্র আলোচনা

অঙ্গরাজ লোমপাদের কন্যা শান্তা নাটকের প্রথম অঙ্ক ৩য় অনুদৃশ্যে তার সঙ্গে পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ, তখন সে রাজমন্ত্রী পুত্র অংশুমানের প্রেমিকা। সাহসিকা ও ব্যক্তিত্বশালিনী, তবে নারীসুলভ সরলতা ও পরনির্ভরতা তার চরিত্রে স্পষ্ট। শান্তা সাধারণী। রাজমন্ত্রীর প্রকাশ দেখি তার উক্তিঃ

শান্তা। তাত, আমি প্রকৃতি নই, আমি শান্তা- সামান্যা এক যুবতী। দেহে ও অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে কৃষক বধূর পার্থক্য নেই। আমিও চাই পতি, সন্তান, গৃহ। চাই প্রেম ও পরিণতি বন্ধন। চাই সেবা ও স্নেহবৃত্তির স্থায়ী সার্থকতা।

ঋষ্যশৃঙ্গ কে বিবাহ করতে তার আপত্তি, এতটুকুই সব নয় তার আশঙ্কা – 'এমন যদি হয় যে, আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্য দান করে তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আমাকে ত্যাগ করলেন? যদি তার মনে হয় যে, ব্রক্ষজ্ঞানের তুলনায় নারী তুচ্ছ, জায়া পুত্র নিতান্ত অলীক?'

এই আলোচনা নাটকের প্রথম অঙ্কেই আমাদের পূর্বাভাস দেয় নাট্য পরিণতির। যদিও শান্তার জীবন সমস্যার ভেতর ডুবে যাওয়া পাঠক দর্শক সচেতন ভাবে বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে পারে না, তখন তবে নাট্যকার সূক্ষভাবে নাট্যরচনার নিয়ম রক্ষা করে সূচনাতেই পরিণতির আভাস রেখে দিলেন এখানে।

শান্তার বক্তব্য থেকে আমাদের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয় অংশুমানের প্রতি তার আকর্ষণের ইতিহাস। আর অংশুমানের পিতা রাজমন্ত্রীর কাছে সরলভাবে সব কথা প্রকাশ করার ফলে কৌশলে রাজমন্ত্রীর চক্রান্ত জ্বালে জড়িয়ে শুরু হয় তার বঞ্চিত হবার পালা। রাজমন্ত্রীর ব্যবস্থা অসাধারণ!

'আমি আজ রাত্রিতেই অংশুমানকে বন্দি করব, কয়েকটা দিন কারাগারে কাটালে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না। পুরঃস্ত্রীরা শান্তার উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখবেন, ঋষ্যশৃঙ্গের আগমণ কালে তাঁকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত।

... ঋষ্যশৃঙ্গকে রতি রহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিণী; তার ফলভোগ করবে শান্তা।'

শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ রাষ্ট্রের মঙ্গলে। রাজপুরোহিতের কৌশলী ব্যবস্থাপনায়। এই বিবাহে শান্তার ভূমিকা গৌণ। যে শান্তা অংশুমানের পিতার কাছে ঘোষণা করেঃ 'আমি আপনাকে সত্য বলছি, আমি অংশুমান ভিন্ন অন্য কারো অঙ্কশায়িনী হব না'। সেই শান্তা কিন্তু অবশেষে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে স্বাধীন ভর্তৃকা নারীর মতো। তাঁকে আমরা পাই চতুর্থ অঙ্কের প্রথম অনুদৃশ্যে। যে দৃশ্যের সূচনায় আমরা দেখি রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ আর সংলগ্ন কক্ষের অংশ। অলিন্দে ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশে দাঁড়িয়ে। কক্ষে শান্তা উপবিষ্ট, সে কেশ বিনাশ করছে, সামনে দর্পন ও কয়েকটি প্রসাধন দ্রব্য। বাইরের আকাশে পড়ন্ত বেলা।

শান্তা আসন্ন সন্ধ্যায় কেশ বিনাশের ফাঁকে গান গাইছে গুঞ্জন স্বরে। বলা বাহুল্য, নাট্যদৃশ্য পরিকল্পনায় নাট্যকার বোঝাতে চান – শান্তার এই গান ঋষ্যশৃঙ্গ শুনতে পাচ্ছেন না। তেমনিই ঋষ্যশৃঙ্গের অলিন্দ থেকে আত্মকথনও শুনতে পাচ্ছে না শান্তা। শান্তার গানে কি বাইরের ঐশ্বর্যময় আড়ম্বর ঘন আভ্যন্তর শূণ্যতার ইশারা? আমাদের অন্তত তাই মনে হয়ঃ

১

সুন্দর তুমি, পেটিকা,

অন্তরে নেই রত্ন।

পাত্র এখনো মণিময়,

নিঃশেষ তার সৌরভ।

২

উজ্জ্বল তুমি, চক্ষু,

কেন ভুলে গেলে বার্তা?

রঙ্গিনী আজো করবী,

অঙ্গুলি শুধু ক্লান্ত।

৩

আসে যায় দিন-রজনী,

আসে জাগরণ, তন্দ্রা

শুধু নেই হৃতস্পন্দন,

লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

শান্তার এই গানে ধরা পড়েছে শান্তার জীবন। অংশুমানহীন জীবন। সমাজ ও রাজ পরিবারের ভকাছে দায়বদ্ধ, ঐশ্বর্য আড়ম্বরের আবরণে ঢাকা শূণ্য, রিক্ত জীবন। লুণ্ঠিত-স্বপ্ন জীবন। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে অভ্যস্ত জীবনের ফাঁকিটুকু আর অতঃপর আমাদের কাছে অপ্রকাশ থাকে না। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে গোপন রাখে সে এই দবিচারিতা। সে ঋষ্যশৃঙ্গকে বলেঃ 'আপনার গৌরবে গর্বিত আমি, প্রভু'।

নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী রূপে শান্তাকে দেখানো হয়েছে মাত্র। ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্রের জননী হিসেবে হয়নি, জননী ও জায়া শান্তার মনে গৌরব বা সুখ ছিল না। তাই অংশুমানের দাবি প্রতিষ্ঠা মুহূর্ত তার মনে কেবল লোকপবাদের ভয় ছাড়া আর কোনো কষ্ট দেখি নি আমরা। কিংবা দেখি না কোনো দ্বন্দ্বমুখরতারও যখন ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে সমর্পন করেন অংশুমানের হাতে।

এরপর নাটকে আর শান্তা চরিত্রের কোনো ভূমিকা থাকে না। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির কাছ থেকে শান্তা ফিরে পায় তার কৌমার্য। ফিরে পায় তার প্রেমিক অংশুমানকেও। শান্তার নতুন জীবন নাটকের বিষয় নয়।

১০.৫ লোলাপাঙ্গী ও বিভাণ্ডকের চরিত্রালোচনা

তরঙ্গিণী জননী লোলাপাঙ্গী। চম্পানগরের গণিকাদের মধ্যমণি তরঙ্গিণীর জননী। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে, আহরিত জ্ঞান দিয়ে পৌরাণিক যুগের এই নগর গণিকাদের প্রধানার চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

রাজমন্ত্রীর কাছে তরঙ্গিণীর শিক্ষাদীক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখের লোলাপাঙ্গী নিজের অভিজ্ঞতা শিক্ষা ও রুচির পরিচয় দিয়েছে। সে যা জানে, যা শিখেছে তাই শিখিয়েছে তার আত্মযাকে। যে শিক্ষায় সে রমণী, মোহিনী ও মনোহারিণী হয়ে উঠেছে। লোলাপাঙ্গীর কলানৈপুণ্যের কথা জানা যায় রাজমন্ত্রীর উক্তি থেকেঃ শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃতদ্রংষ্টা কুরুপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে,"

বারাঙ্গনা লোলাপাঙ্গী স্বাভাবিক ভাবেই বাক্‌পটিয়সী, রাজমন্ত্রীর সঙ্গে সংলাপে সে বলেঃ লোলাপাঙ্গী। 'ছলনা প্রভু? আমরা একে ছলনা বলি না, বলি জীবিকা। ...আমরা সময় বুঝে মধুকুন্ড, সময় বুঝে বিষভান্ড।'

যদিও নাটকের মূল বক্তব্যের নিরিখে চরিত্রটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু নাট্যকার চরিত্রকে বিশেষ একটু নজর দিয়েছেন। এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র যবনিকা পতন হয়েছে লোলাপাঙ্গীর বাণী ও ভঙ্গি দিয়ে। এজন্য নাট্যরস ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। আমরা বলতে চাইছি চরিত্রটির প্রতি লেখকের সহানুভূতির কথা বলছি।

বিভান্ডক-

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় অনুদৃশ্যে কর্কশ দর্শন বিভান্ডক মুনির প্রবেশ। তিনি সুদর্শন তরুণ ঋষি তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা। যেমন লোলাপাঙ্গী তার আত্মজা তরঙ্গিনীকে শিখিয়েছে তার কলাবিদ্যা, তেমনি বিভান্ডক বলেন পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকেঃ

'তুমি আমার পুত্র – আমার শিষ্য। আমার শিষ্য। আমরা ব্রক্ষচারী। কঠিন আমাদের নিষ্ঠা, দুর্জয় আমাদের নিয়ম। আমাদের ক্রিয়াকান্ডে কোনো ব্যত্যয় আমরা সহ্য করি না।'

এই বিভান্ডকের চরিত্রের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিঃ

১। পিতৃস্নেহ ২। পুণ্যলোভ।

তার চরিত্রের পৌরাণিক চরিত্রের বদল ঘটিয়েছেন বুদ্ধদেব। মহাভারতের থেকে জানা যায়,

রাজা লোমপাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দিলে বিভান্ডক লোমপাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাকে অভিযুক্ত করেন পুত্রকে স্বধর্মভ্রষ্ট করার জন্য। পরে রাজধানীতে এসে পুত্রের ঐশ্বর্য, বৈভব দেখে খুশী হয়ে রাজপুরীতে বসবাসের অনুমতি দেন। এবং বলেন – "পুত্র! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয় কার্য সকল সর্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিব"

পরিণতিতে পিতার নির্দেশেই মান্য করেন ঋষ্যশৃঙ্গ। এবং তার বন গমনকালে শান্তা ও তার সেবা কাজের জন্য সহগামিনী হন।

কিন্তু বুদ্ধদেবের নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে দুদিকেই। স্বধর্ম ভ্রষ্ট হবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে ক্ষমা করেননি বিভাণ্ডক। পুত্রের কাজে তিনি ক্ষুব্ধ। সেই ক্ষোভ ও অসূয়া প্রকাশেও তিনি স্পষ্টবাক্ -

"তুমি আজ যুবরাজ(তিক্ত স্বরে) এরই জন্য আমি তোমাকে জন্মকালে পরিত্যাগ করিনি। অতি যত্নে তপোবনে লালন করেছিলাম। এরই জন্য বন্য মৃগীরা তোমাকে স্তন্য দিয়েছিল, সং দিয়েছিল সরল, নিরপরাধ পশুপক্ষী। আর আমি তোমার ব্রক্ষচারী পিতা বিভাণ্ডক – আমি তোমাকে আজন্ম দেব মন্ত্র শুনিয়েছিলাম, যজ্ঞ সৌরভে পূত করেছিলাম তোমার চেতনা! এরই জন্য।"

পুত্র স্নেহে বিহ্বল এই তপস্বীকে আবিষ্কার করি তার এইসব উক্তিতে;-

"শোনো আমি তোমার পিতা, আমি প্রবীণ কিন্তু আমি জানি আমি ঋত্বিক মাত্র, ঋষি নই যজ্ঞপরায়ণ প্রয়াসী মাত্র। জীবন্মুক্ত মহাত্মা নই। কিন্তু তুমি – আমি তোমার মধ্যে ঋষিত্বের লক্ষন দেখেছি; মন্ত্রের উদ্গাথা শুধু নয়, মন্ত্রের স্রষ্ট্রা হবে তুমি; হবে ব্রম্ভ বেত্তা, শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, হবে ত্রিলোকের পূজনীয়। তুমি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ! পুত্র, আমার সেই আশা তুমি ভঙ্গ করো না।"

১০.৬ অংশুমানের চরিত্রালোচনা

অংশুমান রাজমন্ত্রীর পুত্র। রাজকন্যা শান্তার প্রেমিক। তার দ্বিতীয় পরিচয়ই নাটকে গৃহীত। শান্তার মুখে প্রথম আমরা অংশুমানের কথা শুনি। শান্তা – অংশুমানের ব্যক্তিগত প্রেম মর্যাদা পাইনি রাষ্ট্রের প্রয়োজনের কাছে। পিতা ও রাজমন্ত্রী তাকে বন্দী করেন শান্তা ও ঋষ্যশৃঙ্গের মিলন ঘটাবার জন্য। এ বিবাহকে তাই অংশুমানই প্রথম অভিহিত করেছে চক্রান্ত বলে। ৪র্থ অঙ্কে বিবাহিতা শান্তাকে ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে সে বলেঃ

'অংশুমান ঐ ভ্রষ্ট ব্রহ্মচারী তোমার স্বামী। মানি না - মানব না। সে – কথা । শান্তা, তুমি আমাকে বরণ করে ছিলে। আমি তোমাকে বরণ করেছিলাম আর এই ঋষ্যশৃঙ্গ তোমার তথাকথিত পরিণয় – আমি একে বলি রাজনীতির যূপকাষ্ঠ।'

সমগ্র দেশ যে বিবাহ কে বাঞ্ছিত বলে একমাত্র অংশুমান(আর শান্তা!)ই তাকে সাহসের সঙ্গে রাজনীতির যূপকাষ্ঠ বলে ঘোষণা করে। অংশুমান সাহসী, সত্যবাদী, ও প্রেমিক। তার শান্তাকে রাষ্ট্রের নিয়মের জন্য অন্যের বাহুলগ্ন হতে হলো। ব্যক্তির জীবনের উপর সুপার স্ট্রাকদের এই আধিপত্য পুরাণ কথায় এই নাট্যকারের নূতন সংযোজন। এই জন্য সে শান্তাকে দায়ী করে না।

তৃতীয় অঙ্কের অনুদৃশ্য – ১ বলেঃ

অংশুমান। ঋষ্যশৃং...আর তরঙ্গিণী ... আর আমার পিতা
...কুটিল চক্রান্ত! নির্বোধ আমি! আর তুমি – অবলা,
নির্জিতা, অসহায়! না – আর নিষ্ক্রিয়তা নয় –
অনুশোচনা নয় – এখন চায় উদ্যম।

এই দৃশ্যে কারাগার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত অংশুমান কে প্রথম আমরা দেখি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে। দুটি চরিত্রকে তাই এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়েছে একটি ঘটনা। ঋষি তপস্বীর কৌমার্য ভঙ্গ ও বিবাহ। এর ফলে বারাঙ্গনার অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে স্থলিত অন্যমনস্ক তরঙ্গিণী সরে গেছে চন্দ্রকেতুর জীবন থেকে। আর কৌমার্য ভ্রষ্ট ঋষি নগরে এসে শান্তাকে বিবাহ করায় শূণ্য হয়ে গেছে অংশুমানের জীবন। পরিস্থিতি এ রকম না হলে অংশুমান ও নিশ্চয়ই অজস্র বৃষ্টিস্নাত নাগরিকের মতো স্তব করতো ঋষ্যশৃঙ্গের। এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী স্পর্ধায় ঋষিকে শুনিয়ে দিত নাঃ

১। "অঙ্গদেশের অনাবৃষ্টির জন্য লোমপাদ দায়ী ছিলেন না। বৃষ্টিপাত ও আপনার কৃতি নয়। যা ঘটেছে তা বিশুদ্ধ কাকতালীয়।"

২। "(তাচ্ছিল্যের স্বরে) আমার? আপনি ভুল করছেন, কিন্তু আপনার মতো লোহজিহ্ব কামার্ত নয়। আপনি নাকি তপস্বী ছিলেন? নিজেকে আপনার ক্লেদাক্ত মনে হয় না?"

এই অংশুমান সাধারণ মাপের মানুষ। প্রাপ্তির হর্ষ, আপ্রাপ্তির বিষাদ ছাড়া তার মনের অন্য কোন ভাব প্রবাহ নেই। নেই ঋষ্যশৃঙ্গের মত ভোগাতিরিক্ত আত্মার আর্তি ও নির্বেদ।

১০.৭ চন্দ্রকেতুর চরিত্র আলোচনা

চম্পা নগরের নাগরিক চন্দ্রকেতু। তরঙ্গিণীর অনেক প্রেমিকের একজন। বিশিষ্টতম তরঙ্গিনীকে ভালোবাসে চন্দ্রকেতু তার সৌন্দর্যের জন্য। বারাঙ্গণাকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে যেতেও তার আপত্তি নেই। তৎকালের সামাজিক বাতাবরণে এ ব্যাপার অগ্রাহ্যও ছিল না। তরঙ্গিণীর জননী লোলাপাঙ্গীরও তাতে সমর্থন ছিল। তবু চন্দ্রকেতু ও তরঙ্গিণীর আর মিলন ঘটলো না।

ঋষ্যশৃঙ্গকে অংশুমানের মতো সেও সহ্য করেনি। দুই পুরুষের স্বার্থ যখন একবিন্দুতে মিলে গেছে, তখন তাঁরা একই ভাবে আক্রমণ করেছে ঋষ্যশৃঙ্গের এই পতন কে।

চন্দ্রকেতু বিশ্বাস করেছে তার পরিচিতা তরঙ্গিণীর এই স্বাভাবিক হয়ে ওঠার পিছনে আছে ঋষির অভিশাপ। যে ব্রম্ভচারী ঋষিকে সেই নারী করেছে স্বধর্ম ভ্রষ্ট। তাই সে লোলাপাঙ্গীকে নিয়ে তরঙ্গিণীর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়েছে, চেয়েছে তার শাপ মুক্তি নিরাময়।

কিন্তু সে বোঝে নি তার বাঞ্চিতাকে। তরঙ্গিণী চন্দ্রকেতু ও ঋষ্যশৃঙ্গের তুলনা করেছে নাটকে। প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষণধর্মী সে আচরণ ব্যক্ত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কের অনুদৃশ্য ৩অঙ্কের অনুদৃশ্য ৩তে।

তরঙ্গিণী জানতে চেয়েছে –

চন্দ্রকেতু। সত্যি বলো – আমি রূপবতী? ...

তরঙ্গিণী। সত্যি? আমার রূপের বর্ণনা দিতে পারো?

চন্দ্রকেতু। পঞ্চস্বরের ললাট, ধনুর্গুণ তোমার ভুরু,
পঞ্চবাণ তোমার কটাক্ষ, তার তূণ তোমার গ্রীবা,
তোমার সর্বাঙ্গ তার অভিসন্ধি। তুমি শ্রী, তুমি দীপ্তি,
তুমি বিশ্বকর্মার প্রথমা।

তরঙ্গিণীর তুলনা করে ঋষি তাপসের সঙ্গে চন্দ্রকেতুর এই কেতাবি রূপ বর্ণনার। সে জানায় –

“চন্দ্রকেতু তুমি কাব্য পরেছো! তুমি বিদগ্ধ, তুমি সজ্জন, কিন্তু আমি যা চাই, তা কি তুমি দিতে পারবে? আমি চাই আনন্দ – প্রতি মুহূর্তে আনন্দ।”

বস্তুত চন্দ্রকেতুর পক্ষে তরঙ্গিণীর এই আনন্দিত প্রার্থনাপূরণ অসম্ভব। অসম্ভব যে কোনো পুরুষের পক্ষে। কে জানে ঋষ্যশৃঙ্গের পক্ষেও কি তা আর সম্ভব?

১০.৮ রাজমন্ত্রী

লোমপাদের মন্ত্রীর কোনো ব্যক্তিনাম ব্যবহৃত হয়নি নাটকে। রাজপুরোহিতেরও না। চম্পানগরীর সুরক্ষা ও উন্নতির স্বার্থে এই মন্ত্রী নিজের পুত্রকেও বন্দী করেন। নিয়মরক্ষা ও ব্রতপালনে মন্ত্রী রাজপুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটেন। সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থে, পিতৃস্নেহ ও রাজ্যলোভকে বর্জন করে তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ ও শান্তার বিবাহ ঘটান। এজন্য লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তার বৈষয়িক বুদ্ধি ও বিবেচনা বোধ ধরা পড়ে। শান্তার সঙ্গে ছলনাও সেই সমষ্টির স্বার্থের সহযোগী। আবার তপস্বী যখন শান্তার সন্তানের জন্মদানের রাজধানী ত্যাগ করে জান, তখন ঋষির বরে কৌমার্য ফিরে পাওয়া শান্তাকে নিজের পুত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থাপনায় পুরোহিতের সঙ্গে নিয়মনিষ্ঠ ব্রতপালনের তৎপরতায় তাকে দেখি। রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সহযোগিতায় ব্রত উদজাপনে আর কোনো বাধা থাকে না। রাজমন্ত্রীর জ্ঞান, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততা খুব স্পষ্ট ও মোটা দাগে ফুটে উঠেছে নাটকে। কোথাও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অথবা কাব্যিক সৌকুমার্যের ছোঁয়া লাগেনি।

১০.৯ রাজপুরোহিত

রাজপুরোহিতও এ নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার নির্দেশ ও ঘোষণায় তরঙ্গিনীকে দিয়ে রিচ্যুয়াল পালনের চেষ্টায় নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির জীবনে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম টানাপোড়েন শুরু হয়েছহে।

তিনিই অমোঘ মন্ত্রে শুনিয়েছিলেনঃ

অক্ষম আজ অঙ্গরাজ, বীর্য তার নিঃশেষ,

শুষ্ক তাই মৃত্তিকা, রিক্ত নভোতল।

পৃথিবীর যিনি পতি, তাঁর কষে নেই বীজবিন্দু।

রুদ্ধ তাই ঋতু, নেই শস্য, গোবৎস সন্তান।

তাঁর এই ঘোষনায় কোন কপটতা নেই। এ তাঁর অন্তর্গত বিশ্বাস। লোকাচার প্রচলিত বহু যুগবাহিত সংস্কার। আবার নাটকের শেষ পর্বে কৌমার্য ফিরে পাওয়া শান্তার সঙ্গে অংশুমানের বিবাহ ব্যাপারে রাজমন্ত্রীর দ্বিধা ও সমস্যাকে কাটিয়ে এই পুরোহিতের উচ্চারণ করেন মন্ত্র। যাতে রাজমন্ত্রী পেয়ে যান তাঁর সঙ্কট মুহূর্তের ধর্মানুসারী নির্দেশঃ

"তোমরা অবতীর্ণ মঞ্চে – প্রার্থী, মাতা, অমাত্য;

কেউ কামার্ত, কেউ সহৃদয়, কেউ রাষ্ট্রপাল;

চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমরা

বহু মঞ্চে, বহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষ,"

১০.১০ শ্লীলতা অশ্লীলতা এবং তপস্বী ও তরঙ্গিণী

শিল্পের সঙ্গে নীতির প্রশ্নটিকে জড়াতে গিয়ে অনেকেই যে শিল্পকে আঘাত করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং এই নীতিহীনতাকেই তাঁরা অশ্লীলতা বলেই অভিহিত করতে চান। গ্রীক দার্শনিক Plato মনে করতেন আর্ট নীতি বিগর্হিত সৃষ্টি – তাঁর দ্বারা মানুষের মনের কোনো নৈতিক বোধ সঞ্চারিত হয় না, সুতরাং তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজী সাহিত্যের নৈতিক প্রাধান্য গুরুত্ব পেতে থাকে। ঐ সময়ের কার্লাইল, রাসকিন, টেনিসন প্রমুখ কবিরা নীতিকে কাব্য সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ করে তুলেছিলেন।

কথাটা বিতর্ক বহুল। যথার্থ শিল্প যে নীতিকে বাদ দিলে সৃষ্টি হয় – একথা আমাদের প্রতিপাদ্য নয়। কিন্তু মহৎ শিল্পের কাছে সব সময় নীতি হয়ে চোঠে না। Sophocles এর Oedipus, শেক্সপীয়রের Hamlet বা Macbeth - এ নীতি বড় হয়ে দেখা দেয়

নি। বস্তুত পক্ষে আর্ট নীতি বির্গহিত সৃষ্টি – তাঁর দ্বারা মানুষের মনের কোনো নৈতিক বোধ সঞ্চারিত হয় নি, সুতরাং তিনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

মনে রাখতে হবে যে, শিল্প, সাহিত্য, দৃশ্য বা ঘটনাকে দেখার ভঙ্গি অনুযায়ী ঐসবের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। বস্তু বা দৃশ্যটা একই, কেবল যে দেখছে তাঁর রুচি, সংস্কার সমাজ বিচারের লগ্নতাই তাঁর আসবাদনের মনোভাবটা তোইরি করে দেয় মাত্র। শিল্প সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সেটা গুরুত্ব পেয়ে যায় স্বভাবতই। কথিত আছে Wordsworth –লুভ্ এর জাদুঘরে নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ কাতরতির মূর্তি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, Dammed! মূর্তির মধ্যে যে মানবসত্য অত্যন্ত সহজ সুন্দরভাবে ধরা দিয়েছে তাকে কবি গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর রুগ্ন মন একে অশ্লীল বলে মনে করেছে। কবির এই মনোভাবকে সমালোচক Huxley প্রশংসা করতে পারেন নি।

আমরা মনে করি, জীবন সুনীতি বা দুর্নীতি – শ্লীলতা বা অশ্লীলতারর সীমা ছাড়িয়ে। এখানে আলো অন্ধকার, পাও পুণ্য সকলই আছে। শিল্পের সৌষম্যের প্রয়োজনে যখন জীবুনের এই সম্পূর্ণ রূপের ব্যবহার করেন শিল্পী তখন তাকে অশ্লীল বা অনৈতিক বলা চলে না।

সমরেশ বসুর ‘প্রজাপতি’র বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠলে কোর্টে বুদ্ধদেব বসুকে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল।(১৯৬৮)। বুদ্ধদেব সে সময়ে বলেছিলেনঃ পবিত্রতা রসায়ন শাস্ত্রের কথা। এর সঙ্গে সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যেখানে সজ্ঞানে নীতিকে লঙ্ঘন করে আমাদের মনে Evil বা মন্দকে উসকে দেওয়া হয় সেখানে তা অনৈতিক বা অশ্লীল। পক্ষন্তরে বহির্গত, সমাজগত বা গোষ্ঠীগত নীতি কাব্যকে পরিচালিত বা প্রভাবিত করলে কাব্য বা সাহিত্যের রস ক্ষুন্ন হয়। তাই Sampson বলেন, “Art is the product of man’s native energy, and has a ‘Morality’ of its own, which consists in artistic sincerity and not in ethical purpose.”

জীবনের সত্যরূপ তুলে ধরতে গিয়ে শিল্পীকে যখন নগ্নতা ও আদিবাসীকে তুলে ধরতে হয় – তখন যদি নীতিবাদীরা চিৎকার করতে থাকেন তা হলে শিল্পী তো নিরুপায়।

Scott James বলেছিলেন, “Life ought to be like that says the moralist; Life looks like that says artist”

ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্পকলা কিংবা রামায়ণ বা মহাভারতের আদি কলার চিত্র প্রসঙ্গগুলি এই সব কথারই বক্তব্যকে প্রকাশ করে দেয় যেন। Life looks like that. বুদ্ধদেবের তপস্বী তরঙ্গিনীতে সেই চেষ্টাই লক্ষ করা যাবে।

এই নাটকে তপস্বী তরঙ্গিণীর দেহ মিলনের দৃশ্যটিকে কাম দৃশ্য বা রিরংসার উদ্বেজক চিত্র বলেও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু লক্ষ করার ব্যাপার এই নাটকে সূচনা থেকেই বৃষ্ট ও বীর্যের প্রার্থনা কে এক করে দেখানো হয়েছে। এই ব্যাপারটি একটি সুপ্রাচীন Ritual এর সঙ্গে যুক্ত। নাটকের শুরুতে গাঁয়ের মেয়েদের যে বৃষ্টির প্রার্থনা তা একাধারে আকাশের বৃষতি ও বৃদ্ধ, বীর্যহীন অংরাজের দেশে পুরুষের বীর্যের প্রার্থনা হয়ে দেখা দেয়।

দ্বিতীয় অঙ্কে তরুণ বীর্যবান ঋষিকে মালা পড়িয়ে দিতে দিতে যে মন্ত্র উচ্চারণ করলে তরঙ্গিণী তা কি সংকেতবহ ভাবে সেই কথায় ঘোষণা করল না!

“জয়ী হোক প্রাণ, জয়ী হোক মৃত্যু।
ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হলো
গর্ভে বীজ, গর্ভে জল
বীজ, বৃক্ষ, ফুল, ফল,বীজ বৃক্ষ।”

কিংবা ঋষ্যশৃঙ্গের আরও নিবিড় সান্নিধ্যে এসে তাঁর উচ্চারণ

তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি।
আমি তোমার তৃপ্তি।
সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র।
চলে মন্থন, মন্থন - মন্থন। দীর্ণ মেঘ তীব্র বেগ,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরনী।
বর্ষণ – বর্ষণ - বর্ষণ”

এখানে দেহ মন্থনের চিত্র বর্ণনাতে উদ্ধার করেন বুদ্ধদেব। কামনা রমনলীলা যে নিছপক দেহ বিলাস নয়, তা যে সমগ্র সত্তার উন্মীলন, আদিম মানব সভ্যতায় ভূমিকর্ষণ, কৃষি ও প্রজননের প্রক্রিয়ায় সঙ্গে তাঁর যোগ একথা প্রকট হয়ে নাটকে। তখন আর দৃশ্যটির প্রতিক্রিয়া অশ্লীল বলে। অনৈতিক বলে মনে হয় না। কেউ কেউ আবার ঋষ্যশৃঙ্গের বাসনা অতৃপ্তি এবং বিবাহিত হয়ে অন্য কোন নারীর প্রতি কামনাকে অশ্লীল ও অনৈতিক বলে মনে করেছেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার বিরুদ্ধে যেমন মোহিতলাল তুলেছিলেন অশ্লীলতার অভিযোগ, প্রায় সেই ধরনের, তরঙ্গিণীর বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে নিজের কামনার পর্যবেক্ষণ কে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। তরঙ্গিণী যখন বলেঃ

"দর্পন, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী?
সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে?
আরো তন্বী?
তাঁর অধর আরো রক্তিম?
বক্ষ আরো সুগন্ধি।
তাঁর বাহুতে কি আরো বিশাল"

আপন সত্তার গহন লোকে তরঙ্গিনী যখন না দেখা শান্তার সঙ্গে নিজের তুলনা করে, প্রায় যুদ্ধে নামে, যখন দর্পনে নিজের বেশবাস ও প্রসাধন দেখে এ সব কেও নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে (চিত্রাঙ্গদা) যেমন তাঁর ধার করে পাওয়া রূপকে ঈর্ষা করেছিল, তখন আপাত দৃষ্টিতে বিষয় টিকে অনৈতিক বলে মনে হলেও– দুটি হৃদয়ের বিশাল কামনা ও সত্য চাওয়াকে বুঝতে এই অনুভব গুলির মূল্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঋষ্যশৃঙ্গের অতৃপ্তি বিস্বাদ কিংবা তরঙ্গিণীর এই যন্ত্রণা খুব স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার বলেই মনে হয় আমাদের কাছে। নাটকের শেষ অনুদৃশ্যে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর তাৎপর্য পূর্ণ সংলাপগুলিও অনেকের কাছে অনৈতিক বলে মনে হবে।

লোলাপাঙ্গী তো তরঙ্গিণীর জননী আবার চন্দ্রকেতু ছিল তরঙ্গিণীর প্রেমিক। তাকে না পেয়ে, ঘরে ফেরাতে না পেরে এ দুটি চরিত্র যখন বলেঃ

চন্দ্রকেতু। শূণ্যঘর তরঙ্গিণী নেই।

লোলাপাঙ্গী। শূণ্যঘর তরঙ্গিণী নেই, আমরা সমব্যথী।

চলো। আমি

তোমাকে সান্ত্বনা দেব। তুমি আমকে সান্ত্বনা

দেবে।

চন্দ্রকেতু। আমরা দুজন এখন সমদুঃখী চলো।

লোলাপাঙ্গী। আমি নেখনো বৃদ্ধা হয়নি। চলো।

আসলে সমাজ সম্পৃক্ত নীতি দৃষ্টি দিয়ে এ সম্পর্ক কে দেখলে হবে না। লোলাপাঙ্গীরা নারী ও মোহিনী রমণী ও পণ্যা বলে চন্দ্রকেতুকে পুরুষ ও সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করে কোন রকমের প্রশ্ন ছাড়াই। এটা তাঁদের জীবন জাপন রীতির বিরুদ্ধাচারী নয়, তাই নাট্যকার বলেন, 'নাটকের সর্বশেষ মুহূর্তে ললাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর অভিনয় হবে অতি সুকুমার, বোঝাতে হবে যে, তাঁদের দুঃখটা মেকি নয়, কিন্তু তাঁদের পক্ষে জীবনের গ্রাস অপ্রতিরোধ্য। কিছুটা চেতন কিছুটা অচেতন ভাবে আত্মপ্রতারণা করচগে তাঁরা কেননা তরঙ্গিনীকে হারাবার পএও তাঁদের বেঁচে থাকতে হবে...'

আসলে একে অনৈতিক বা অশ্লীল বলে মনে হয় না। কেননা Life looks like that says artist।

১০.১১ অনুশীলনী

১)তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্র আলোচনা কর।

২)তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে তরঙ্গিনী কি বলিষ্ট চরিত্র মনে হয়, তার ধ্যান ধারণার বিবরণ নাটকে যেভাবে উঠে এসেছে ব্যক্ত কর।

৩)তপস্বী তরঙ্গিনী নাটকে শান্তার চিত্তের দৃঢ়তা যে ভাবে উঠে এসেছে ব্যক্ত কর।

৪)নাটকে যেভাবে অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র ধরা দিয়েছে তা আলোচনা কর।

১০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাটকের বিবর্তন – বৈদ্যনাথ শীল।

২) বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার – কমলেশ চট্টোপাধ্যায়।

৩) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক – পুলিন দাস।

৪) তপস্বী ও তরঙ্গিণী – লায়েক আলি খান।

৫) বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী তরঙ্গিনী – ড. তারকনাথ ভট্টাচার্য।

১০.১৩ উপসংহার

নাটক কোন সীমাবদ্ধ সাহিত্য নির্মিতি নয়, এর সৃজনের মধ্যে একাধিক শিল্পমাধ্যম একত্রিত থাকে। ফলত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশও বেশি। তাই সেই অষ্টাদশ - উনিশ শতক থেকেই দেখে এসেছি নাটক তার অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমকে একটু একটু করে স্বকীয়তার স্তরে উন্নীত করতে করতে ধীরে ধীরে নিজেকে আজকের বিচিত্রতার স্তরে নিয়ে এসেছে। আজকের দিনে তাই সেই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার বিচিত্রতার মুল্য অনস্বীকার্য। বুদ্ধদেব বসু ছিলেন আধুনিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় মধুসূদন পরবর্তী অন্যতম কারিগর। সৃজনে এতটা নির্ভীক, দরদী, ও নিবেদিত প্রাণা মানুষ খুব অল্পই দেখা যায়। তপস্বী ও তরঙ্গিনী শুধু মনস্তত্ত্বের পরিকাঠামোয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃজনই হয়ে ওঠে নি, সাহসিকতায়, বীর্যবত্তায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ। পাঠ ও দুর্বোধ্য পাঠের বিপরীতে এক জ্বলন্ত সৃষ্টি।

একক ১১- ছেঁড়া তার - লেখকসত্তা, সমকাল ও তুলসী লাহিড়ী

বিন্যাসক্রম

১১.১ লেখক সত্তা ও তুলসী লাহিড়ী

১১.২ ছেঁড়া তার ও সমকালীন সমাজ

১১.৩ ছেঁড়া তার নাটকের নামকরণ

১১.৪ গণনাট্য, নবনাট্য, ও ছেঁড়া তার নাটক

১১.৫ অনুশীলনী

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি।

১১.১ লেখক সত্তা ও তুলসী লাহিড়ী

নট নাট্যকার পরিচালক ও গীতিকার তুলসীদাস লাহিড়ী বাংলা নাট্য সাহিত্যের এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রথমে গণনাট্য এবং পরে নবনাট্যে বহুরূপী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। সৎ আদর্শপ্রবণ জীবনধর্মী নাটক রচনার সূত্রপাত হয়। জন্মস্থান রঙপুরের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি, কৃষিজীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের কঠিন আঘাত, বিশেষ আদর্শবোধ ও মূল্যাবোধে আস্থা তাকে সৃষ্টিশীল নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করে। প্রথমে পিতার কাছে থেকে সঙ্গীত প্রেরণালাভ, তারপরে রঙপুরের শ্রী তারাপ্রসন্ন স্যানালের কাছে অভিনয় শিক্ষা, শেষে ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁর সহযোগিতায় ১৯২৯ সালে দুখানা গানের রেকর্ড প্রকাশ। তারপর 'স্বয়ংবরা', 'পোষ্যপুত্র', 'মন্দির' প্রভৃতি নাটকে সুর সংযোজনে হাতেখড়ি। প্রখ্যাত অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের হাত ধরেই গণনাট্য জগতে প্রবেশ। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেই তুলসীর প্রথম নাটক 'দুঃখীর ইমান' এর পরিচালনা।

কিন্তু বহুরূপীতে তুলসী 'পথিক' অভিনয় করে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরে ছেঁড়া তার নাটকটিও অভিনীত হয়(১৭ই ডিসেম্বর, নিউ এম্পায়ার)। যদিও পরবর্তী কালে তুলসী লাহিড়ী বেরিয়ে আসেন বহুরূপী নাট্যদল থেকে। তাঁর রচিত নাটকগুলি হলঃ-

১) দুঃখীর ইমান (১৯৪৭)

২) পথিক (১৯৪৯)

৩) ছেঁড়া তার (১৯৫৩)

৪) বাঙলার মাটি (১৯৫৩)

৫) লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার (১৯৫৯)

৬) ঝড়ের মিলন (১৯৬০)

৭) নাট্যকার (১৯৫৬)

১১.২ ছেঁড়া তার নাটক ও সমকালীন সমাজ

ছেঁড়া তার এর বিষয়বস্তু প্রাথমিক অধ্যয়নে আমরা বুঝে নিতে পারি যে এটির প্রেক্ষাপট মূলত মৌলবাদী জেহাদী মুসলমান ধর্মের বীভৎস এবং তার সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রান্ত উত্তরবঙ্গের মন্বন্তর কবলিত হিন্দু মুসলমানের জীবনবেদ। তাছাড়া একটি তথ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে তুলসীদাস লাহিড়ি গণনাট্য-নবনাট্য ধারারয় একজন অতি বাস্তববাদী সামাজিক নাট্যকার। সে কারণেই 'ছেড়া তার'-ও গণনাট্য-নবনাট্য ধারারই প্রভাব সঞ্জাত এক সামাজিক নাট্য দলিল। গণনাট্য ধারার নাটকগুলির একটি অত্যাবশ্যক দিক হল অত্যাচারী শাসক শোষক সম্প্রদায়। কিংবা ব্যাক্তির বিরুদ্ধে তাদের জেহাদি, মনোভঙ্গীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিত এবং শোষিত জণগণের সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সংগ্রামের মানসিকতাকে জাগ্রত করে দেখানো। কার্যত সেকারণেই এই জাতীয় নাটকে শোষক শোষিত এই দুই যুযুধান গোষ্ঠীর সর্বদা উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ছেঁড়া তার নাটকে তিনটি অঙ্কের মোট নয়টি দৃশ্যের সীমায়িত নাট্য ঘটনায় কিছুটা হলেও দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্র প্রকাশিত। এ দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুলে কিছুটা যেমন

ধর্মের নীতি এবং সামাজিক অনুশাসন যেমন রয়েছে, তেমনি বেশিরভাগ দখল করে রয়েছে মন্বন্তর কবলিত প্রান্ত উত্তরবঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়ের শোচনীয় দুরবস্থা। অবশ্য মন্বন্তরের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ তেমন প্রকট নয়। কারণ বিরূপ প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার কাছে সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অসহায় শিশুর মতন অতি অক্ষম। কিন্তু মন্বন্তরের অনাহারী দিনগুলিতে সুবিধাভোগী মাতব্বরের মত মানুষকে তারা বেশ পরখ করে নিতে পেরেছে। সে কারনে নাটকে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে হাকিমুদ্দীকে। সেই শোষক সম্প্রদায়ের হৃদয়হীন প্রতিভূ। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের কাহিনি থেকে এই সত্যই প্রমানিত হয় যে বাইরের দেখায় এই নাটক মাতব্বর হাকিমুদ্দী এবং শিক্ষিত বুদ্ধিমান ভালো মানুষ রহিমুদ্দির বিরোধ এবং রহিমুদ্দির সামূহিক বিপর্যয়। কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু গভীরে অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের ঘটনার বয়ান থেকে এও প্রমানিত হয় যে এই নাটক কেবল মাত্র হাকিমুদ্দী রহিমুদ্দীর হালকা সেন্টিমেন্টের সংঘাত সংঘর্ষ কিংবা রহিমুদ্দির বিপর্যয়ের কাহিনির নাট্যরূপ নয়; বৃহত্তর অর্থের হাকিমুদ্দীর মত প্রজা শোষক এবং তার মাতব্বরীর বিরুদ্ধে তার লালসার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ কৃষক সম্প্রদায়ের সংগ্রামী মানসিকতার এবং অত্যাচারের প্রতি বিধান কল্পে প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংঘটিত হবার নাটক এটি। এই দিকের বিচারে সংগ্রামী মানুষদের জননায়ক হিসেবে রহিমুদ্দীই নাটকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নাটকে প্রথমে ব্যক্তিগত সংঘাত প্রসঙ্গটি বিচার করা যেতে পারে। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে রহিমুদ্দী অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা করেছে। মাতব্বরের গাভীটি খোঁয়াড়ে দিয়েছে। ফলে হাকিমুদ্দী তার এই জাতীয় কাজকে মনের দিক থেকে সমর্থন করতে পারেনি এবং প্রত্যক্ষে রহিমুদ্দীকে সে শাসিয়ে গেছে। 'আচ্ছারে দ্যাখা যাইবে—'। নাট্য ঘটনার অগ্রগমনের ফলে কার্যত হয়েছেও তাই। হাকিমুদ্দি মাতব্বর প্রজাপীড়ক চরিত্র। তাই তাকে নিয়ে রহিমুদ্দিন যখন শ্লোক কিংবা গান বাঁধে তাতে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির বিরোধের আভাস পাওয়া যায়। তবে উল্লেখ্য যে রহিমুদ্দী যে ছড়া বেঁধেছে তা কিন্তু হাকিমুদ্দীর প্রতি তার কেবল নিজস্ব কোন ক্রোধ চরিতার্থ করার

উদ্দেশ্যে নয়; সেই ছড়ার বৃহত্তর অর্থে শোষিত জনগণের দিককেই প্রকারান্তরে ব্যঞ্জিত করেছে। ব্যক্তিগত ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য রহিমুদ্দির ক্ষতিসাধন করতে চেয়েছে হাকিমুদ্দি। এ সত্য বারংবার নাটকে প্রকাশিত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যেও এর প্রমাণ মেলে। গীদাল গোবিন্দ বলেছে 'হাকিমুদ্দী কিন্তুক তোর পাছে লাগিয়ায় আছে রে।' প্রত্যুত্তরে রহিমুদ্দির ছোট সংলাপটি প্রণিধানযোগ্য-'থাকে না ক্যানে। মোর এও কইরবে'- এসব ক্ষেত্রেই ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির সংঘর্ষের চিত্র।

হাকিমুদ্দিন অত্যাচার-শোষণের ইতিহাস প্রকারান্তরে জনগনকে সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছে। রহিমুদ্দির গানে মাতব্বরের চালচিত্র অতি বাস্তবতার সঙ্গে প্রতিফলিত হতে দেখে গীদাল গোবিন্দ যা বলেছিল তা অত্যাচারিতের জমে থাকা দীর্ঘ নিঃশ্বাসেরই প্রকাশ। 'বড়য় হক কথা কছিস ভাইরে। আখেরী বিচারের আশা ধরিয়া দুঃখীর দল বাঁচি আছে। মন কয়, আইজ হউক, কাইল হউক বিচার হইবে!' এই আত্মপ্রত্যয়ের পথ ধরেই চিরদিন দুঃখী মানুষের দল পথ চলে, দিন অতিবাহিত করে ভবিষ্যতের নতুন প্রভাতের জন্য। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে গোবিন্দ তার দিব্য দৃষ্টিকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। এই দৃশ্যেই আমরা মন্বন্তরের সংবাদ পেয়েছি। এখানেই তিস্তা ঘাটের চুরির ঘটনায় রহিমুদ্দীকে মিথ্যাচালে জড়িয়ে ফেলার কথা জেনেছি। এছাড়া হাতেগোনা কয়েকটি বড়লোকের কথা প্রসঙ্গে এবং অত্যাচারিতের শোষনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংঘবদ্ধ করার কথা শোনা যায় রহিমুদ্দির কন্ঠে। 'সব গরীব যদি একণ্ঠে হয় মাইরবার বার পারবে?' এই সংলাপ কিন্তু ব্যক্তি বনাম শ্রেণীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে, তার প্রতিরোধ শক্তিকেই ব্যঞ্জিত করেছে। কিন্তু হাকিমুদ্দির চালে মিথ্যা চুরির দায়ে রহিমুদ্দির ঘাড়ে এসে পড়ায় উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। একসময় ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে হাকিমুদ্দিন উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। এই অংশে প্রত্যক্ষ বিরোধের প্রকাশ হলো বটে; কিন্তু তা ব্যক্তিকেন্দ্রিকই থেকে গেল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিরোধের আভায় হয়তো তদন্তকারী পুলিশ অফিসার পর্যন্তও অনুভব করে দিতে পেরেছে, 'দ্যাওয়ানি'র কোনও আখেজ আছে নাকি তোমার উপর।'

হাকিমুদ্দি মাতব্বর, তাই সে ক্ষমতাবান বিরুদ্ধ পক্ষ। তার যাবতীয় অপকর্মের সাকরেদ প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট ব্যতীত এই জাতীয় চরিত্রের হিসেবে কানাফকিরও কিছুটা সাহায্য করেছে। সে কারণে নাটকে তার অত্যাচারের মাত্রা খুব ব্যাপকতা লাভ করেনি। অন্যদিকে শোষিত সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের মধ্য থেকেও কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সে দিক থেকে নাটক জমাটি সংঘর্ষ লক্ষ্য করার উপায় নেই। ব্যক্তিক্রোধ চরিতার্থ করতে গিয়ে কুদরতের মুখে মন্বন্তরের দিনে রহিমুদ্দির রোগভোগের পর তার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে হাকিমুদ্দী প্রকারান্তরে আনন্দই পেয়েছে। আর নিজের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে সে বলেছে ‘মোর সাথে লাগার ফল’।- এই দৃশ্যের পরের ঘটনা, লোক লাগিয়ে অভুক্ত মানুষদের ক্ষিপ্ত করে দেওয়া। কিংবা মন্বন্তরের দিনে ধান করজের নাম করে পরের বছর বেশি ধান প্রাপ্তির আশা এবং প্রজা শোষনের যে কথার পরিচয় আমরা পাই- তা কিন্তু আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক থাকে না। তা হয়ে পড়েছে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের কৃষক জীবনেরই শোষনের প্রতিচ্ছবি। সমবেত হয়েছে জনগণ। মাতব্বরের বাড়িতে দরবার করেছে। মামুদ শ্রীমন্ত এরা সবাই ধানের দাবিতে এসেছে। কিন্তু মাতব্বরের সঙ্গে এদের কথোপকথনে ব্যক্তি দ্বন্দ্বের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর শ্রেণি সংঘাতের ইঙ্গিত আভাসিত হয়েছে। তা দ্বন্দ্বের আভাসমাত্র বলেই মনে হয়েছে। হাকিমুদ্দির ধানের গোলা লুট করার কথায় শোষক শোষিতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথায় প্রকাশিত হয়ে পড়ে। একসময় রহিমুদ্দীকে চুরির দায়ে ফাঁসানোর কাজে সাহায্য করেছিল সেই কুকরা। সেই কুকরার অভুক্ত পিতা সাহায্যের কাতর আবেদন নিয়ে এসেছে মাতব্বরের কাছে। কূটকৌশলী মাতব্বর কুকরার বাবা শিয়ালুকে সেই টাকা না দিতে চেয়ে কার্যত সে গরীবকে শোষণের প্রমাণই রাখে। অব্যর্থ ভাবে শোষকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে শিয়ালু। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাবার অব্যবহিত পূর্বে সে বলে গেল চলি যাইতেছি। তোমার মতো শয়তান মানুষের শয়তানি থাকিয়া মাইনষের যত শ্বাস আর যত চৌখের পানি পড়ে তার হিসাব যদি না হয় ত’ দুনিয়া থাকি খোদার নাম উঠি যাইবে- খোদার নাম উঠি যাইবে-।’ এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির শোষন নয় গোষ্ঠী শোষণের দিকটিরও পরিচয় মেলে। খোদার বিধান হিসেবে অভুক্ত শিয়ালু যেভাবে অত্যাচারিতের মুখোশ

খুলে দিয়ে প্রত্যাশার আলোকে উসকিয়ে গেল সেই আশাকে রহিমুদ্দিন জীবন দিয়ে সেই বিধানকেই কিছুটা তরান্বিত করে যাবে- এর প্রমাণ পাওয়া যাবে নাটকের অন্তিম দৃশ্যে। ব্যক্তিগত বিরোধের সময় রহিমুদ্দির পাশে ছিল গোবিন্দ শ্রীমন্তরা। কিন্তু মন্বন্তর যখন প্রকট হল তখন এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ভিনগ্রামের বাসিন্দা- দশলিয়ার, সরেমাবাদ,শালপাড়ার তমিজ কিংবা সাহানাৎ। কার্যত তারাও দাবি করেছে খাদ্যের। এরাও হাকিমুদ্দির উপর ক্রুদ্ধ নাটকে প্রকৃতপক্ষে দ্বন্দ্বের সীমানা বেশ অনেকটাই প্রসারিত হতে পেরেছে।

নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যের বিষয় বিন্যাস মন্বন্তর কেন্দ্রিক। ব্যক্তি রহিমুদ্দীর প্রসঙ্গ এনে দিয়েছে হাকিমুদ্দীর চরিত্রের শোষনের দিকটিকে। আর মন্বন্তর মানুষকে বাধ্য করেছে মানুষ বিক্রিতে। গৃহপালিত পশু বিক্রিতে এগিয়ে যেতে। এই সবই কার্যত মন্বন্তরের আনিবার্য প্রতিক্রিয়া। এরূপ পরিস্থিতিতে অভুক্ত মানুষেরাও দেশান্তরি হয়ে গ্রাম ছেড়ে জাবার বাসনা প্রকাশ করে। শিক্ষিত যুবক রহিমুদ্দী শহরে ও ভিক্ষুকের মিছিলের কথা খবরের কাগজ মারফৎ জেনে অন্যান্য দেরকে সে বিষয়ে সচেতন করে। ইত্যবসরে শ্রীমন্ত জানায় এই বিষয়ে বুদ্ধিমান রহিমুদ্দী সঠিক পথে নিশানা দিতে পারবে। কলকাতায় ভুখা মানুষেরা কেন ধনীর গৃহে লুঠতরাজ চালায় না- এই কথায় ভাবায় মামুদ শ্রীমন্ত দেরকে। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তারা একাজ করছে না। এই মুহূর্তে সবার প্রকারান্তরে রহিমুদ্দীই অভুক্ত অত্যাচারিত সংগ্রামী মানুষের নেতৃত্ব দানের কাজে এগিয়ে আসে। সেই হয়ে ওঠে এদের প্রতিনিধি। 'মুই হুকুম দিলে তোরা লুঠ করবু কিনা? প্রত্যক্ষে নেতারই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে শোনা যায় এখানে। তারই আদেশ কিংবা হুকুমের প্রত্যাশা করে গোবিন্দ শ্রীমন্ত তমিজ সরেমামুদেরা।' মোর মতন মানুষ একটাও কী নাই ওই উপাসী গুলার দলে? এমন প্রশ্নই শ্রেনি চরিত্রের প্রতিনিধি রূপে নাটকে আরেকবার প্রতিষ্ঠা দেয় তাকে। নাটকে ব্যাপ্তি দ্বন্দ্বের সীমা প্রসারিত হয়ে গ্রাম থেকে ভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। বিপদের দিনে সব্বাই রহিমুদ্দীর দিকে চেয়ে বসে আছে। কিন্তু একটা উপায় সে দেবেই। অভুক্ত মানুষ কিছুটা হলেও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে হাকিমুদ্দীর উপর। কারণ তারা হাকিমুদ্দীর থেকে কোনো রকম সাহায্য পায়নি

তাদের বিপদের দিনে। মামুদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদের সুর। 'আর ত চুপ করে থাকা যায় না হে।'- কেনই বা এই সব ভূমিপুত্রেরা আকাল মন্বন্তরের শিকার হবে, আর কেনই বা 'বন্দরিয়া মানুষ গুলা' মন্বন্তরের কবলে পড়েনা- এমন মনোভাব থেকে জেগেছে সমাজ পরিবর্তন করে দেবার ডাক। তাই কিছুটা শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করে মামুদ। দৃঢ়তার প্রকাশ পায় তার বক্তব্যেও। মন্বন্তরেও কবলে পড়ে হয়তো তাদেরই প্রাণপাত ঘটবে এমন আশঙ্কার কথা শুনে স্পষ্টত প্রতিবাদ করে ওঠে মামুদ। মামুদ, রহিমুদ্দি, শ্রীমন্ত, গোবিন্দ- এরা ভিন গ্রামের মানুষ; তবুও এরা শ্রেণি সচেতন হয়েছে। এরা অত্যাচারিতের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই এরা সংঘবদ্ধ চেতনায় দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়েছে। স্পষ্টত প্রতিবাদের প্রতিরোধের কথা বলে মামুদ। 'এমনি যামো নাকি'? যদি যাওয়ার লাগে তো সারা মুল্লুকে আগুন জ্বালাইয়া দিয়া যামো। সব মানুষ তোমারার জন্য বসি আছে। সমাজ ব্যবস্থার মুল কেন্দ্রে যারা শোষনের রাজসিংহাসনে বসে আছে-তাদের বিরুদ্ধে বিষগোদগার করে সরেমামুদ ও তমিজ সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠে 'হবার নয়! তামাম মুল্লুকের মানুষ জোটামো' এভাবেই নাটকে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে শোশক- ব্যক্তি বনাম শোষিত জনগনের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের এবং আধিদৈবিক ঘটনা মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে শোষিতের গণচেতনার কিংবা গণঅভ্যুত্থানের পারম্ভিক আভাস দেওয়া হয়েছে নাটকে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আবার ব্যক্তিদ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। লঙ্গরখানা থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে এসেছে বসির ও ফুলজান। এখানে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তি সংঘাতই মুখ্য। অসহায় পিতা, অক্ষম স্বামী, যুগপৎ ভাবনায় রহিমুদ্দী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এবং উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে একসময় ফুলজানকে তালাক দিয়ে দেয় সে। হাকিমুদ্দির বাড়িতে স্থান হয় ফুলজানের। হাদীজের নামে মুসলিম মৌলবাদকেই প্রশ্রয় দেয় হাকিমুদ্দি। কার্যত রহিমুদ্দির আচরণে ক্ষুব্ধ সমবেত সকলেই। তারা সবাই চায় রহিমিদ্দি ফুলজানের সংসারকে পূর্বের মতো জোড়া লাগাতে। জনগণ হাকিমুদ্দির কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। হাদিজ ও নিকার বাধার প্রসঙ্গ নিয়ে হাকিমুদ্দির-

মানুষকে প্রতারণার কৌশল সেখানেও ছিল। নিকার জন্য যেমন কানা ফকিরের সাহায্য প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ইমাম। হাকিমুদ্দির ভয়ে রহিমুদ্দির গ্রামের জুম্মার ইমাম নিকার কাজে এগোতে চায়। সেই ইমামটাই অন্য ইমামকে ঠিক করে দিয়েছে। এইসময় রহিমুদ্দির অসহায় অসুস্থ শিশুর ক্রন্দন অধীর করে তোলে সম্মিলিত জনগণকে। অসহায় মানুষের পাশে প্রতিশোধের স্পৃহা বুকে নিয়ে আগুয়ান হয় জনতা। হাদিজের নামে মৌলবাদী শাসক হাকিমুদ্দিন বিরুদ্ধে জনগণ এককাট্টা হয়েছে। তাদের অন্তরে হাকিমুদ্দির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত ছিল মন্বন্তরের দিনগুলি থেকেই। হাকিমুদ্দির অত্যাচারে মন্বন্তরের দিনে সবাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। তার প্রমাণ ধানের গোলা লুটের প্রসঙ্গ। স্মরণীয় দ্বিতীয় অঙ্ক/ দ্বিতীয় দৃশ্য কানা ফকিরের দর-কষাকষি এবং ফুলজান সম্পর্কে অশ্লীল ইঙ্গিতে ধৈর্য চ্যুতি ঘটে জায় রহিমুদ্দির। সে চলে যায় ফুলজানকে নিয়ে আসতে। বাধ সাধতে চায় হাকিমুদ্দিদ। জনগণ পিছু নেয়। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তাদের কণ্ঠে। ‘আটকাবার চাইলে ডাঙ্গাও শালাক’- সকলের কণ্ঠেই শোনা যায়। অত্যাচারী শাসকের শাস্তির আয়োজনে কণ্টকিত হয়ে ওঠে নাটকের শেষ দৃশ্য। এসবই গণনাট্য-নবনাট্য আন্দোলনের প্রভাব সঞ্জাত। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গর্জে ওঠে নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান জনগণ। কেবল ধর্মের জেহাদী রূপের জন্য নয়; সামাজিক শোষণের দিকটি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। ‘খবরদার! দ্যাওয়ানীগিরি চলিবার নয়। জুলুম করি করি আস্পর্ধা বাড়ি গেইছে’ এই তথ্য একজন কোনো বিশেষ চরিত্র প্রকাশ করেনি। হিন্দু মুসলমানের মিলিত কণ্ঠস্বর এটি। এসবই সংবদ্ধ চেতনার বাহ্যিক প্রকাশ। তারা হাকিমুদ্দির ঔদ্ধত্য স্বীকার করতে পারেনি। নাট্যকার একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, ‘উপস্থিত জনতার রুদ্রমূর্তি দেখে হাকিমুদ্দি পিছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই...’। সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তির রুদ্রমূর্তিকে দেখে সকল প্রশাসকই ভয় পায় এক সময়। এখানেও তার ব্যত্যয় হয়নি। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমবেতভাবে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে। সমবেত কণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় হাকিমুদ্দির বিরুদ্ধেঃ ‘আটকি দ্যাখো ফুলজানকে।কাল্লা ছাঁটি দ্যাওয়া হইবে’ এর কিছু পরে কানা ফকিরের মন্তব্য- ‘আইজ উয়ার মৌত হইবে’ নাটকের অন্তিম দৃশ্য

এরই অনুগামী। এর পূর্বে আমরা হাকিমুদ্দির উপর আক্রমণের তথ্য পেয়েছি কানাফকিরের কাছ থেকে।

শোষণের এবং অত্যাচারের শেষ ধাপে উপনীত হয়েছে বৃহত্তর অর্থে গ্রাম্য জনগণ এবং অন্যদিকে রহিমুদ্দির পরিবার। শোষণের দিক থেকে এরা একীভূত। তাই গোবিন্দ বলেছে 'আর শুনাশুনি নাই। তোর দ্যাওয়ানী গিরির শয়তানি আইজে শ্যাষ।' কিংবা সরেমামুদ যখন বলে, 'ওহোঃ দ্যাওয়ানির কোনয় দোষ নাই। খালি গুন। মানুষের সর্বনাশ করি ফায়দা করার কতই না কায়দা আছে তুমার'। তখন তা কৃষক চাষী শোষণের মাত্রাকেই ব্যঞ্জিত করে। এর পরের গোবিন্দের সংলাপ হাতির স্বার্থান্বেষী চরিত্র এবং মানুষ শোষনের বহুমাত্রিককে প্রকাশ করে। 'শও শও কায়দা আছে। টাকার কায়দা, হাকিম ত্যালেয়া দেওয়ানি হবার কায়দা, উপকারের নাম করি মানুষের জান মারার কায়দা, হিসেব দ্যাখেয়া চুরি করার কায়দা, তসবী ঘুরেয়া সরল মানুষ ঠকাবার কায়দা। আইন গাইন হদিজ কোরান-' এ কেবল ব্যক্তি রহিমুদ্দিকে শোষনের নিদর্শন নয়, প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের কৃষক শোষণের দিকটি এখানে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। প্রত্যেক শুরুর যেমন শেষ থাকেই- তেমনি তার প্রতিরোধে উন্মুখ। প্রতিবাদে গর্জে ওঠা জনগণের কাছে হাকিমুদ্দির সেই সমাপ্তির ব্যঞ্জনা দিয়ে নাটকের যবনিকা নেমে এসেছে। সেকারণে সরেমামুদের 'আইজ তোর মৌৎ হইবে।' এই সংলাপের পর গোবিন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, 'তোরে জিৎ হইবে নাকি- শয়তান?'

সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের বেপরোয়া মানসপ্রতীতি প্রকাশিত হয়েছে এই সংলাপে। যা প্রকারান্তরে জনগণের প্রতিবাদী মানসিকতাকেই ব্যঞ্জিত করে।

শ্রীমন্ত। আর যদি দ্যাওয়ানীও বাধা দিবার চাই ত' উয়াকে ভাঙাইয়া থেৎথেড়া করা হইবে।

সরে। ডাং দ্যাওয়ায় লাগে কিন্তুক—

শ্রীমন্ত। কোন কিন্তুক নাই। এ-গাঁও ও-গাঁও সে-গাঁও থাকি সব আসি গেল বলিয়া। গোবিন্দর খুলিৎ আসি সব জমায়েৎ হইবে। মামুদ, তমিজ, দিনায়াৎ, শাহানাৎ, ঢ্যাঙা ছমের-গাঁটিয়া জয়েন, দাঁতাল কুদ্দুস, তোতলা হানিফ, টাকুয়া বনিজ এই অংশে হিন্দু-

মুসলমান তথা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের শোষিত জনগনের সংঘবদ্ধ হবার দিক বৃহত্তর প্রতিরোধের বানী বাহক। নাট্যকারের কৃতিত্বের গুণে এ নাটকে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুশাসন এবং আধিদৈবিক ঘটনা মন্বন্তরকে সমীকৃত করে দিতে পেরেছেন। তারই প্রভাবে নবতর এবং বৃহত্তর ডাইমেনশনের ছোঁয়া উপলব্ধ হয়। দুর্ভিক্ষ এবং হাদিজের বিধান দুই-ই পরোক্ষে মানবসৃষ্ট। সেই কারণে-

নাটকে প্রাথমিকভাবে ব্যাক্তি রহিমুদ্দীর পরাজয় এবং পরাভব হলেও নাটকের শেষ দৃশ্যে সম্মিলিত হিন্দু মুসলমান জগতের কাছে হাকিমুদ্দীর অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় কার্যত গণনাট্য- নবনাট্য আন্দোলন ধারারই পদধ্বনি শোনা যায়। শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সম্মিলীত হওয়া এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এগিয়ে শাস্তিদান এবং মৃত্যু (এখানে অবশ্য নাট্যকার মাতব্বরের মৃত্যু বিষয়ে একটি প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়ছেন) দৃশ্যের অবতারণা গণনাট্যের গঠনতন্ত্র মেনেই এগিয়েছে। সর্বাংশে এটিকে প্রতিরোধ প্রতিবাদের সফল নাটক না বললেও এটি কিন্তু শাসক শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে তাদেরকে সতর্ক করে দেবার মত নাটক। গণ চরিত্রে প্রতিরোধীরূপ এক বৃহৎ সম্ভাবনার দিক তুলে ধরে এ নাটক।

১১.৩ ছেঁড়া তার নাটকের নামকরণ

সাহিত্যে নামকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে গল্প-উপন্যাস কিংবা নাটক সে যাইহোক না কেন সাহিত্যিকগণ সচেতন ভাবেই নামকরণ করে থাকেন। নামকরণ কখনো কখনো বিষয়গন্ধী আবার কখনও কখনও প্রধান চরিত্র অনুসারীও হয়। মোটকথা, নামকরণের শিল্পী সাহিত্যিকগণ ব্যঞ্জনাধর্মীতাকেই বেশি পছন্দ করে থাকেন। ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রে তুলসীদাস লাহিড়ী নাট্য নামকে বহুধাব্যঞ্জিত এবং দেশ তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। নাট্যবিষয়ের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সে সত্য উদঘাটিত হবে। ‘ছেঁড়া তার’ এই নামকরণের আক্ষরিক অর্থ হলো ‘ছিন্ন তার’। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে একটি দিলরুবা বাদ্যযন্তর উল্লেখ রয়েছে। মন্বন্তর এবং ধর্মীয় বিধান যুগপদ বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্যঘটনা বর্ণিত হলেও, মূলত একটি চরিত্রের

হৃদয় নিয়ে নাট্যকার বেশকিছু ঘটনার উপস্থিত করেছেন- সেই দিকটির প্রতি দর্শক পাঠকের সহানুভূতি, সমবেদনা উদ্রেক করতে চেয়েছেন 'নামকরণ'কে দিয়ে। নায়ক রহিমুদ্দির হৃদয় বার বার বাইরের প্রতিকূল বিরুদ্ধ শক্তির আকস্মিক আঘাতে বিদীর্ণ হয়েছে। সেই দিকের বিচারে 'ছেঁড়া তার' নামকরণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য সফল। মহিমবাবুর মেয়ে মায়ার কণ্ঠের আধুনিক গানের কথার মধ্য দিয়ে 'ভুলের ফুলে' সাজি ভরার এবং 'না হয় এবার এল পালা ধূলায় লুটাবার'- কথা। গানের 'ভুল' শব্দটি নায়ক রহিমুদ্দির স্বকৃত ভুলকেই প্রকারান্তরে ধ্বনিত করেছে। তালাকদান প্রসঙ্গ এবং সেই ভুলের অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল হাকিমুদ্দীর বাড়িতে বাঁদী হয়ে ফুলজানকে অবস্থিতি। কিন্তু পুনরায় ধর্মীয় সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ফুলজান রহিমুদ্দির ঘরে সহজে আসতে চাইনি। দীর্ঘদিন ধূলো জমে থাকা দিলরুবাটির তারে উন্মত্তের মতো শক্তি প্রয়োগ করার ফলেই তারগুলি ছিঁড়ে যায় এবং একসময় ঘরে দৌড়ে প্রবেশ করে রহিমুদ্দী দরযায় খিল দেয়। এর পরের ঘটনায় আমরা দেখি তার নিথর নধর। আত্মহত্যা। এই দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে ধূলায় লুটাবার শব্দ দুটির প্রয়োগে। নামকরণের ক্ষেত্রে নাট্য সূচনায় এভাবেই নাট্যনামকে ব্যঞ্জিত করেছেন তুলসবাবু। এছাড়া গানের মধ্যে মায়ার খোঁপার উপর ভাই ভবেশের কৌতুকমিশ্রিত আক্রমণ এবং খোপা ভেঙে যাওয়া-ইত্যাদি প্রকারান্তরে রহিমুদ্দির দাম্পত্য জীবন এবং সংসার ভগ্নস্তূপে রূপান্তরেরই অভ্রান্ত ইঙ্গিতবাহী। নাট্য-নাম 'ছেঁড়া তার' সার্থক প্রতিপন্ন হবার এটিই প্রথম ধাপ।

বুদ্ধিমান, চৌখুসে, সংগীতপ্রিয় রহিমুদ্দি ছাত্রাবস্থায় বেশিদূর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেনি মূলত অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে। অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু মহিম্বাবু স্মৃতির সরণি থেকে অতীত দিনগুলি খুঁড়েখুঁড়ে বের করে আনেন নাটকের প্রথম দৃশ্যে। কিছুটা হলেও অতীতের দিনগুলির কথা মনে করে দুই বাল্যবন্ধুই একসময় নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। পারিবারিক, অর্থনৈতিক অবস্থার কথা শুনেছেন মহিমবাবু। তবু তিনি এক আনন্দময় মধুর জগতে রহিমুদ্দির জীবন যাপন করার আহ্বান জানান। হৃদয়ের সব সময় ফুর্তি এবং অফুরান আনন্দধারা ধরে রাখার কথা বলেন; কিন্তু রহিমুদ্দির মত সামান্য কৃষিজীবী মানুষের পক্ষে তা কি সম্ভব- এ প্রশ্ন আমাদের ভাবিত

করে। বিভিন্ন সমস্যায় ঘেরা রহিমুদ্দির দাম্পত্যজীবন। তাই হাকিমুদ্দির শোষন চির শত্রুতার ভাব। সেকারণে রহিমুদ্দির স্পষ্ট জবাব- 'সুখ কি চাইলেই পাওয়া যায়?' নাট্য ঘটনার বিন্যাসের সঙ্গে পরিচয়ের পরে আমরা জানতে পারি রহিমুদ্দির সংসার জীবনে লেগেছিল দুষ্ট গ্রহের দৃষ্টি। সেকারণে এ জীবনে রহিমুদ্দির আনন্দময় জগতের বাসিন্দা হতে পারেনি; অথচ তার চেষ্টার কোন অভাব ছিল না, যেন সে নিয়তির অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে চলেছে। সেইদিকের বিচারে নামকরন সার্থক। মহিমবাবুর সঙ্গে গানে কণ্ঠ মেলাতে হয়তো সেকারণেই সে দ্বিধান্বিত হয়েছিল। সুন্দর অতীতকে বর্তমানের সরকারি চাকুরিজীবী মহিমবাবু খুঁজে পেলেও রহিমুদ্দির বেসুরো কণ্ঠ তার সন্ধান পায়নি। এইভাবে হৃদয়গত পরিস্থিতির বিচারেও নাট্যনাম সার্থক প্রতিপন্ন হয়। এই নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্য নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে একটি গভীর সংকেতবাহী সূত্রের সন্ধান মেলে। শহর থেকে স্ত্রী ফুলজানের জন্য high heel নতুন জুতো, শাড়ি এবং পুত্র বসিরের জন্য ভালো প্যান্ট ও শার্ট নিয়ে এসেছে রহিমুদ্দি। আপত্তিভাবে এসবই জীবনব্যাপী ঘন তমসার মধ্যে সামান্য আলোর সন্ধান মাত্র কিংবা হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ফুলজান সেই জুতো পড়ে ঠিক হাঁটতে চলতে পারছে না- অনভ্যস্ততার কারনে। ভয় ভীতির কারণে নতুন জুতো পড়ে হাঁটছে ফুলজান; সেকারণে এই ছন্দপতন এমন দাবি করে রহিমুদ্দি। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রায় বহমান ধারায় বিশ্বাসী রহিমুদ্দি।তাই স্ত্রীকে বলে 'মোর সাথে চলায় লাইগবে তোর।'- কিন্তু দর্শক পাঠক হিসেবে আমরা জানি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের নিদান কে বিসর্জন দিয়ে আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় রাখতে পারেনি ফুলজান। স্বাভাবিক কারণে আধুনিক মনের অধিকারী রহিমুদ্দির ও ফুলজানের দাম্পত্যজীবনের সহজ স্বাভাবিক জীবন ছন্দ অচিরেই কেটে গেছে। দাম্পত্যজীবনের সহজ স্বাভাবিকতা রক্ষিত হবে না- বাইরের বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে। সেকারণে চাটাই বিছিয়ে সাধের দিলরুবায় টুং-টাং করে সুর বাঁধতে গিয়েও রহিমুদ্দি সফল হয়নি। আর এই আপাত স্নিগ্ধ দৃশ্যের মধ্যে ঝড়ের বেগে নিয়ে আসে গোবিন্দ ও শ্রীমন্ত। এদের মুখ থেকেই আমরা জানতে পারি তার বিরুদ্ধে মাতব্বরের শত্রুতা সাধনের কথা। ফলে 'মোর এয়ও কইরবে'-

বললেও তার কাছে রহিমুদ্দির সামূহিক পরাজয়কে আভাসিত করতে 'ছেঁড়া তার' নাট্যনাম সার্থক। সুর বাঁধতে গিয়ে সে সুর আর বাধা হয়নি, তেমনি দিলরুবা নামক বাদ্যযন্ত্রটিও একবারের জন্যও বাজানো হয়নি।

মন্মন্তর কবলিত গ্রাম জীবনের কথা শুনিয়ে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের সূচনা।মন্বন্তরের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়-এর কাছে মানুষ শিশুর মতো একেবারে অসহায়। তার করালগ্রাসে কৃষক হিন্দু-মুসলমানের সাংসারিক জীবনের স্বাভাবিক চলার ক্ষেত্রে আচমকাই ছন্দ পতন ঘটেছে। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে পড়ে গৃহস্থ মানুষ গৃহপালিত পশুকে যেমন বিক্রি করেছে, তেমনি অনেক স্বামী অপরের কাছে নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত বিক্রি করতেও পিছপা হয়নি। সমাজ জীবনের সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করতে নাট্যনাম বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বৈকি!

মন্বন্তর অধ্যুষিত গ্রামজীবনের সর্বত্রই মানুষের দগ্ধ হৃদয়ের এই দগদগে ছাপ। এক অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে সমগ্র গ্রাম্যজীবন। জীবনধারণের তাগিদে তারা সংঘবদ্ধ হতে চায়। আবার সরকারের কাছে তারা আর্জি জানাতে চায় লঙ্গরখানা খোলার জন্য। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় বিশ্বের সূচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি শূন্য দৃষ্টিনিবন্ধ করে রহিমুদ্দি কিছু ভাবছে, হয়তো বা মন্বন্তরের ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা ভাবছে। এরই মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে তুলে রাখা দিলরুবাটি বের করে নিয়ে আসে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। আনমনে হয়তো এই বাদ্যযন্ত্রে টুং-টাং সুরে কোন গান বাঁধবার কথা সে ভাবছিল। হয়তো বা আসমান জমিন বিভিন্ন কথা চিন্তা তাকে গ্রাস করেছিল। শ্রীমন্ত এসে কাজকর্মের কোন সন্ধান করতে পেরেছে কিনা জানতে চায় তার কাছে। ধুলো জমে থাকা যন্ত্রটি দীর্ঘদিন ধরে বাজানো হয়নি। সেই রকমই অবহেলায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু বাল্যবন্ধু মহিমের কোন এক সময়ের বলা কথা তার চেতনায় আঘাত করে, মনে পড়ে মহিমের কথা 'মানুষের জানটাও বাজাটারে মত। ভালো করি বাজাইলে কত সুর ওঠে।' নিজের স্ত্রী ফুলজানের জীবনটাকে সে ভালো করে সাজাতে-গোছাতে চেয়েছিল; কার্যত তার সে চেষ্টাও বিফল হয়েছে। এই অংশে মানবজীবন এবং বাদ্যযন্ত্র দিলরুবাকে ভিন্ন করে দেখায় বাধা থাকে। নায়ক রহিমুদ্দির হৃদয় এবং তার

শখের বাদ্যযন্ত্রটি এখানে অভিন্ন। মন্মন্তরের সময় হাকিমুদ্দির কূট-কৌশলে লঙ্গরখানা স্থাপিত হয়েছে তারই ঘরে। মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হাকিমুদ্দির বাড়িতে যেতে চায়না রহিমুদ্দি। আর স্বামী হিসাবে সে ফুলজানকে সেখানে যেতে বারণ করেছে। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে এবং অভুক্ত বসিরের কথা ভেবে ফুলজান নিজেই মাতব্বরের মায়ের কাছে সাহায্যের জন্য যাবার কথা বলে। এতে রহিমুদ্দির আত্মসম্মানে লাগে। ফলে মতান্তর সৃষ্টি হয়- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এছাড়া বিফল মনোরথ হয়ে ফুলজানের ফুফার বাড়ি থেকে বসিরের এবং ফুলজানের ফিরে আসা এবং অনন্যোপায় মায়ের মত মাতব্বরের বাড়িতে যেতে চাওয়া-এই দুই ঘটনার আকস্মিক অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে রহিমুদ্দি। সঙ্গীত রসিক বন্ধু মহিমবাবুর কিনে দেওয়া দিলরুবা যন্ত্রটিকে একসময় শহরে গিয়ে বিক্রি করে দেবার কথা ভাবে। এইখানে ব্যক্তি রহিমুদ্দির থেকে তার সাধের বাদ্যযন্ত্রটিকে প্রকারান্তরে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সিদ্ধান্ত জানান নাট্যকার। সাধের দিলরুবা বিক্রির প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে আত্মবিচ্ছেদের ভাবনা, তেমনি এই বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে বিক্রির প্রস্তাব জীবনসঙ্গিনী ফুলজানের সঙ্গে আশু বিচ্ছেদ দৃশ্যকেই অভ্রান্ত অঙ্গুলি সংকেত করে। দিলরুবা বিক্রি করে টাকা সংগ্রহে যেমন তার পরাজয়, তেমনি ঠিক অব্যবহিত পরে স্ত্রীর কাছে প্রকারান্তরে হার মেনে লঙ্গরখানায় পাঠানোয় পাওয়া যায় তার পরাজয়েরই ইঙ্গিত। শ্রেয় প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় রহিমুদ্দি। লঙ্গরখানা প্রত্যাগত ফুলজানকে তালাকনামা লিখে সেই কাগজ তুলে দেওয়ায় স্ত্রী-বিচ্ছেদের প্রতীকে ব্যঞ্জিত হয় বাদ্যযন্ত্রটির বিক্রির প্রস্তাব। কার্যত সেই মুহূর্তে বাদ্যযন্ত্রটির স্থান রহিমুদ্দির বাড়ির অন্দরমহলে হলেও, এবার কিন্তু স্ত্রী ফুলজানের স্থান রহিমুদ্দির ঘরে আর হবে না এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ ফুলজান এর একটি সংলাপ। 'ঘর আর মোর ত' নয়।'-এই দৃশ্যের উপস্থাপনা নাট্যনামের প্রয়োগ কৌশলের সার্থকতাকেই তুলে ধরে।

শহরবাসের পর তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্য নাট্য ঘটনার মূল কেন্দ্রে আবার উঠে এসেছে রহিমুদ্দির আঙিনা। এই দৃশ্যই কার্যত নাট্যঘটনার climax. রহিমুদ্দির সৌখিন দিলরুবাটি ক্রয়ের পর থেকে কোন এক দৃশ্যে একবারের জন্য বাজানো হয় না, মূলত

বাহ্যিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। কাল এক আধবার যন্ত্রটিকে বের করে এনে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা কিংবা সামান্য সুর সাধবার দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। একসময় দিলরুবাটি বিক্রয়ের প্রস্তাব এসেছে, বিক্রি করা হয়- সেও এক পরিপ্রেক্ষিতে। তারপর নাট্য ঘটনা রহিমুদ্দির অনুসরণে শহরের দৃশ্যে প্রবেশ করেছে (তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য)। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম এবং দ্বিতীয় দৃশ্য জুড়ে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে- সেই সময় কিন্তু দিলরুবাটি গৃহবন্দি হয়ে অযত্নে, অতি অবহেলায় পড়েছিল জনমানবহীন রহিমুদ্দির ঘরে। ফলে বাদ্যযন্ত্রটির কোনরকম ক্ষতির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশেষে কাঙ্খিত সেই মহেন্দ্র একসময় এসে পৌঁছায় নাট্য ঘটনায়। যেখানে একসময় বাদ্যযন্ত্রটির অক্ষত দশা মুহূর্তে অবলুপ্ত হয়ে জায়। তীব্র মানসিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে দিলরুবার কানে মোচড় দিতে দিতে হঠাৎ একসময় তার ছিঁড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে নায়কের ক্রন্দন ধ্বনি আমাদের কর্ণগোচর হয়। যে যন্ত্রটি মানুষের জীবনের মতই; যে যন্ত্রে ভালো করে সুর বাধলে, যত্ন করে বাজালে নানান সুরের উৎসার ঘটে- সাধের সেই যন্ত্রটিকে নানান চেষ্টায় একবারের জন্যও বাজাতে পারেনি রহিমুদ্দিন। অথচ সে বেসুরো লোক ছিল এমন নয়। গানও যে ভালবাসে সে গানও করে দিলরুবা যার প্রাণের দোসর সেই যন্ত্রের তার ছিঁড়ে যাওয়া মাত্রই নায়কের রহিমুদ্দির জীবনদীপটি আচমকাই নির্বাচনের ইঙ্গিত প্রদান করে। সেকারণে নাটকের শেষ দৃশ্য যেমন প্রতীকী তেমনি নাট্যনামও গভীর ব্যঞ্জনার দ্যোতনা এনে দেয়। নাট্যঘটনার অগ্রগমন এবং বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিলরুবারও গুরুত্ব বেড়েছে। যন্ত্রটি রহিমুদ্দির নিজস্ব হৃদয়-মন-জীবন এবং তার দাম্পত্য জীবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। রহিমুদ্দির সঙ্গে জীবন পথে চলার ক্ষেত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল ফুলজানের, সেখানে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্ম বিষয়ে ফুলজানের অলঙ্ঘনীয় সংস্কার। সে কারণে রহিমুদ্দির অন্তর-ধর্মের প্রকটনে আমরা অনুভব করি ফুলজানের হৃদয় মনের সেই সুরের সঙ্গে যেমন সংগতিবিহীন হয়েছে রহিমুদ্দির নিজস্ব হৃদয়ের সুর তেমনি সর্বময় কর্তার উপর একসময় সে আর আস্থা ধরে রাখতে পারেনি পূর্ববৎ। 'মোর

জন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল! আল্লা! ওহোঃ ওহোঃ-হোঃ-।' এই সংলাপই আল্লার প্রতি রহিমুদ্দির আস্থার ছিন্নতার বাণীবহ।'

'ছেঁড়া তার' নাটকের একেবারে শেষে রহিমুদ্দি পারিবারিক জীবনের মেলবন্ধনের যে তারটি ছিড়ে দিয়ে উদ্বোধনে আত্মহত্যার পথে গেল, তারও আগে রহিমুদ্দির জীবনের আরেকটি তার ছিড়ে ছিল- সেটি হল অভুক্ত অবস্থায় তার মায়ের মৃত্যু (দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় দৃশ্য)।মায়ের মৃত্যু প্রসঙ্গটিও নাট্যনামের বিচারের ক্ষেত্রে স্মরণীয়। নামকরণ ব্যাখ্যায় দাম্পত্য জীবনের সীমানার বাইরে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যায়। এবার হাকিমুদ্দির ফ্যাকাসে দাম্পত্য জীবনে ইতিবৃত্তে নামকরণ বিচারে আমরা প্রবেশ করতে পারি। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য-এ আমরা কুকরা মারফৎ জেনেছি হাকিমুদ্দির স্ত্রী ফুলবিবি এবং বড় বিবির কলহের জেরে ফুলবিবি গরুর দড়ি হাতে নিয়ে প্রবেশ করেছে ঝাঁপি ঘরে এবং দরজায় খিল দিয়েছে সে। এই পর্যন্ত বর্ণনা সূত্র ধরে এগোলে মনে হতে পারে যে সেও বুঝি আত্মহত্যা করার জন্য গেছে। হাকিমুদ্দির মনে প্রশ্ন- 'গলায় দড়ি দিলা নাকি?' হাকিমুদ্দির সঙ্গে রহিমুদ্দির শত্রুতার মূলে ছিল রহিমুদ্দির বাগান নষ্ট করে দেওয়া। যে গাভীকে রহিমুদ্দি খোঁয়াড়ে দিয়েছিল, সেই গাভীর গলার দড়ি খুলে ফুলবিবি বিছানা-পত্র বেধেছে চলে যাবার জন্য। হাকিমুদ্দির ক্রূর চক্রান্তের শিকার হিসাবে রহিমুদ্দির মৃত্যুর যে দৃশ্য আমরা লক্ষ্য করি, সেই দৃশ্যের একটি পূর্ব-কাল্পনিক প্রতিভায় লক্ষ্য করা জায় 'গলায় দড়ি দিল নাকি'? প্রসঙ্গের অবতারণায়। কারণ এখানেও হাকিমুদ্দির দাম্পত্য জীবনের তার ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা করেছিল হাকিমুদ্দি। এইদিকের বিচারেও নামকরণ গভীর ব্যঞ্জনা দাবি করে।

মিথ্যা সাজানো মামলায় হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে জড়িয়ে জেলে নিক্ষেপ করার ফন্দি করেছিল। কার্যত তা সফল হয়নি। পরিবর্তে ঘটনাচক্রে জেলে যেতে হয়েছে হাকিমুদ্দিন অপকর্মের সহযোগী কুকরাকে। সেই মামলায় পরাজয় হয়েছিল মাতব্বরেরই। এই প্রথমবার এবং শেষবার ধুরন্ধর হাকিমুদ্দির কূটকৌশলী বুদ্ধির একটি তার ছিন্ন হল বুদ্ধিমান এবং সৎ রহিমুদ্দির জন্যই। নামকরণ ব্যঞ্জনার বিচারে এ প্রসঙ্গ অবশ্যই স্মরণীয়।

সর্বোপরি এবার বৃহত্তর অর্থে নামকরণের সার্থকতার দিকটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা মামুদ এবং তমিজের কণ্ঠে 'তামাম মুল্লুকের মানুষ' জোটানোর সংবাদ পেয়েছিলাম। সেই সংবাদের সত্যতার পরিচয় পেলাম তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্য অর্থাৎ যবনিকাপাতের পূর্বে। এই দৃশ্যে প্রবল প্রতিরোধ-প্রতিবাদের মধ্যে পড়তে হয়েছে হাকিমুদ্দিকে। এখন মাতব্বর হিসেবে তাকে আর কেউ ভয় পায় না। তার শাস্তির আয়োজন স্থির করে ফেলেছে শ্রীমন্ত। নিকায় 'যদি দ্যাওয়ানীও বাধা দিবার চাই ত' উয়াকে ডাঙ্গাইয়া থেৎথেড়া করা'র প্রস্তাব রাখে সে। মাতব্বরের মৌলবাদী নিয়মের প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ করতে চায় তারা। জনতার সঙ্ঘবদ্ধ চেতনার কাছে এই প্রথম বার বাধার সম্মুখীন হয় মাতব্বর। জনতার সাবধান বাণী ছিল এইরকম- 'খবরদার! দ্যাওয়ানী গিরি চলইবার নয়। জুলুম করি করি আস্পর্ধা বারি গেইছে।' জনতার রুদ্রমূর্তি দেখে এই প্রথমবার হাকিমুদ্দি ভয়ে পিছিয়ে যাবার উপক্রম করে। নাট্যকারের মন্তব্য ছিল এইরকমঃ 'জনতার রুদ্রমূর্তি দেখে হাকিমুদ্দি ভয়ে পিছিয়ে যাবার উপক্রম করতেই কানা ফকির ব্যঙ্গ করে... ।' কামুক স্বভাবের হাকিমুদ্দি নারীমাংস লোলুপতার একটি তার ছিন্ন হয়ে গেল এখানে। সে আর অবরুদ্ধ অবস্থায় ফুলজানকে ধরে রাখতে পারবে না। কারণ পরক্ষনেই আমরা দেখি ফুলজানকে জোর পূর্বক নিয়ে আসার জন্য রহিমুদ্দির বেরিয়ে গেছে। মাতব্বর হাদিজ খেলাফের যে মৌলবাদী জিগির তুলেছিল- তাতে তীব্র আঘাত হানল জনতা। ফলে মৌলবাদী শাসনযন্ত্রের একটি তার এভাবেই ছিন্ন হল এই দৃশ্যে। নাট্যনাম-এখানেও মৌলবাদী অতি অমানবিক বিকৃত নিদানের উপর এই ভাবেই আঘাতহানাকে ব্যঞ্জিত করে দেয়।

এবার শোষক-শ্রেণির একচ্ছত্র অধিপতি রূপে হাকিমুদ্দির সমাজ-শোষণের যে বর্ণনা এবং রহিমুদ্দির কুত্তা-শিয়ালের মত হতভাগ্য অনেকের উপর তার যে পরাক্রম-তারই হিসেব-নিকেশে আগুয়ান হয়েছে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ। বিভিন্ন গ্রামের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রসঙ্গটি ব্যাপকতর বিস্তৃতির দিক দিয়ে বিচার করাই বাঞ্ছনীয়। এবার সেই প্রসঙ্গে আমরা প্রবেশ করবো। ফুলজানকে অবরুদ্ধ করে রাখার বিরুদ্ধে জনতার

রুদ্রমূর্তিতে ভীত হবার কথা পূর্বেই বলেছি। তবু পুনরুক্তি দোষ বাঁচিয়ে নিপীড়কের বিরুদ্ধে শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথায় বলবো। স্বার্থান্ধ হাকিমুদ্দিই প্রকারান্তরে রহিমের সামূহিক পতনের জন্য দায়ী- এ সত্য জনগণ জেনেছে। তাই তো গোবিন্দ বলেছে, ‘আর শুনি নাই। তোর দ্যাওয়ানী গিরির শয়তানি আইজে শ্যাষ’। ভালো মানুষটার পাছে পাছে লাগিয়া তুইয়েনা তাক এই কাউটালে ফ্যালাছিস?’ সমবেত হিন্দু-মুসলমান মিলিত শক্তির কাছে আজই হাকিমুদ্দির ‘আখেরি বিচার’। স্মরণীয় প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের গোবিন্দের আরেকটি ব্যঞ্জনাধর্মী সংলাপ। ‘আখেরী বিচারের আশা ধরিয়া দুঃখীর দল বাঁচি আছে। মনে কয়, আইজ হউক, কাইল হউক বিচার হইবে!’ অন্তিম দৃশ্যে সেই বিচারপর্বের সূচনা হয়েছে। আর এখানে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠাত্রী হয়েছে মারমুখী জনগণ। শোষণের যাবতীয় হিসেবে বার বুঝে নিতে তৎপর হয়েছে জনগণ। জনগণ আক্রমণ করেছে হাকিমুদ্দিকে। সে আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা হাকিমুদ্দির নাই। হাকিমুদ্দির উদ্দেশ্য সরেমামুদ বলেছিল, ‘ওহোঃ দ্যাওয়ানীর কোনয় দোষ নাই। খালি গুণ। মানুষের সর্বনাশ করি ফায়দা করার কতইনা কায়দা তোমার।’ হাকিমুদ্দি উত্তরে গোবিন্দের বাক্যবাণ ‘শও শও কায়দা আছে। টাকার কায়দা, হাকিম ত্যালেয়া দ্যাওয়ানী হবার কায়দা’ সংলাপের শেষাংশ রহিমুদ্দির ধ্বংসের প্রতি আলোকপাত করলেও, এই সংলাপের প্রথমাংশ প্রধানত শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথায় বলে। সামগ্রিক শোষিতের প্রতি আলোকপাত করে। সে কারণে নাট্যশেষে অবরুদ্ধ হবার ফলে জনরোষের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পলায়নপর হয়েছে হাকিমুদ্দি। তাকে ধরে রেখেছিল সরেমামুদ। অবশেষে ‘আইজ তোর মৌৎ হইবে’ কিংবা গোবিন্দের সংলাপ ‘তোর জিৎ হইবে নাকি শয়তান?’-ইত্যাদির দ্বারা প্রকারান্তরে হাকিমুদ্দির শোষণ যন্ত্রের উপর আঘাত করার জন্য এবং তার শাস্তির আয়োজনে তৎপর হয়েছে জনগণ। এই দৃশ্য নাট্যনামকে ব্যঞ্জিত করে এবং নামকরণের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। ফলে নাট্যনাম কেবল রহিমুদ্দির দাম্পত্য জীবনের গন্ডিতে আর থাকেনা; বৃহত্তর প্রান্ত সীমায়িত উত্তরবঙ্গের হিন্দু মুসলমান শোষণমুক্তির আভাস ধ্বনিত হয় নাটকের অন্তিম দৃশ্যে। কারণ হাকিমুদ্দির শোষণ যন্ত্রের তারটিও ছিন্ন হবার সংকেত রয়েছে এই দৃশ্যে।

ব্যক্তিক কিংবা সার্বিক উভয়দিকের চুলচেরা নাট্যনাম নির্বাচন প্রসঙ্গে এবং তার সার্থকতা প্রতিপন্ন হওয়ায় তুলসীদাস লাহিড়ীর নাট্যকার ব্যক্তিত্ব সাধুবাদ পাবার দাবিদার হতে পারেন।

১১.৪ গণনাট্য – নবনাট্য - ছেঁড়া তার নাট্য ভাবনা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে যেমন প্রথম বার গোত্রান্তর সম্ভব হয়েছিল 'নীলদর্পনে' (১৮৬০)-র হাত ধরে তেমনি আবার নাট্য ইতিহাসের ধাত ও ঋত বদল হল, নাট্য-আন্দোলনের সূচনা হল ১৯৪৩ সালে। কারণ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সংগঠন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৩ সালের ২৫শে মে। এবং সাংস্কৃতিক সংঘ অর্থাৎ 'Indian people's Theatre Association' (I.P.T.A. অথবা IPTA- ইপতা)- এর মূল মন্ত্র ছিল 'People's Theatre Stars the People', অর্থাৎ গণনাট্যের নায়ক জনগণ। গণনাট্য আন্দোলনের এই আদর্শবোধকে সহজেই চিহ্নিত করা যায় এই প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার এবং তাদের নাটকের বক্তব্য বিষয়ে উপস্থাপনায়। গণনাট্যের সমাজ-সচেতন ফ্যাসিস্ট বিরোধী নাট্যকারেরা গণনাট্য আন্দোলনকে জনগনের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। আপামোর জনধারণের মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী মনোভাবের প্রসার ঘটিয়ে পরোক্ষে তাদের সমাজ সচেতন করাই ছিল গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী সংগঠক এবং এর সঙ্গে জড়িত নাট্যকারদের সকলেরই মূল অভিপ্রায়। এই ভাবেই সে দিন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' নাট্যসাহিত্য এবং নাট্য আন্দোলনের নতুন ধারার সূচনা করেছিল।

সেদিন গণনাট্যের আয়নায় ধূলিধূসরিত মলিন গণজীবনের সত্যিকারের রূপটি প্রতিবিম্বিত হতে দেখা গিয়েছিল। এই 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' সম্পর্কে সজল রায়চৌধুরী লিখেছেন 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সেই শ্রমিকশ্রেণি শ্রমজীবী মানুষের সংস্কৃতি সৃষ্টির লড়াকু সংঘটন।'(গণনাট্য কথা-সজল রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা।১০) শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রাম এবং জীবন যন্ত্রনার সার্থক রূপায়নে দ্বারা গণনাট্য আন্দোলনের অভিযাত্রীগণ সেদিন সোৎসাহে আগুয়ান হয়েছিলেন। জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রগতিবাদী সংঘটির শ্রমিক শ্রেণির মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে গড়ে

উঠেছিল- এই ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যটি আমদের বিস্মিত হলে চলবে না। 'পুরোনো সমাজ বদলে শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। ফ্যাসীবাদ তাড়াতে হবে'-এই ছিল গণনাট্যের মূল কথা। তাই গণনাট্যের শরীরে যে উত্তাপ অনুভূত হয়-তা মেহনতি মানুষের হৃদয়েরই উত্তাপ। Indians People's Theatre Association Bulletin No I (July 1943)-তে ঐ সংগঠনের Historical Background সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, "The revival of the national consciousness of the upper and middle classes awakened their interest in these arts... They had no clear conception or understanding of the significance of the forces which revolutionizing society... A strong peoples theatre movement was however, yet to be born in India... with the growth of Kisan and Working class movements, writers and artists from among the submerged masses began to be stirred by the new hope and faith in their classes engendered by these movements ... It is a movement which seeks to make of our arts the expression and the organizer of our people's struggles f9or freedom, economic justice and a democratic culture. It stands for justice and democratic culture. It stands for the defense of culture against Imperial ism and Fascism and for enlightening the masses about the causes and solution of the problems facing them."

গণনাট্য আন্দোলনের মূল অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালো গণজীবন। আর এর লক্ষ্য বিন্দু গণচেতনার সঞ্চার। নাট্যবিষয় তাই মৃত্তিকা লগ্ন কর্মজীবি মানুষের জীবন আশ্রয়ী হল। নাটক রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হল। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত মানুষের, শোষিত জনগণের বিক্ষোভ সংগ্রাম হল নাট্যদ্বন্দ্বের কেন্দ্রীয় গতিসঞ্চারী দিক। আর নাট্য পরিণতিতে নিরাশার অমানিশার পারে নতুন রক্তিম প্রভাত সূর্যের আশার স্বর্ণালী রেখার আভাস। রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের বদলে বুদ্ধিগ্রাহ্য বক্তব্য এলো নাটকে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ মহামারীর মতো আধিদৈবিক ঘটনার অভিঘাতে গ্রামবাংলার লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ গেল। ক্ষুণ্ণিবৃত্তির দুর্মর কামনায় দলে দলে গ্রামবাসী ঘর-গৃহস্থালী ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়ালো। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। অনাহারী ও রোগগ্রস্ত মানুষের মৃতদেহের স্তূপ শহরের শান বাঁধানো ফুটপাতে পড়ে থাকে। এই মন্বন্তর পর্বে 'গণনাট্য সংঘ' 'নবান্ন' নাটক নিয়ে রিলিফের কাজে নেমে পড়ে। বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মে ও নাট্য প্রযোজনায় বিবর্ণও মলিন জীবনের বাস্তব নাট্যচিত্র প্রস্তুত হলে সেই সময় নাট্যমহলে তীব্র প্রাণোন্মাদনার সাড়া পড়ে যায়। 'নবান্নে'র কিংবদন্তী মূলক প্রযোজনায় ছোঁয়াছ তুলসী লাহিড়ীর অনুভবে স্থান পায়। 'নবান্ন যেমন লাঞ্ছিত মানবাত্মার জীবন দর্পন; নবান্ন যেমন শুধু ছিন্নমূল জীবনের আর্তনাদ নয়; ভবিষ্যৎ মন্বন্তরের প্রতিরোধ;' তেমনি মন্বন্তরের সত্য পরিবেশনের জন্য তুলসীবাবু একাই দুটি নাটক লিখে ফেললেন। 'দুঃখীর ইমান' এবং 'ছেঁড়া তার।' মন্বন্তর মহামারী প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়যুক্ত পরিস্থিতি এবং শোষণের মধ্যে কৃষকদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী চেতনার সংগ্রামী মানসিকতার এবং বিদ্রোহের নাটক 'দুঃখীর ইমান।' এতি মন্বন্তরের দ্বিতীয় পাঠ। আর 'ছেঁড়া তার' মন্বন্তরের তৃতীয় পাঠ। গণনাট্য-এর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করে নবান্ন সেদিন সফল হয়েছিল। মন্বন্তর কবলিত মানুষের নির্মম দুর্দশার ছবি, অসহনীয় অবস্থা মোচনের জন্য তাদের নিরন্তর প্রয়াসের ছবি একদিকে, অন্যদিকে মহাজন-আড়তদার ব্যবসাদারের মানবধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ- এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা নিয়েই নবান্ন নাটকের আয়োজন। নাটকটির প্রত্যয় পক্ষপাত নিরন্ন মানুষদের দিকে। তাই প্রতিবাদ ও ঘৃণার শানিত তীর সমুদ্যত শ্রেণীস্বার্থের শক্তিশালী জোটের দিকে। এ নাটকের সুর প্রথম থেকেই দ্বন্দ্ব সংঘাতে আবহে গড়া। প্রধান সমাদ্দারের সংগ্রামী ভূমিকা সাধারণ দ্বন্দ্বশীলতার পরিমাপকেও এক সময় ছাপিয়ে যায়। নাটকটির অবসান হয়েছে মন্বন্তরের করাল গ্রাসের পরেও বেঁছে বর্তে থাকার অদম্য জীবনীশক্তিতে এবং সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধের ইঙ্গিতে। সংগ্রামী মানসিকতার মন্ত্রোচ্চারণে নবান্ন-এর সমাপ্তি তাই বেশ মনোগ্রাহী।

গণজীবন এবং সমাজের প্রতি গণনাট্য এবং নবনাট্যের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক যায়গায় তাদের সাধর্ম ছিলই। পয়সাতো নয়ই এমনকি নাটকের জন্য কেবল নাটক- এমনতর উদ্দেশ্য এদের দুয়ের কারোরই ছিল না। নাটক ও মঞ্চকে গণজীবনের একেবারে কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং গণজীবনকে সচেতন এবং সমৃদ্ধতর করাই ছিল গণনাট্য ও নবনাট্য-এর motive. সেকারণে পেশাদারি থিয়েটারের নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী 'ছেঁড়া তার' নাটকটি গণনাট্যের নবান্ন-এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাবজাত নাট্যফসল। গণনাট্যের গঠনতন্ত্রের নিয়ম-কানুন মেনে চলার কোন দায় ছিলনা তুলসীবাবুর। কোন সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের রাশও ছিল না তার নাট্যকলমে। সুতরাং যেটুকু অঙ্গীকার তিনি স্বেচ্ছায় অঙ্গে ধারণ করেছেন, তার পুরোটাই ছিল নাট্যকার ব্যক্তিত্বের আন্তঃপ্রেরণারই ফসল। নবান্নের সঙ্গে ছেঁড়া তারে'র তুল্যমূল্য বিচারের আগে নবনাট্যের সংজ্ঞায় একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। 'মোটামুটিভাবে বলা জায়, সৎ মানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ জীবন গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্প সুষমাযর প্রতিফলন তাকেই বলতে পারি নবনাট্য নাটক। এমনি নাটক নিয়ে মঞ্চে সমাজ সচেতন শিল্পীর সত্য ও রিয়্যালিটির যে অন্বেষা তাকেই বলতে পারি নাট্য আন্দোলন।' (বহুরূপী পত্রিকা-১৯৬০, ১০-ই নভেম্বর সংখ্যা)। সামন্ততান্ত্রিক শাসনে হিন্দু-মুসলমান জনজীবনের রূপায়নে, বিশেষভাবে মৌলবাদী, মুসলমান সমাজের নিদান, আচার-কুসংস্কারের এক নিখুঁত পরিচয়, এবং হাদীজের বিধানকে কৃষক শোষণের যন্ত্র হিসেবে প্রয়োগ এবং জনজীবনের দুর্গতির চিত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে উঠে এসেছে 'ছেড়া তারে'র বিষয় বিন্যাসে। নাট্যকার তুলসীবাবুর মানবদরদী জীবন প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রসসিঞ্চনে নাট্যঘটনা এবং চরিত্রগুলি একেবারে পূর্ণমাত্রায় জীবন রসে সিক্ত হতে পেরেছে। দোষে-গুণে চরিত্রগুলির অন্তর জগতের সূক্ষ ও স্থূল মানবিক অনুভূতিগুলি যথাযথভাবে প্রকাশিত। কার্যত, নবান্নের সঙ্গে 'ছেঁড়া তারে'র তুল্যমূল্য বিচারে মেলাতে গেলে তুলসী বাবু 'ছেঁড়া তার'-এর বক্তব্য বিষয় কোথাও নবান্নের চেয়ে উচ্চ সুরে বাঁধা বলে মনে হবে। যেমন মন্বন্তরের রূপ চিত্রণে তুলসীবাবুর লেখনি কোথাও কোথাও পূর্ব নাটকের

(নবান্ন) দৃষ্টান্তকে ছাপিয়ে গেছে। নবান্নে মন্বন্তরের কবলে পড়ে অনাহারে শিশুর মৃত্যুর দৃশ্য দেখা গেছে। কিংবা কুঞ্জের একটি সংলাপ জীবনটাই যেখানে ‘জীবনটাই যেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়ে মানুষের ইজ্জত।’ (নবান্ন, প্রথম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য) কিংবা রাঙার মায়ের অনাহারে থাকার চিত্র, কিংবা ‘অন্নকূট’ খেলার প্রসঙ্গ। এ সবকে এক বাক্যে হার মানিয়েছে ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের তুলসীবাবুর বর্ণনা। মন্বন্তরের কবলে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবন। মন্বন্তরের কবলে তাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত, বড় এলোমেলো। এমনই অবস্থা যে মানবেতর প্রাণী মরা মানুষের মাংস খেয়ে শক্তিশালী হয়েছে। ‘শিয়ালে তাড়া কচ্ছিল রে? পার হইছে কোনও মতে। ওঃ হো! কি আন্দাজ আকাল হইলরে। মড়া মানুষ খায়া শিয়াল কুত্তার এমন ত্যাজ হইছে যে মানুষ দেখি তারা আর ডরায় না।’ (‘ছেঁড়া তার’ দ্বিতীয় অঙ্ক/ দ্বিতীয় দৃশ্য।)

কিংবা ‘যদি বাঁচি থাকি রে, ভাই ত’ কবার পাইরমো যে দেখছি হয় আকাল কাক কয়। গাই বলদের মাইনষের দাম কম হইলো হে? দুলুটা উদিনকা পাঁচে টাকাত ব্যাচেয়া দিছে তার জুয়ান বৌটাক।’- এসব দৃশ্য নবান্নের উপস্থাপিত চিত্রের চেয়ে অনেক বেশি মর্মান্তিক। লঙ্গরখানার চিত্র উপস্থাপনার ক্ষেত্রে অনেকবেশি জীবন্ত বর্ণনা দিতে পেরেছেন তুলসীবাবু। নিষ্ঠুরভাবে অভুক্ত বসিরকে ফিরিয়ে দেবার চিত্রে রয়েছে হাকিমুদ্দির চরম নির্মমতার ও হৃদয়হীনতার পরিচয়। নবান্নে মৃত্যুর শোচনীয়তা সর্বত্র দুর্লভ হলেও বিজনবাবু দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া, সেই নির্মম দৃশ্যকে মঞ্চস্থ করতে চাননি। কারণ, তীব্র হাহাকার তৈরি করা তার মত নাট্যকারের কাজ নয়; কেবল ট্রাজিক সংবেদনা জাগানোই নাট্যকর্ম। দূর্ভিক্ষের মত আধিদৈবিক ঘটনা এবং স্বার্থান্বেষী মানব ষড়যন্ত্রের অশুভ মিতালী সূত্রে জড়িত স্বার্থপর কালোবাজারি ও আড়তদারদের মুখোশ খোলাই তাঁর কাজ ছিল। অবশ্য জনগণকে এদের সম্পর্কে সচেতন করাও তার লক্ষ্য ছিল। তুলসীবাবু নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য-এ পাই মন্বন্তরের হৃদয়বিদারী বর্ণনা। সেই বর্ণনাই নেই কল্পনার খাদ। অনাহারে মুমূর্ষু মানুষকে শেয়ালের আক্রমণ দেখিয়ে মন্বন্তরের তীব্রতাকে প্রদর্শিত করেছেন নাট্যকার। ‘মধুটাক বত্তায় খায়া

ফেলাইছেনা... খাইলো ত! উপাসে উপাসে মধু মরিয়াই আছিল। ঘরের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া শিয়ালগুলা ঢুকিয়া ধইছে টুঁটি কামড়েয়া। আর কাবড়াবারও পারে নাই'- এভাবেই দরদী নাট্যকার তুলসীবাবু মন্বন্তরের ভয়ংকরতার বর্ণনা দিয়েছেন তার নাটকে। তবু যেন তার 'ছেঁড়া তার'- এর ডাইমেনশন বহুব্যপ্ত হতে পারেনি। বিজনবাবু গ্রামত্যাগী জনস্রোতকে শহরের শান বাঁধানো রাস্তার ফুটপাতে নিয়ে গিয়ে কিংবা কুঞ্জকে ডাস্টবিনে খাবার সংগ্রহে নিরত রেখে মন্বন্তরের ভয়ংকরতার কার্য-কারণের শ্রেণি রূপটিকে তুলে ধরেছেন। তুলসী বাবু গোবিন্দের কিংবা নায়ক রহিমউদ্দিকে শহরে পাঠিয়েছেন ঠিক, কিন্তু তারা শহরে গিয়ে নিষ্ঠুরতার শিকার হননি। তার প্রমাণ গোবিন্দবাবুর উক্তি 'ফাঁকি নয় ভাই। মানুষটা ভালো। ভালোয় কথা কছিল।।.. তার পাশে আরো কত কথা হইল। বাবুটা মক সাথে করি নিয়ে গেল। ফিরাদিন খাওয়াইলে, আর ভালো একটা গান শিখেয়া দিলে।' (তৃতীয় অঙ্ক /দ্বিতীয় দৃশ্য)- এর ব্যতিরেকে তুলসীদাস বাবু নাটকের কেন্দ্রীয় ভূমিতে গ্রামকেই পটচিত্র করে রেখেছেন। কিংবা নায়ক রহিমুদ্দিন কিছু সাহায্যের জন্য বাল্যবন্ধু মহিমবাবুর কাছে গিয়ে চাকুরী করেছে মাত্র কয়েক মাসের জন্য। (তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য)। তাছাড়া রহিমুদ্দি ফুলজানের দাম্পত্য জীবনে তালাক দানকে কেন্দ্র করে প্রকারান্তরে climax-এর সৃষ্টি হলেও নাট্যঘটনা মন্বন্তরকে পাশে সরিয়ে রেখে একান্ত ব্যক্তিক সমস্যারই চিত্র হয়ে উঠেছে। তবে নাটকের শেষ দৃশ্য কিছু ব্যাপকতর নাট্যব্যঞ্জনাকে আভাসিত করে। এছাড়া মৌলবাদী হাদিজের বিধান তো প্রকারান্তরে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারে মধ্যেই সীমায়িত রয়ে গেছে। গণজীবনই গণনাট্যের শেষ কথা- এমন লক্ষ্যে স্থির থাকতে পারেনি 'ছেঁড়া তারে'র বিষয়বস্তু। নাট্যপরিণতি-তে তাই গণনাট্য-এর সামান্য আভাস ধ্বনিত হলেও পুরো মাত্রায় সাফল্য দাবি করতে পারেন না তুলসীবাবু। নবান্নে মন্বন্তরের শেষে নবান্ন উৎসবের আনন্দমুখর পরিবেশের মধ্যে আমিনপুরের মানুষ সংঘবদ্ধ হবার কথা শুনিয়ে গিয়েছিল; আর এ নাটকে অত্যাচারিত মানুষ অত্যাচারীর উপর আক্রমণ করলেও শেষে নায়কের আত্মহননের রাস্তায় পরোক্ষে পরাজয়কেই বরণ করে নেবার কথায় শোনায়; প্রত্যক্ষ কোন দ্বন্দ্ব দেখায় সংঘাতের দৃশ্য আর দেখা গেল

না; বরং কিছুটা পরিমাণে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে শ্রীমন্ত চরিত্র। ‘খোদা উয়াক দয়া কইছ্ছে’। কিন্তু গণনাট্যের গঠনতন্ত্রে এই কথা বলা নেই। কার্যত নাট্য শেষে চিহ্নিত হয়ে রইল। শরিয়তী বেড়া জালে এক দরদী হিন্দু নাট্যকারের চরম বিভ্রান্তির কথা। গণনাট্যের আদর্শ শেষে প্রতিফলিত না হওয়ায় কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এমনও বলা চলে।

গণনাট্যের আদলে সঙ্গে কিছুটা সঙ্গতিহীনতা লক্ষ্য করা যায় বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। আর সেই কারণেই হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছিলেন, ‘বহুরূপী’, ‘ছেঁড়া তার’ বহু পরিক্ষিত ও বহু আলোচিত। এ সম্মেলনে তাদের অভিনীত ‘ছেঁড়া তার’ সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে বাংলা নাট্যের অদ্বিতীয় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাছাড়া গল্পাংশে অদল বদল করে পূর্বেকার হতাশাময় পরিণতিকে অনেকখানি শোধরাতে পেরেছেন। কিন্তু তবু এই কথা স্বীকার করতে হবে ‘ছেঁড়া তার’ শ্রেণি সংঘর্ষ নিয়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত শ্রেনি সংগ্রামটা গৌণ হয়ে যায় এবং মুখ্য হয়ে ওঠে মুসলমানি তালাক প্রথাকে কেন্দ্র সামাজিক সমস্যা। নাটকের মুল climax- ও এখানেই এবং এটাই নাটকের মূল দুর্বলতা। জীবনধর্মী নাটকের প্রযোজনার রূপ ও রেখা- সুনীল দত্ত। সবদিকের বিচারে এখন মনে হয় যে গণনাট্যের গঠনতন্ত্র মান্য করলেও পুরো মাত্রায় স্বার্থক গণনাট্যের শর্ত পূরণে সক্ষম হয় নি। অথচ এতে মানব সাপেক্ষতার ও সমাজ অন্বেষার দরদী পরিচয় রয়েছে। আর এই কারণেই পুরোমাত্রাই এটি গণ চৌহদ্দীর বাইরে নয়। গণনাট্য যে রাজনৈতিক শৃঙ্খলার অধীন, তার প্রেরণাত্মকর্গত সব নাট্যকার ঠিক তেমন নন। গণনাট্য থেকে তার দায়বদ্ধতার অংশকে বাদ দিয়ে তার মানবতাবাতী ও প্রতিবাদমুখী আন্তঃপ্রেরণাকে বাইরে থেকে অনেকেই ধারণ করতে চেয়েছেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যে ধারায় দেখা গেছে গণনাট্যের সংগঠনগত দুর্বলতার দিনেও তার প্রেরণাবাহী অন্য গোষ্ঠীর নাটক চলেছে। গ্রুপ থিয়েটার তো এই রকমই পৃথক অস্তিত্বের নাম। তাছাড়া গণনাট্যের ভাঙ্গা বন্দরের সেদিন সাজানো হয়েছিল নবনাট্যের পসরা এবং এই নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা হল গণনাট্য আন্দোলন নামের প্রগতিবাদী সংঘের প্রতিশ্রুতি গণ্ডীর বাইরে এসে। গণনাট্য

আন্দোলনের সূচনা হল। 'গণনাট্য আন্দোলন' নামের প্রগতিবাদী সংঘের প্রতিশ্রুতি গন্ডীর বাইরে এসে গণনাট্য আন্দোলনের 'গণ' অংশের যায়গায় 'নব' যোগ করে সেদিন গড়ে তোলা হয়েছিল 'নবনাট্য আন্দোলন'। অর্থাৎ 'গণনাট্য' নয়, অথচ তারই প্রেরণালব্ধ নাট্য ধারাকেই সুধী নাট্যসমালোচক বৃন্দ 'নবনাট্য' বলে চিহ্নিত করেছেন। তুলসী দাস লাহিড়ি মন্বন্তরের ও হাদিজের প্রেক্ষাপটে সমীকৃত নাটক 'ছেঁড়া তার' নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গণনাটক না হলেও, এই কারণে তার 'নবনাটক'- এর মর্যাদা লাভে কোনো বাধা থাকে না।

১১.৫ অনুশীলনী

১) প্রতিবাদী চেতনা নাটকের প্রাণ – ছেঁড়া তার নাট্যরচনার সময়গত নিরিখে এই উক্তিটির মর্মাথ ব্যাখ্যা কর।

২) ছেঁড়া তার নাটকের নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ কর।

৩) গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ছেঁড়া তার নাটকটি আলোচনা কর।

৪) গণনাট্য নাকি নবনাট্য নাকি এসবের বাইরে শুধু সামাজিকীকরণ কোন গোত্রে রাখবে এই ছেঁড়া তার কে, আলোচনা কর।

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) গণনাট্য আন্দোলন – দর্শন চৌধুরী।

৪) গণ-নব-সৎ-নাট্যগোষ্ঠীর কথা – সুধী প্রধান।

৫) ছেঁড়া তার –তুলসী লাহিড়ী – পুষ্পেন্দুশেখর গিরি।

একক ১২- ছেঁড়া তার চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ছেঁড়া তার

বিন্যাসক্রম

১২.১ চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ছেঁড়া তারের ফুলজানের চরিত্রের বয়ান

১২.২ রহিমুদ্দি চরিত্র

১২.৩ হাকিমুদ্দি চরিত্র

১২.৪ মহিম চরিত্র

১২.৫ গোবিন্দ কোরাক প্রভৃত্তি চরিত্রের পর্যালোচনা

১২.৬ অনুশীলনী

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২.১ চরিত্র চিত্রণ প্রসঙ্গ ও ফুলজান চরিত্রের বয়ান

নাট্যকারের সচেতন সৃষ্টি তাঁর নাটক। আর এই নাটকে তথা নাট্য কাহিনিকে গতিময়তা দান করতে পারে কেবল মাত্র নাট্য চরিত্র। কারণ, নাট্যকার থাকেন অন্তরালে। তারই মানসলোকের ফসল হিসাবে নাট্য চরিত্রকে সজীব ও জীবন্ত হতে হয়। আর যদি সামাজিক নাটক হয় তাহলে তো কথায় নেই। সেই চরিত্রকে হতে হবে বাস্তবানুগ ও জীবন্ত। কায়া কান্তি নিয়ে যে চরিত্র যত বেশি সজীব হয়ে নাটকে বিচরণ

করবে সেই চরিত্রে ততটাই বেশি মন আকর্ষণ করবে দর্শক- পাঠকের। সেই কারণেই নাট্য চরিত্র কখনোই আরষ্ট হলে চলবে না। তাকে হতে হবে জীবন্ত। কারণ সেই চরিত্রই আবার নাটককেও করে জীবন্ত। W.H. Husdson-এর কথা প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে-'Characterisation is the really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.' (An Introduction to the Study of Literature). এছাড়া নাট্য চরিত্রের গুরুত্বের কথা প্রসঙ্গে বলতে গেলে মনে করতে পারি এই মতটি। 'The difference between a live play and a dead one is that in the former character control the plot, in the latter the plot controls the character (William Archer)'. মোট কথা, নাট্যচরিত্র নাট্যবৃত্তের মতই অভিসংবাদিত শ্রেষ্টত্বের দাবিদার হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

তুলসী লাহিড়ি সবকটি সামাজিক নাটকের কাহিনিবলয় যেমন নজর কারা, তেমনি সেই সব সামাজিক পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের চরিত্রগুলির অভিসংবাদ মানবিক দিকগুলি আমাদের মানষলোকে এক অন্যরকমের আবেদন রাখে। আর সেই কারণে তার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে কেমন যেন একাত্ম হয়ে পরি। তাই তার সৃজন করা চরিত্রগুলি বড় বেশি ভাবিত করে আমাদের। এখানেই সামাজিক নাটকের নাট্যকার হিসেবে তুলসী লাহিড়ির অনন্যতা।

নাট্য চরিত্রের বিশ্লেষণে এসে নাট্যচরিত্র ও সেই নাট্যচরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গের মধ্যেকার ভেদ রেখাটিকে বোধ হয় বুঝে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। 'By the term Character we mean the dominant sentiments and beliefs of an individual at any given time whereby his attitude to himself and his environment is determined... personality on the other hand, is a much more complex matter and includes the ego and the character. It involves all the heredity of the individual that is allpo the bodily

and mental dispositions, both actual and potential with which he is equipped at birth.' (R.G. Gordon: Book-Personality)

দ্বিতীয় মহাসমরের পরবর্তী কালপ্রেক্ষিতের সামাজিক, অর্থনৈতিদ ভাবনারই নাটক 'ছেঁড়া তার'। নাট্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে পার্বতী-পরমেশ্বরের অদ্যয় সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে সবকটি চরিত্রের মত ফুলজান চরিত্রের ক্ষেত্রেও। নারীর শক্তি সৌন্দয ও স্নেহ মমতায় অতীব উজ্জ্বল চরিত্র ফুলজান। নাটকের তার প্রাথমিক পরিচয় হল সে মুসলমান কৃষক রহিমুদ্দির বিবি। অবশ্য এর বাইরেও তার একটি পূর্ব পরিচয় আমাদের হাতে রয়েছে। সেখানে সে পিতা-মাতাহীনা এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী। সে কারণে সে তার ফুফার কাছে প্রতিপালিত হয়েছে বেশ কিছুদিন। পরে অবশ্য রহিমুদ্দির সংসারে সে গৃহকর্ত্রী। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দিশ্যে ফুলজানের প্রসঙ্গে আমরা অবগত হলেও তাকে আমরা দেখি প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে। পরণে ভালো শাড়ি, পায়ে শহর থেকে আনা নতুন high hill জুতো পড়ে সে মঞ্চে অবতীর্ণ। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে ১৭ই ডিসেম্বর,১৯৫০ সালের, সকাল ১০টায় যে অভিনয় হয়েছিল, তাতে এই চরিত্রে রূপদান করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র। নতুন high hill জুতো পরিহিতা ফুলজানকে একটু টলমল অবস্থায় দেখে তার আত্মজ কিছুটা আনন্দ অনুভব করেছিল। আর সেই কারণে বসির তার বাপজান কে ডেকে দেখাতে চেয়েছিল তার মায়ের পোশাক ও জুতো পরাকে। এতে অবশ্য পাঠক ফুলজান চরিত্রে কিছুটা গ্রাম্যতাকে খুঁজে পায়। আদতে সে মুসলমানের বিবি; তাই আবার লজ্জাশীলও বটে। সর্বোপরি ঘরে রয়েছেন শাশুড়ি। গ্রাম্যবধূ হিসেবে সে অবশ্য তার শাশুড়িকে যথেষ্ট সম্মান যেমন করে, তেমনি সে নতুন জুতো শাড়ি পড়ে শাশুড়ির সামনে যেতেও লজ্জা পায়। এ প্রসঙ্গে ছোট একটি সংলাপ বেশ মনোগ্রাহী হতে পারে। 'ধেৎ! কাবড়াইসনা তোর দাদী শুনিবে। দাদী আইসে নাকিন?' (প্রথম অঙ্ক/ তৃতীয় দৃশ্য) দারিদ্রঘেরা আপাতভাবে সাজানো সংসারের সে এক গৃহকর্ত্রী। স্বামী রহিমুদ্দী এবং ছেলে বসিরের সঙ্গে বেশ খুনসুটি করেই তার দিন কেটে যায়। পায়ে তার জুতো মানায় না- এই অজুহাতে সে পা থেকে জুতো খুলেও ফেলে- কারণ সে জানে তার গ্রামের কোন 'বেটি ছাওয়াটা'

জুতো পায়ে দেয় না। পরে অবশ্য দারিদ্র্যঘেরা সংসারের কথা ভেবে ফুলজান বলে ‘হামরা যে গরিব মানুষ। যে টাকা জুতো কিনতে লাগে তাতে যে কত কিছু হবার পারে।’ ফুলজানের কণ্ঠের এই সংলাপ তার চরিত্রের ভেতরকার মানুষকে টেনে বাইরে বার করে আনে। চরিত্রের এই যে আত্মপ্রকাশ তা যেকোনো শহুরে ড্রইংরুম বিলাসী সভ্যতা মদগর্বী পাঠকে ক্ষণিক হলেও ভাবিত করে দিতে পারে। এই ছোট সংলাপটির দ্বারা নাট্যকার যেন নাট্যবিষয়ের কোন এক তন্ত্রীতেই অজান্তে আঘাত করে বসেন। তার মত দরদী নাট্যকারের পক্ষেই বোধহয় এটি সম্ভব।

সংসারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি ফুলজানের অপরিসীম দরদ। সে কারনে বেলা গড়িয়ে গেলেও শাশুড়ি বাড়িতে না ফেরার সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আবার মিথ্যা চুরির সাজানো অপবাদে রহিমুদ্দিকে দারোগা ডেকে নিয়ে যেতে চাইলে সাধ্বী রমণীর মতো সে কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কান্নায় ভেঙে পড়ে ফুলজান।

সমাজের বুকে দুর্ভিক্ষ ক্রমে ক্রমে প্রকট হয়েছে। অভুক্ত মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে চারদিকে। নাটকে দীর্ঘসময় ফুলজানকে আর দেখা যায়নি। দরিদ্র কৃষক জীবন রহিমুদ্দির। তাই তার ঘরেও মন্বন্তর প্রবেশ করেছে। খাদ্য জোগাতে প্রায় অপারগ হয়ে বুভুক্ষু পুত্র ও স্ত্রীর কথা ভেবে তাদের অন্যত্র রেখে আসতে চায়। যাতে তাদের কোন ভাবে গ্রাসাচ্ছাদনটা চলতে পারে। এরই মধ্যে রহিমুদ্দির মাতৃ-বিয়োগও হয়ে গেছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে তাই বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত সে। সাত-পাঁচ ভেবে ফুলজান ও বসিরকে ফুফার বাড়ির খুব কাছেই ছেড়ে দিয়ে আসে রহিমুদ্দি। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। ঘটনাধারা অন্যদিকে মোড় নেয়। এক সময় আমরা দেখতে পাই ফুলজান এবং বসির নিজের বাড়িতেই চুপিসারে ফিরে আসে। অনাহারক্লিষ্ট জননী আজ পুত্রের মুখে সামান্য আহার জুটাতে অপারগ; ফলে তার মধ্যে এক ধরনের গ্লানী জমাট বেঁধেছে; তিনি স্বামীর দুঃখের দিনে তার পাশে ফিরে এসে দাঁড়ানোয় কেমন যেন বিব্রত বোধ করেছে সে। দু দিক থেকে মানসিক সংঘাতে ফুলজান বিপর্যস্ত হয়েছে। কোন কোন সময় তাকে একেবারে নিষ্ক্রিয় চরিত্র মনে হলেও, বাস্তবে সে আদৌ নিষ্ক্রিয় নয়। তাছাড়া মৌলবাদী মুসলমান সমাজের ঘেরাটোপের মধ্যে তার সক্রিয় হবার

ক্ষমতাই বা কতটুকু। সে জানে রহিমুদ্দি কিংবা সে তেমন কোন অপরাধ করেনি। তাই খোদাতালা তাদের দুঃসময়ের অবসান করবেন একসময়। সে আত্মপ্রত্যয়ী না হলেও, একেবারে ভেঙে পড়ে না। মানুষ যখন অপারগ হয় তখনই তৃতীয় কোন অদৃশ্য শক্তির কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে। এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করে। ফুলজানও তাই করেছে। দুর্বল হৃদয় মানুষের মতো একসময় খোদা তালার উপর ভরসা রেখেও স্বামীর পাশে দাঁড়ায়। পরম সান্ত্বনা বাক্য নিঃসৃত হয় তার কণ্ঠে। ‘হতাশ হন না। কোন কশুর হামরা কচ্ছি যে খোদা হামার গুলাক মাইর বে। খোদা রক্ষা কইর বে। (দ্বিতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য)।

কোমলপ্রাণা জননী নিজের সন্তানকে বাঁচাতে একসময় স্বামীর সঙ্গে তর্কে যেতে চায়। যুক্তি খাড়া করে। ধুরন্ধর হাকীমুদ্দির মায়ের কথাও তুলে ধরে রহিমুদ্দির কাছে। কিছুটা অসংযমের সুরে একসময় স্বামীর কাছে বলে বসে ‘বাচ্চা পয়দা হবার আগে আল্লা মায়ের বুকে দুধ আনি রাখি দ্যায়। বাপের বুকে ত দ্যায় না। বাচ্চাক বাঁচানোর দায় বাপের চাইয়া মায়ের বেশি। হয় কি না হয়?’ আবার কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে রহিমুদ্দির শহরে যাবার কথায় একসময় সে আঁতকে ওঠে। কেননা স্বামীসঙ্গ হারা হয়ে সে এর আগে একা একা ঘরে থাকেনি। দুর্ভিক্ষের দিনে, অনাহারী পুত্র বসিরকে বুকে টেনে নিয়ে কিছুটা প্রতিবাদের সুরে তাকে বলতে শোনা যায় ‘মুই মাও। বাচ্চাক মোর বাঁচানে লাইগবে, মুই যাঁও দ্যাওয়ানীর মার কাছে।’ লঙ্গরখানায় গিয়েও পুত্র বসিরের মুখে দু'মুঠো অন্ন সংস্থান করতে পারেনি ফুলজান। কারণ, খাড়া করেছে মৌলবাদী চরিত্র হাকিমুদ্দি। যারা চৌকিদারি ট্যাক্স প্রদান করে তারা লঙ্গরখানায় খাবার পাবার দাবিদার নয়।- এমনই মত হাকিমুদ্দির। হলে বিফল মনোরথ হতে হয়েছে অভুক্ত সন্তান বসির ও তার মাতা ফুলজানকে। এই প্রেক্ষাপটে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে ফুলজান। পিতা হিসাবে বসিরের প্রতি পরম মমতায় পাগলের মত আচরণ করেছে রহিমুদ্দি। একসময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় রহিমুদ্দি তালাকের পর ফরমানপত্র তুলে দেয় নিজের স্ত্রীর হাতে- জাতে লেখা রয়েছে স্ত্রী ফুলজানকে ত্যাগের কথা। এই তালাক নিজের কিংবা স্ত্রীর প্রতি ক্রোধের প্রকাশ নয়। এর পিছনে রয়েছে চিরন্তন পিতৃত্বের হাহাকার। পুত্র

বসিরের মুখে দু'মুঠো খাবার জোগাতেই তার এই অমোঘ অস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল। স্বামীর এরকম উন্মত্ত আচরণকে কোন ভাবে মেনে নিতে পারেনি ফুলজান। স্বামীসঙ্গ ত্যাগ করেও হয়ত সে কিছুদিন বুকে পাথর চাপা দিয়ে থাকতে পারতো; কিন্তু একমাত্র সন্তানের জননী কি করে সন্তান ত্যাগ করে থাকবে। কারণ তালাকের ফলে স্বামী পুত্র ব্যতীত তাকে একাকিনী হাকিমুদ্দির বাড়িতে থাকতে হবে।

হাদীজের খেলাফের ভয় দেখিয়ে মৌলবাদী হাকিমুদ্দি ফুলজানকে দেখতে দিতে চায় না অসুস্থ আত্মজ বসিরকে। শিয়রে মৃত্যু আসন্নপ্রায় বশিরের জন্য ফুলজানকে জোর করে টেনে নিয়ে আসে রহিমুদ্দির। অথচ হাদীজের খেলাফ-এর ভয়ে আঁতকে ওঠে ফুলজান। স্বামী রহিমুদ্দির বাড়িতে থাকলে, স্বামীর সঙ্গে কথা বললে, অসুস্থ সন্তানের শিয়রে বসলেও নাকি হাদিজ খেলাপ হয়; গুণাহ হয়- এমনতর ধারণা পোষণ করায় আধুনিক পাঠকের কাছে ফুলজানকে মনে হয় সে যেন অনেক বেশি অনাধুনিক। ধর্মভীরু, নারী, যার মধ্যে পাপভীতিও বর্তমান। যুগের সঙ্গে স্বামীর মতাদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সে অপারগ। কিন্তু ফুলজানের চরিত্র বিচারে তার এহেন আচরণ সেখানে এহোবাহ্য। এর গভীর কারণ রয়েছে সেখানে যেখানে নাট্যকারের মূল motive টি লক্ষণীয়। কারণ যুদ্ধ, মন্বন্তর কবলিত গ্রাম জীবনের প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত হলেও ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে নাট্যকার রেখেছেন রহিমুদ্দি, ফুলজান ,বসিরের পরিবারকে। আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের বাতায়নে নির্মিত এই নাটকের কাহিনি। সেই দিক থেকে নাট্য পরিণতির লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে যা যা নাট্যকারের প্রয়োজন সেই প্রয়োজনকে কিছুটা প্রতিফলিত করেছে এই জাতীয় কোরান হাদিজ ভীতি। ধর্মসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন মন স্বামী রহিমুদ্দির প্রাণ নিঙড়ানো কাতর আবেদনও সাড়া দেয় না। শ্রেয় ও প্রেয়ের যুগল দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত, বিপর্যস্ত হয় ফুলজানের সমস্ত নারী হৃদয় ও তার গ্রাম্য মনপ্রাণ। তুষের আগুনের মত তার সমস্ত হৃদয় কেবল ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। সেই অশান্ত হৃদয়ে সামান্য জ্বালার প্রলেপ দিতে চায় অসুস্থ অভুক্ত সন্তান বসিরকে কোলে করে। কিন্তু তার তাপিত মাতৃহৃদয় সহজে শান্ত হতে চায় না। একদিকে ছেলেকে বুকে

ধরতে না পাবার মর্মান্তিক যন্ত্রণা, অন্যদিকে স্বামীর উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা- এই উপর্যুপরি ঘটনার আকস্মিকতায় ফুলজান একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ ফুলজানকে নিজের গৃহে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে পর্বত প্রমাণ অভিমান নিয়ে আত্মহননের পথে চলে যাওয়ার কারণে এবং তার আত্যন্তিক ভালোবাসায় তেমনভাবে সাড়া না দিতে পারায় ফুলজান এখন স্বামী হারানোর যন্ত্রণায় হাহাকার করে ওঠে। নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে এখন সে নিক্ষিপ্ত হয়। হাজারো চেষ্টা করেও সে ফুলজানের মুখ পর্যন্ত ফোটাতে পারেনি রহিমুদ্দি এক সময়; সেই রহিমুদ্দির মৃতদেহের উপর একসময় ফুলজান লুটিয়ে পড়ে। উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে ওঠে। আর এমতাবস্থায় তার কণ্ঠ থেকে বেড়িয়ে আসে সেই সংলাপ। ‘রাগ করি কোন কাম কল্লুরে? হায়, হায়-’ মুসলমান চাচা রহিমুদ্দি কী অকাল মৃত্যুতে সত্যিই শান্তি পেয়েছে? সে কি জীবন পলাতক এক পথিক? এই প্রশ্নই ধ্বনিত হয়েছে নাট্যসমাপ্তিতে। জুড়াইছে? জুড়াইছে? আল্লা ‘অয়ঁ কি জুড়াইছে?’ সমাজমনস্ক নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ী কাহিনী নির্বাচনের পাশাপাশি নাট্য চরিত্রের জীবন্ত উপস্থাপনায় যে কতটা পারঙ্গমতার দাবিদার, তার আর একবার প্রমাণ পাওয়া গেল এই ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের নায়িকা চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত ‘ফুলজান’ চরিত্রের জীবন্ত উপস্থাপনায়।

১২.২ রহিমুদ্দি চরিত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থসামাজিক পটভূমি এবং মন্বন্তর মহামারী ও জাপানী আক্রমণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের আখ্যান ভূমির সঙ্গে। যুদ্ধ পরবর্তী আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য কৃষক সম্প্রদায়ের অতি সাধারণ মানুষকে ফেলে তার মানবিক মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। এই নাটকের নায়ক চরিত্র তথা কেন্দ্রীয় গতিসঞ্চারী চরিত্রের মর্যাদা পায় রহিমুদ্দি। কারণ রহিমুদ্দি এবং ফুলজানের পরিবারকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় মহারণের প্রক্রিয়াজাত মনন্তর কিভাবে সমগ্র জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল তার স্পষ্ট আভাস দিতে চেয়েছেন। নাট্যকারের সমাজ অন্বেষা এখানে খর Reality-র উপর প্রতিষ্ঠিত।

রহিমুদ্দি বাল্যজীবন সম্পর্কে নাট্যকার বেশ কয়েকটি তথ্যসূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথমতঃ সামাজিক পরিচয় সে একজন সামান্য মুসলমান কৃষকের সন্তান। ক্লাসে বরাবর ভালোভাবে পাস করলেও দরিদ্র পিতার সামর্থের অভাবে তারা আর বেশি দূর পর্যন্ত পড়া হয়নি। তার পিতার মত হতদরিদ্র কৃষকের কাছে রহিমুদ্দির ফি-বছর পরীক্ষায় পাশ করাটা একরকমের ভীষণ বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দেখা দেয়। কারণ নতুন ক্লাসের বইয়ের জন্য রহিমুদ্দির বাবাকে একবার হলেও যে ভাবতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ রহিমুদ্দি সংস্কৃত মনস্ক, সৌন্দর্য রসিক এবং ইতিহাস সচেতন চরিত্র।

তৃতীয়তঃ স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে বৃদ্ধ পিতার সামান্য সাহায্যের জন্য সে দাঁড়ায়। কোন ভাবে কায়িক শ্রম স্বীকার করে সংসারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে।

চতুর্থতঃ রহিমুদ্দি ফুলজানের কি দাম্পত্য জীবনই বেশি করে নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়েছে নাটকের প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে। আর এরপরই রহিমুদ্দিন চরিত্রটি ভীষণ রকমের গতিময়তা লাভ করেছে চাষীর জীবন বলে- আনন্দ- এর অবকাশ যে খুব কম। এমন ভাবনা তাকে ভাবিত করলেও সে ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না তার কাছে। তবে রহিমুদ্দি জানে যে চাষির জীবনে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলো বড়ই অল্প। একসময় তাকে বলতে শোনা জায় ‘চাষা মানুষের যে দুঃখ কষ্ট ছাড়া কিছু নেই’। বস্তুত এই কথাটি যেনো রহিমুদ্দিন নাট্য শেষে আত্মহত্যা করে প্রতিপন্ন করে গেল। তার এই অনুভব থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা জায় না।

সৌন্দর্য রসিক বাল্যবন্ধু কৃষি হাকিম মহিমের কাছ থেকে ফুলের চারা সংগ্রহ করে এনে বাগান করে। অথচ হাকিমুদ্দির বাড়ির গাভী সেইসকল সাধের ফুলগাছগুলি ধ্বংস করে দেয়। ক্রুদ্ধ হয়ে রহিমুদ্দির গাভীকে খোঁয়াড়ে দিলে একসময় নাট্যদ্বন্দ্বের সূচনা হয়। হাকিমুদ্দিন সহজ চরিত্রের মানুষ নয় জেনেও রহিমুদ্দির স্পষ্ট কথায় বলে তার সামনে। ‘আসল বোকা হে। না হইলে আল্লা আল্লাহতালাক ফাঁকি দিবার চায়! এতি রোজা নমাজ তসবী আর উতি খালি মিছা কথা আর মানুষ ঠকানো বুদ্ধি। ......মাইন্যমান! যতয় আকাশ কুকাম করে উয়ার ততয় মান বাড়ে।’

অকুতোভয় রহিমুদ্দি। তাই গানের মাধ্যমে হাকিমুদ্দি সম্পর্কে সে সত্যভাষণেও ভয় পায় না। তার চরিত্রের দৃঢ়তা প্রমাণ করে তার মুখের একটি সংলাপ। শ্রীমন্তের আশঙ্কার কথা শুনে সে একসময় বলে 'মিছা ভাবিত হইস না। হামারা ভয়ে মরি। আর, তাতে ওই শয়তানগুলা আস্কাকার পায়। কারবালা ময়দানে আমার হাসান হোসেন দ্যাখেয়া গেইছে যে বেইমানের যতই হিম্মত মুসলমান তার আগে শির বুঝাইবে না।' পোড় খাওয়া মানুষ সে। নিজের সম্পত্তির অনেক অংশ হাকিমুদ্দির কুক্ষিগত হয়েছে, বলেই যুদ্ধের চাঁদার ভার হালকা করার জন্য শ্রীমন্ত হাকিমুদ্দির কাছাকাছি থাকতে চাইলে রহিমুদ্দির স্পষ্টত বলে যে কেবল পেছনে ঘোড়াই হবে। বাহ্যত কোন লাভই হবে না। ধুরন্দর হাকিমুদ্দির চরিত্রের নাড়ি নক্ষত্র সবই জানার মত চরিত্রের অধিকারী রহিমুদ্দি। গ্রাম্য পটভূমিতে সজ্জিত প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এবার শহর প্রত্যাগত আদর্শ পিতা ও আদর্শ স্বামী হিসেবে আমরা তাকে নাটকে পাই। দরিদ্র কৃষক হলেও তার অন্তরের সৌন্দর্য মুগ্ধতার পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। এবার আমরা পাব তার চরিত্রের আরেকটি দিক- যেখানে সে অনেক বেশি আধুনিক এবং সময় সচেতন, ইতিহাস সচেতনও বটে। গ্রাম্য বধূ ফুলজানকে সে শহর দর্শনের কথাও ভেবেছিল। অথচ তা আর সম্ভব হয়নি। রহিমুদ্দি আধুনিক এবং সামান্য হলেও শিক্ষিত বলে নিজের স্ত্রীকে কিছুটা সংস্কার করতে চেয়েছিল জুতা পায়ে না দিলে যে কষ্ট হয় এটা ক্যানে জানিস না। জাবু য্যখন শহর দেইখবারে। ইস্টেশনে পাথর কুচি যখন পায়ে বিঁধিবে তখন ট্যারটা পাবু। দুই শহরে যখন রাস্তা তাতি জাইবে, তখন খালি কাঁদবু তুই।' যে রহিমুদ্দি নিজের স্ত্রীকে তার সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু আমরা জেনেছি সেই ফুলজান স্বামীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি। ফলে সামাজিক অনুশাসনের ভয়ে হোক, কিংবা ফুলজানের ধর্ম সংস্কারের ভয়েই হোক আপাতভাবে অভাবী হলেও একটি কৃষক সংসার একেবারে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

হাকিমুদ্দির মতো শয়তান চরিত্রের এক নির্মম বাস্তব ব্যাখ্যাতা রহিমুদ্দি। সে হাকিমুদ্দির চরিত্র ধর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নতি কিভাবে সম্ভব হয়েছে তা জানে। আর তাই তাকে

বলতে শোনা জায় সেই সহজ সত্যটি। 'দুইটা মাইনষের খাটনি খাটিয়া উজাইতে মোর বিশটা বছর গেল। উয়াক চতুর পাকে কাম চোট্টা চাকর। নিজ হাতে অয়ঁ কিছুই করে না। উয়াক এত টাকা আইসে ক্যামন করি? উয়ার টাকা ভাই অন্ধকারে আইসে জায়; আলোৎ চলে না।'

রহিমুদ্দি পরোপকারী। লোকের বিপদের মুহূর্তে তার পাশে দাঁড়াতে চায় সে। মিথ্যা সাজানো অপবাদ তার উপরে রাখে হাকিমুদ্দি। তবু মিথ্যা অপবাদে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে না। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে একটি সংলাপে। 'চাষী হামরা, ঝরা খরা, হাজা-মাজা, সাপ-বাঘ, শিয়াল, ইঁদুর এগুলোর সাথে সদায় লড়াই। এলায় দেখি সত্য বাঘ শিয়ালের থাকি মানুষ বাঘ শিয়াল মোক জবের সাতায়। আচ্ছা দ্যাখো জাইবে।' সে অদৃষ্টবাদী পুরুষ নয়। তাই মানুষ যে দুঃখ পায় নিজের দোষে- এই সহজ সত্যটি সে অনুধাবন করে- শ্রীমন্ত বাপজান কছিল, খোদা মানুষ পয়দা করি নিজে ক্যানে তার হায়াৎ নসীব খারাপ করে দিবে? মানুষ দুঃখ পায় তার নিজের দোষে।..... শয়তান গুলাক চেনা হইলত? তারা জাতে ভালো মানুষগুলাক জ্বালাবার না পারে তার বুদ্ধি করা লাইগবে। রহিমুদ্দি সঙ্ঘবদ্ধ চেতনায় দৃঢ়প্রত্যয়ী। সে কারণে গরীব কৃষকদের সমবেত হতে বলে। 'সব গরিব যদি একটে হয় মাইরবার পারবে?'

রহিমুদ্দি সব সময় বৃহত্তর স্বার্থের কথাই ভাবে। তাই শিলাবৃষ্টির দাপটে তামাক ক্ষেতটা নষ্ট হলেও সে তেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ে না। কারণ রহিমুদ্দি জানে এই ধ্বংসের পেছনে বৃহত্তর শুভবোধ' লুকিয়ে রয়েছে। আর সেই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে সে বলতে পেরেছে 'তাঁয় মালিক। তাঁর ত জল ঝড় রোইদ তাপ সব দ্যাওয়া লাগইবে। শিল পড়ি কতক মানুষের তামাকু নষ্ট হইল কিন্তুক সারা দ্যাশটার আউস ত বাঁচি গেল জল পায়া। এবার খোরাকির চেয়ে ব্যাকুল পড়ি গেইছে। আউস ভালো হইলে মানুষের কিছু আসান হইবে। মানুষ বাঁচিবে।' স্পষ্ট বক্তা রহিমুদ্দির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেয়ে থানার দারোগা পর্যন্ত হাকিমুদ্দির সঙ্গে তার পূর্বেকার কোন ক্রোধের কথা অনুমান করতে পারে। রহিমুদ্দি ইমানদার মানুষ। তাই নিজের মান ও হুঁশ সম্পর্কে সে সব সময় বেশ সচেতন। আল্লার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল সে। 'খোদার মেহেরবানীতে

সব মুশকিল আসান হয়া জাইবে। ...ইমান ঠিক থাকলে কোনদিন হাইর হয়ে না। কোনও ডর নাই মাও, ইমান মোর ঠিকে আছে।'

মন্মন্তর এসেছে। দরিদ্র কৃষক সমাজ দুরবস্থার শিকার হয়েছে। জীবনবোধের তাগিদে সবাই ধান 'করজ' চায়। অন্যদিকে হাকিমুদ্দি অবস্থাপন্ন গৃহস্ত। সে সাধারণ প্রযাদের বঞ্চিত করে সহরুল্যা ও কুদরতের সাহায্যে রাতের অন্ধকারে ধানের গোলা খালি করে দিতে চায়। শ্রীমন্তের মত সাধারণ কৃষকেরা সহানুভূতির পরিচয় রেখে নিজেদের ধান-চাল পর্যন্ত দিয়ে অপরকে সাহায্য করেছে। মন্বন্তর রহিমুদ্দির ঘরেও প্রবেশ করে। মায়ের চিকিৎসার জন্য ঘরের ধান প্রতিপালিত বলদ জোড়াও বিক্রি করতে পিছপা হয়নি রহিমুদ্দি। তবু শেষ রক্ষা করতে পারেনি রহিমুদ্দি। আকাল এইসব কৃষক হিন্দু-মুসলমানের কপালে চিন্তার বলিরেখাকে প্রকট করেছে। 'মানুষ যেখানে নগদে মরে'- সেখানে দলবদ্ধ ভাবে কেবলমাত্র কয়েকজন ধনীর বাড়ি আক্রমন করে যে বেশিদিন চলবে না- একথা রহিমুদ্দিই সবাইকে বোঝায়। সে আশাবাদী। তাই সবাইকে আশ্বস্ত করে বলে যে মাঠের উঠতে তো আর দেরি নেই। পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সে অন্যান্যদের সচেতন করে। বারবার তাদের বিপথগামী হতে বারণও করে সে। কলকাতার পথে যে সব লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে তারা কেন শহরবাসীর খাবার-দাবার লুণ্ঠন করে না। কার্যত রহিমুদ্দি এই প্রসঙ্গে দুঃখী মানুষদের নেতৃত্বদানের কেন্দ্রে চলে আসে। তবু কেন তারা লুট করে না?- এই প্রশ্ন তাকে আবিষ্ট করে ফেলে। মোর মত মানুষ একটাও কি নাই ঐ উপাসী গুলোর দলে? নিশ্চয়ই আছে। তারা লুট করে না খালি একটা কথা ভাবিয়া। বাপজান কইত- মান আর হুঁশ এই দুইটা থাকিলে মানুষ, মানুষ হয়। মানুষের মনটা কি? না তারা পশু নয়। পশুগুলোর নিজের ছাড়া কোনোয় দায় নাই। কাড়াকাড়ি মারামারি করি খালি নিজের প্যাটটা ভইরলে হইল। মানুষ কাচ্চা-বাচ্চা, বাপ- মাও, ভাই-বোন- পাড়া- পড়শ- ঘড়-বাড়ি সব কায়েম রাইখতে খাটে, কাম করে। ওই সব গুলার কথা ভাবিয়া তারা লুট দাঙ্গা কইরবার জায় না।' মামুদ মনে করে ঐসব মানুষগুলো ভয়ের কারণে লুট করে না। কিন্তু রহিমুদ্দি জানে যে তারা ভয়ের জন্য লুট করেনা এমন নয়, লুট করে আর

জাই হোক, সারা বছর খাদ্যের সংস্থান হবার নয়। নিজের মান সম্পর্কে রহিমুদ্দি যেমন পূর্ণ সচেতন তেমনি তার সঙ্গী অমিজ মামুদ এদের প্রতি সম্মান ধরে রাখার প্রস্তাব রাখে। রহিমুদ্দি এইসব মন্তব্য বিচারে অনেক বেশি প্রাঞ্জল। সে নিজেও পূর্ণ সচেতন যে মান রক্ষার কারণে তাকে অনেক ক্লেশ পেতে হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে। একসময় সে নিজ মুখেই স্বীকার করেছে একথা। একথা নিজের মুখে বলার অর্থ কিন্তু এই নয় যে- সে আত্মঅহমিকা প্রকাশ করছে। সে একাজ করছে জাতে শত দুঃখেও যেন তমুজ, মামুদ- এরা বিপথগামী না হয়। ‘এই হুঁসে মাইনষেক ঠ্যাকায়। মানের জন্য দুঃখ পায়াও সে মানুষ মান ছাড়ে না। চোরাই মাল ঘরে রাখিয়া হাকিমুদ্দি মোক জ্যাল খাটাবার চাচ্ছিল। কাঁচা লোক দিয়া কাম করাইতে ফস্কি গ্যাল। উয়ার উপর মোর কি আন্দাজে রাগ বুঝেন ত? মরি গেলেও উয়ার খাই না। এই মান রাইখতে দুঃখ কি কম পাছি?’ রহিমুদ্দির এই সংলাপ কেবল অপরের মন জয় করার কথা নয়- এই মান রক্ষা করতে গিয়েই উদ্বোন্ধনে আত্মহত্যার পথে যেতেও বিন্দুমাত্র পিছপা হয়নি। তবু নিজের মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ন হতে দিতে চায়নি রহিমুদ্দি।

দিনযাপনের গ্লানি দূর করার উপায় ছিল হাকিমুদ্দিন বাড়িতে গিয়ে বাদী হিসেবে ফুলজানের অবস্থিতি। কিন্তু লঙ্গরখানায় নিজের আত্ম কিংবা স্ত্রী ফুলজান সে পাঠাতে চায়নি। ‘এক নিকিনারা দরিয়াত’ নিক্ষিপ্ত হয়েও সে হাকিমুদ্দির কাছে নিজের উন্নতশির নত করতে চাইনি। একসময় রহিমুদ্দি নিজের স্ত্রী ফুলজানেকে তালাকের ফরমানপত্র তুলে দিয়ে তার অন্ন সংস্থানের সুরাহা করে দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে ফুলজান। রহিমুদ্দির এই কর্মপন্থা প্রকারান্তরে তার স্বামীত্বকেই ব্যঙ্গ করে। তবু যেন সে কিছুতেই পিছপা হতে চায় না। তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল এইরকম ‘খাওয়াবার পারি নাই। কিন্তু মোরে জন্য তোর খাওয়া বন্ধ হচ্ছিল। তাত তোক ফারকৎ করি দিনেয়। কায়দা করে হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে বেকায়দায় ফেলতে চায়, কিন্তু কোন মতে রহিমুদ্দিকে তার আত্মপ্রত্যয় সরানো যাবে না। সবকিছুকে রহিমুদ্দি বুদ্ধির জোরে বাঁচাতে চায়। পরবর্তী অংকে চিন্তা রহিমুদ্দির শরীরে প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে পুত্র বসিরও অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে থেকে অম্লপিত্ত ও আমাশয় রোগে জীর্ণদশা।

যুদ্ধের বিভীষিকায় বাযার থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ উধাও হয়ে গেছে। তাই বসিরও প্রয়োজনীয় ঔষধ পায় না। দেশের অন্য অনেক পরিবারের উপর দিয়েই মন্বন্তরের ঝড় বয়ে গেছে। ফলে অনেকেরই ঘর ভেঙেছে। জীবন ধারণের তাগিদে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করেছে মানুষকে। স্বামী বিক্রি করেছে নিজের স্ত্রীকে। অসহায় বাবা মা নিজের গর্ভজাত সন্তানকে বিক্রি করে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। সেখানে রহিমুদ্দির শরীরে প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে পুত্র বসিরও অনাহারে অর্ধাহারে থেকে থেকে অম্লপিত্ত ও আমাশয় রোগে জীর্ণদশা। যুদ্ধের বিভীষিকায় বাযার থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধও উধাও হয়ে গেছে। তাই বসিরও প্রয়োজনীয় ঔষধ পায় না। দেশের অন্য অনেক পরিবার-এর উপর দিয়েই মন্বন্তরের ঝড় বয়ে গেছে। ফলে অনেকরই ঘর ভেঙেছে। জীবন ধারণের তাগিদে মানুষ ক্রয় বিক্রয় করেছে মানুষকে। স্বামী বিক্রি করেছে নিজের স্ত্রীকে। অসহায় বাবা- মা নিজের গর্ভজাত সন্তানকে বিক্রি করে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। সেখানে রহিমুদ্দিতো কেবলমাত্র স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা করেছে মাত্র। কারণ ‘গাই বলদের চায়া ও মাইনষের দাম কম হইল হে? দুলুটা উদিনকা পাঁচে টাকাত ব্যাচেয়া দিছে তার কম হইল হে? দুলুটা উদিনকা পাঁচে টাকাত ব্যাচেয়া দিছে তার যুয়ান বৌটাক।’ এ ফলত, সহজে অনুমেয় যে স্ত্রীকে বিক্রি করে দুলু বাহ্যিক বিচারে যতটা অন্যায় গর্হিত কাজ করেছে; সে দিক থেকে রহিমুদ্দিও পরিস্থিতির শিকার হয়েও ঠিক ততটা অন্যায় কাজ করেছে বলে মনে হয় না।

ফুলজানকে তালাক দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠে এলে আমরা বলতে পারি যে রহিমুদ্দির ঘটনার উপর্যুপরি আকস্মিকতায় জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিল। নচেৎ তার মত বুদ্ধিমান আত্মসচেতন মানুষ এ কাজ করতে পারে না। হদীজ অমান্য করার কথা সে নিজেও ভাবতে পারে না। ‘হাদিজ অমান্য কইবার মুইও পারি না।’ ভাগ্যের সামান্য আনুকূল্য পেলে হয়তো রহিমুদ্দি এরকম ভয়ঙ্কর কাজটি করতো না। পত্নী প্রেমী স্বামী, এখন স্ত্রী সঙ্গবিহীন হয়ে অশান্ত উত্তেজিত হৃদয়ে মন্বন্তরের পথ পরিক্রমায় রত, অন্যদিকে স্নেহ বুভুক্ষু পিতৃ হৃদয়ও নিজের অক্ষমতার কারণে নিজেকে অপরাধী বোধ করেছে। ফলে

জীবনের প্রতি কেমন যেন এক ধরনের বিতৃষ্ণ মনোভাব দানা বেঁধে থাকতে পারে। স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত সংসার এখন বড়ই এলোমেলো। সে কারণে এক ধরনের বোধ তার অন্তর্গত চেতনায় হাতুড়ির আঘাত হেনেছে প্রতিনিয়ত। এই সময়কার একটি সংলাপ উদ্ধার করার লোভ সংবরন করা গেল না। ‘মোর জীউটা জ্বলি গেইছে ভাই- কইলজাটা কুকড়ী গেইছে। বাচ্চাটাকে মায়ের কাছে নিয়ে আসতে কতবার না কছি ‘বছির দুইটা মাস বাদে তোক নিয়া তোর মার কাছে ফিরিয়া আইসসো। ভাই-তালাক দিতে ফুলজান ডুকরী কান্দি উঠি কইলে, কি কসুরে মোক ছাড়লু’? মনটা মোর কয়া উঠলো ‘কসুরে তো তোর নয়। ফুলজান, কসুর হামার। হামি খসম হয়াতোক খাওয়া দিবার পারি নাই’- ওঃ হো- মুই মুসলমান। তালাক কি তা জানি, তার বাদে ফির কি তাও জানি, তার বাদে ফির কি তাও জানি, তবু, ক্যানে হামি অমর কাম কইন্যো! ক্যানে তাক কইনো ফুলজান আল্লার কিরা তোর ছৈল তোর থাকিল দুইটা মাস খালি দুইটা মাস-’। সুস্থ ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কে রহিমুদ্দির মধ্যে সামান্য অপরাধবোধ কাজ করেছে। হঠকারিতায় মেতে উঠে তার এহেন আচরণকে পাঠক ভালোভাবে নিতে পারে না। তার কৃত ভুলের জন্য ভুলের পরিপূর্ণ মাসুলও তাকে দিতে হয়েছে।

তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্য ঘটনা আবার ফিরে এসেছে পূর্বে পরিত্যক্ত রহিমুদ্দির ভিটে মাটিতে। এবার পুনরায় ফুলজানকে ফিরে পাবার পালা। কিন্তু তাতেও ধুরন্দর হাকিমুদ্দির অদৃশ্য হাত রয়েছে; তারই ভয় জুম্মার ইমান ও নিকা দিতে রাজি হয়নি। ফলত, অন্যত্র, দশলিয়ার ইমামকে ঠিক করতে হয়েছে। আশাবাদী রহিমুদ্দি, তাই আশায় বুক বেঁধে এখনো বেঁচে রয়েছে। অশান্ত মাতৃ হৃদয় ফুলজানের। তাই পুত্র বসিরের নাম ধরে ডেকে ওঠায় বসির উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অথচ পুত্র বসিরকে সামান্য চোখের দেখা দেখায় বিস্তর বাধা প্রদান করেছে হাকিমুদ্দি। পুনরায় পুত্র বসিরের অসুস্থতা বেড়ে জায়। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে রহিমুদ্দি। তার থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস মিশ্রিত একটি ছোট সংলাপ বেরিয়ে আসে। ‘কিনারায় আসিয়া মোর নাও বুঝি দরিয়ায় রাশিয়া ডুবেরে।’ ফুলজানকে ফিরে পাবার যে আয়োজন হয়েছে তাতে অবশ্য তৃতীয় পক্ষ-র অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আর তাই কানা ফকির তাদের সমস্যার

আজান করার মাঝে এসে পড়েছে। আচমকাই একটি বিশেষ মাত্রা পেয়ে জায় কানা ফকির।' সেখানেও হাকিমুদ্দির প্রভাব বর্তেছে, ফলে বারংবার বাধার সম্মুখীন হয়েছে রহিমুদ্দি। হাদিজ খেলাপের ভয় দেখিয়ে হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দিকে নাটকের শেষ দৃশ্যেও প্রতারিত করেছে। তার এহেন যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছে রহিমুদ্দি। 'তোমার হদীজধরি তুমি বেহেস্তে জান মুই খেলাপ কার জাহান্নামে থামো।'- অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো নাটকে রহিমুদ্দি কিন্তু কোনো রকম বলপ্রয়োগ করে হাদীজের খেলাফ করেনি। কিংবা জোরপূর্বক হাকিমুদ্দির বাড়ি থেকে ফুলজানকে নিয়ে এসে নিজের ঘরে পুনরায় অধিষ্ঠিত করেনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত রহিমুদ্দি একসময় জীবন পলাতক হয়ে জায়। একসময় জীবন পলাতক হয়ে যায়। এক সময় উদ্বোন্ধনে আত্মহননের পথে গিয়ে যেন বসিরও ফুলজানের, আত্মজ ও জননীর মধ্যেকার মিলনের পথটাকে কিছুটা বোধহয় মসৃণ করে গেল। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে ফুলজানের হাদিজের দোহাই দেবার ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রহিমুদ্দিকে বলতে শোনা গিয়েছিল 'নিকার নামে বেইজ্জত হইলে হদিজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাক বান্দির বাচ্চা বানাইলে হদিজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাক বাঁদীর বাচ্চা বানাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটা মুখের কথা থাকি বাঁচে, তার জীউটা দুই পায়ে থেৎ লাইলে হদীজ খেলাপ হয়না- না?'

এর অব্যবহিত পরে সংস্কৃতি মনস্ক রহিমুদ্দির তুলে নেয় তার সেই দিলরুবা যন্ত্রটি। মানসিক যন্ত্রণাযও চরম উত্তেজনার বসে বোধহয় দিলরুবার তারটি জোরের সঙ্গে মোচড়াতে মোচড়াতে তারটি সে এক সময় ছিড়ে ফেলে। আর তারটি ছিন্ন হলেই সে উন্মাদের মতো কেঁদে ওঠে। হতাশার সুরে তাকে বলতে শোনা গেল 'আল্লা! মোর যন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল! আল্লা! ও হো- হোঃ-' দিলরুবার তারের ছিন্ন অবস্থা প্রকারান্তরে তার জীবনদীপটি নির্বাপনের আগাম সংকেত বাহী হিসেবে নাটকে বিচার্য। পাঠক বুঝে নিতে পারেন যে এবার আচমকাই এমনই আঘাত নেমে আসবে তার জীবন গাড়ির উপর। কার্যত, নাটকের শেষ দৃশ্যে পাঠক সেই ঘটনারই সাক্ষী হয়। ছুটে গিয়ে কক্ষে রহিমুদ্দিকে এরপর প্রবেশ করতে এবং দ্বার বন্ধ

করতে সতর্ক পাঠক লক্ষ্য করেছিল। রুদ্ধদ্বার খুলে শ্রীমন্ত ঘরে প্রবেশ করে চিৎকার করে ওঠে একসময়। ততক্ষণে জাবতীয় সমস্যার সমাধান রহিমুদ্দি নিজেই করে রেখে গেছে।

মন্বন্তর কবলিত অনাহারী, মাতৃসঙ্গহীন আত্মজ বসিরের আর্তক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে রহিমুদ্দির। স্ত্রী ফুলজানের প্রতি নিবিড় প্রেম ঘন অনুভূতি বিস্মিত হবার মূলেও এই বাহ্যিক আঘাত। যেকোনো শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছ থেকে এমনই আচরণ অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। মুসলমান ধর্ম শাস্ত্রের কথা মান্য করে সে একসময় গ্রাম ত্যাগ করে শহরের বন্ধু মহিমের কাছে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করেছে। আবার ফিরে এসে ফুলজানকে ফিরিয়ে নিতে এসে হাদিজের বাধার কথা শুনলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সে। ‘তোমার হদীজ ধরি তুমি বেহেস্তে জান মুই খেলাপ করি জাহান্নামে জামো।’ পরস্পর বিরোধী ধর্মের চেতনা বিশ্বাসে সে উন্মত্ত হয়ে পড়ে। এসবই অসুস্থ শিশুকে বাঁচানোর ঐকান্তিক অভিপ্রায়। রহিমুদ্দির চরিত্রে জীবনের প্রথম পর্বের করা একটি স্বকৃত ভুল। ফুলজানকে আচমকাই তালাক দানের প্রসঙ্গই পরবর্তীকালে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দেয় তাকে। গ্রাম্য বধূ হিসেবে ফুলজানের নিরব চোখের চাহনি, সরল, অপাপবিদ্ধা নারীর কিছু করতে না পারার জন্য বেদনাবোধ, পরম নির্ভরতায় ভরা মুখ- এসবই প্রকারান্তরে স্বামী হিসেবে রহিমুদ্দিকে কঠিন ব্যঙ্গের তীব্র শেল বিদ্ধ করে বসে। তবে শেষ পর্যন্ত চিন্তা-চেতনায় বধিতে কর্মপন্থায় হাকিমুদ্দি চরম প্রতিদ্বন্দী হিসেবে আত্মবলিয়ান এক অসহায় পিতা এবং এক অসহায় স্বামীর পরাজয় পাঠক দর্শক শোক বিহ্বল ও ব্যথিত চিত্ত হয়ে পড়ে। এক পীড়িত দগ্ধ খাঁটি মানুষের অসহায়ের মতো করুণ আর্তি চিৎকার ভাষা পায় তার অবরুদ্ধ কণ্ঠে। ‘মোর জীউটা জ্বলি গেইছে ভাই- কইলজাটা কুকড়ি গেইছে। বাচ্চাটাকে মায়ের কাছ থাকি নিয়া আইসতে কতবার না কছি ‘বছির দুইটা মাস বাদে তোক নিয়া তোর মার কাছে ফিরিয়া আইসমো । ভাই- তালাক দিতে ফুলজান ডুকরি কান্দি উঠি কইলে , কি কসুরে মোক ছাড়লু’? মনটা মোর কয়া উঠল ‘কসুরে ত তোর নয়। ফুলজান, কসুর হামার। হামি খসম হয়া তোক খাওয়া দিবার পারি নাই’- ওঃ হো- মুই মুসলমান। তালাক কি তা

জানি, তার বাদে ফির কি তাও জানি, তবু ক্যানে হামি অমন কাম কইন্যো!' (তৃতীয় অঙ্ক/ প্রথম দৃশ্য)

মন্বন্তর কবলিত এক পিতা ও স্বামীর মনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনায় নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী অসামান্য চরিত্র নির্মাণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে রহিমুদ্দির চরিত্রে। রহিমুদ্দির আর্তনাদ যেন সমস্ত হৃদয়ে অনুরণিত হয় পাঠক নাটক নাটক কিংবা অভিনয় দর্শনের সময়। রহিমুদ্দির চরিত্র বিচার প্রসঙ্গ শেষ করা জায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি উক্তিতে শেষ টেনে- 'মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে বেশি প্রতারণা করে'

১২.৩ হাকিমুদ্দি চরিত্র বিশ্লেষণ

'ছেঁড়া তার' নাটকের পাঠ আমাদের হাতে যে প্রাথমিক তথ্যটি তুলে ধরে তা হল- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৩৫০ সালের মানব সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ জনিত মানব জীবনের উপর তার প্রভাব এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ নাট্যকার আপন কৃতিত্বের গুনে এক এবং অভিন্ন ভাবে নাটকে পরিবেশন করেছেন। দুটি ভিন্ন প্রসঙ্গকে অতি যত্নের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে প্রয়োজন হয়েছে হাকিমুদ্দিন বহুমাত্রিক চরিত্রের। নতুবা নাটকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তথা নায়কের বিপরীতে প্রতিনায়ক চরিত্রের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা পেত না হাকিমুদ্দি। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য ব্যতীত প্রায় সবকটি দৃশ্যে তার সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা জায়। এমনকি শারীরিক ভাবে কয়েকটি দৃশ্যের ঘটনা ধারায় সে উপস্থিত না থাকলেও তার শঠতা, ক্রুড়তা কিংবা কূটবুদ্ধি সক্রিয় রয়েছে। ফলে হয়তো নাট্য ঘটনা ধারায় এই হাকিমুদ্দি চরিত্র নতুন ডাইমেনশনে নির্মিত হয়েছে। মৌলবাদী শাসক, শোষক এবং মুসলমানি হাদিসের কঠোর বিধি নিয়মের প্রতিমন্ত্রী মূর্ত ও জান্তব প্রতীক হাকিমুদ্দি। ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে আকণ্ঠ ভোগলিপ্সা, প্রতিশোধ স্পৃহা এবং অর্ধ গৃধ্নতা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধ যেমন প্রতিটি মানুষের কাছে এক ভয়ঙ্কর ভীতির কারণ হয়েছে হয়ে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে ঠিক তেমনি হাকিমুদ্দির জান্তব বোধ যেমন প্রান্ত উত্তরবঙ্গের মুসলমান- হিন্দু কৃষকদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে তেমনি আপাতভাবে মুসলমান কৃষক রহিমুদ্দিও সামূহিক বিপর্যয়ের মূল কারণ হিসেবে

তাকে চিহ্নিত করা চলে। হাকিমুদ্দি চরিত্রের পরিকল্পনা, চরিত্রের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা এবং বিস্তার ও পরিণতি- এই সবই নাট্যকার তুলসীবাবুর বিশিষ্ট নাট্য ভাবনার প্রতীক বিষয় এবং নাট্যপরিণতি সর্বোপরি নাট্যকারের শিল্প চিন্তাকে সম্যকভাবে যদি আমরা উপলব্ধি করি, তাহলে দেখব যে হাকিমুদ্দি চরিত্রের উপস্থাপনা বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন।

বাংলার চরম আকালের পটভূমিতে এক অনাবৃত স্বচ্ছ আরশি 'ছেঁড়া তার'। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত বাংলার ক্ষয়িষ্ণু পঙ্গু বিপর্যস্ত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জোরদারের নির্মমতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে হাকিমুদ্দি। কেননা 'এই রকম মানুষ গুলোর মান নাই, কিন্তু লাভের হুঁশ আছে পুরা। ফায়দার গন্ধ পাইলে ঘসটি ঘসটি সব কামে যারা ইয়ারা জুটে – সরফরাজী করিয়া মজা করে। ইয়াবাই দুনিয়ার আগুন লাগেয়া দিলে।'

এই মন্তব্য যাদের সম্পর্কে শতাংশে প্রযোজ্য তাদের মধ্যে ছেঁড়া তার নাটকের হাকিমুদ্দি অন্যতম। এরা সামাজিক অনুশাসনের নামে সমাজের সামাজিক মাজুষদেরকে দুর্দশার চরমতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। অথচ নিজেরা কদর্যতার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতা ঢাকতে চেষ্টা করে এরা। তখন কিন্তু সামাজিক নিয়ম নীতি, অনুশাসন বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা করে না এরা। সেই রকম ভাবে হাকিমুদ্দিন অতীব দুষ্টমতি চরিত্রের অধিকারী। রহিমুদ্দির গ্রামের সে মাতব্বর- এই তার সামাজিক পরিচয়। এই সামাজিক পরিচয়কে অবলম্বন করে মূলত সে যেমন গ্রামের অন্যান্যদের রক্তচক্ষুর মধ্যে রাখে ঠিক তেমনভাবে রহিমুদ্দির মত শিক্ষিত চোখুসে চরিত্রের মানুষকে নিজের করতলগত করতে না পারায়, ভিন্নপথ অবলম্বন করে তাকে সাময়িক বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে সে। নাট্যঘটনা মন্বন্তর ও যুদ্ধকেন্দ্রিক হলেও তা মূলত রহিমুদ্দি- ফুলনাজের সংসারকে কেন্দ্র করে ঘুর্নায়মান। ঘটনাধারার কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন রহিমুদ্দি এসে পড়ে, ঠিক তার বিপরীতে হাকিমুদ্দিও এসে পড়ে। সে কারণে নাটকের প্রতিনায়ক চরিত্রের মর্যাদাপায় হাকিমুদ্দি। ধর্মপ্রাণতার

আড়ালে ধন অপহরণের ধূর্ততার মূর্তপ্রতীক হাকিমুদ্দি। এই হাকিমুদ্দিকে তির্যক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মতো ক্ষমতা রাখে বুদ্ধিমান শিক্ষিত চাষী রহিমুদ্দি। প্রকারান্তরে রহিমুদ্দিই জোতদার হাকিমুদ্দির চরম প্রতিস্পর্দ্ধী। যুদ্ধপরবর্তী কালপ্রেক্ষিতে গ্রামবাংলায় ঘনিয়ে আসা মন্বন্তর মহামারী আর অর্থনৈতিক দুর্বলতা এসবই হাকিমুদ্দির কাছে এনে দেয় মুসলমান চাষি, প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। গ্রামের জোতদার মাতব্বর ক্ষমতাবান হাকিমুদ্দির হাত শহর পর্যন্ত বিস্তৃত কেবল নয়; শাসনব্যবস্থার ও আরক্ষা বাহিনীর বড়কর্তা পর্যন্ত তার ক্ষমতা প্রসারিত। তাই জাপানি আক্রমণের ভয়ে, যুদ্ধের চাঁদা আদায়ের দায় তার উপর বর্তেছে। তা অর্পণ করেছে শহরের হাকিম। যুদ্ধের চাঁদাকে সে রাজার মাঙ্গন বলে চিহ্নিত করে অশিক্ষিত গ্রাম্য হিন্দু মুসলমান প্রযাদের কাছে। একে রোগ ভোগ, অনাহার, অর্ধাহার, এসব নিয়ে বিপর্যস্ত জনজীবন তাই আবার রাজার মাঙ্গন-এর ভয়ে কিছুটা আতঙ্ক গ্রস্ত হয়ে পড়ে সাধারণ গরিব প্রজারা। তাদের উপর এই চাঁদা ‘গোদের উপর বিষফোঁড়া’-র মতো মনে হয়। এরকম সময়ে সুযোগ-সন্ধানী হাকিমুদ্দিন সাধারণ মানুষদের চাঁদার ভয় নেই- এই কথা বলে আশ্বস্ত করতে চাইলেও কার্যত তার চরিত্র কিন্তু তা প্রমাণ করে না। রহিমুদ্দির উপর আক্রোশ বশত অতিরিক্ত চাঁদা চাপানোর ঘটনায় তার চরিত্রের স্বরূপকে উন্মোচিত করে দেয়। কূটবুদ্ধির অধিকারী হাকিমুদ্দিকে শঠতা , কাপট্য, মিথ্যাচার, সন্দিগ্ধতা- ইত্যাদি বিশেষণেরও অতিরিক্ত আরো কিছু বিশেষন করে দেওয়া যায়। কেননা জান্তবতার প্রবৃত্তি যার নিরপরাধ মানুষের ধ্বংসের কারণ যে হয় তাকে ওই সব বিশেষনের দ্বারা তুলে ধরা যায় না । সে কুসীদজীবি, প্রতারক। মাতব্বর বলেই সে অন্যকে সহজে প্রতারিত করতে পারে। প্রতারণা করে সে দীন দুঃখী কৃষকদের সর্বনাশের কারণ হয়। অন্যের সামান্য দুর্বলতার সুযোগে অপরের ক্ষেত জমি অক্লেশে নিজের কুক্ষিগত করে নেয়। সমাজের শোষক শ্রেণির জীবন্ত প্রতিভূ হিসেবে হাকিমুদ্দিকে চিহ্নিত করা যায়।

সে ক্ষমতাবান মানুষ; তায় আবার শাসন ব্যবস্থার কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে তার যোগসাজশ রয়েছে। সে কারণে নিজেকে সে একজন কেউকেটা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি বলে মনে

করে। তাই অপরের কোন ক্ষতি তার কাছে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। অপরের ন্যায় কাজ করলেও, নিয়ম-নীতি মেনে কাজ করলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সেকারণে সংস্কৃতিবান শিক্ষিত রহিমুদ্দির তার সৌখিন ফুলের বাগান ধ্বংস করায় হাকিমুদ্দির প্রতিপালিত গাভীকে খোয়াড়ে দেওয়ার মতো ঘটনাকে হাকিমুদ্দি মনের দিক থেকে আদৌ মেনে নিতে পারে না। সামান্য ব্যক্তিস্বার্থ বিঘ্নিত হলে হাকিমুদ্দির ক্রোধ বোনের মাংসাশী প্রাণীকেও হার মানায়। যে মানুষটিকে একসময় ভালো বলে স্বীকার করে; স্বার্থের কারণে পরক্ষণেই সেই মানুষটি আবার 'শয়তানে' পরিণত হয়ে জায়। তাছাড়া, সে অন্যের ভালো কোনো কিছুকেই সহ্য করতে পারে না- সে কারণে রহিমুদ্দির শহর থেকে দিলরুবা, স্ত্রী ফুলজানের শাড়ী, জুতো কিংবা পুত্র বসিরের জন্য ভালো জামা প্যান্ট এসব নিয়ে আমাকে সহ্য করতে পারে না। রহিমুদ্দির পিতার নেওয়া ঋণের টাকার কথা তুলে সে রহিমুদ্দিকে আঘাত করে। তাই ঋণের জন্য জমি জমা আত্মসাৎ করাটা তার কাছে নতুন কোন ব্যাপার নয়। আর সেজন্য হাকিমুদ্দি বেশ কূটবুদ্ধির অধিকারী। তাই কেউ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে এলে সে টাকা না নিয়ে, জমি অধিগ্রহণের লোভে তাকে ধর্ম করতে জাবার পন্থা দেখায়। মুসলমান হলে তাকে পবিত্র 'হজ' করে আসতে বলে। মুসলমান হয়ে যে অন্যজনকে হাদিজ ভঙ্গের ভয় দেখায়। কিন্তু মুসলমান হয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করে, হতদরিদ্র প্রযাদের শাসন করায় বিন্দুমাত্র অপরাধবোধ জাগে না; কিংবা সুদ গ্রহন বিষয়টি তার কাছে কোনো রকম দূষণীয় হয় না। এমনই তার অনুভূতি ও হাদীজ প্রীতি। পরপীড়ন তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সে কারণে হাকিমুদ্দির ঘাতক আধিয়ার প্রযারা তার শয়তানি, কূটবুদ্ধির বেযায় দৌড়ে দেখে কবিতা ছড়া লেখে, আর মুখে মুখে সে সংবাদ চাউরত হয়ে যায়। এ তথ্য হাকিমুদ্দির অজানা থাকার কথা নয়; কিংবা তার প্রতিদ্বন্দ্বি রহিমুদ্দির নয়। সেকারণে কথার পিঠে কথা বেড়ে যাওয়ায় একসময় রহিমুদ্দি সেই ছড়ার কিছু অংশ মুখস্ত বলে যায়। সেই শ্লোক বা ছড়া ছিল এরকম-

"হাকিমুদ্দির বুদ্ধি শুদ্ধি চুষি খাওয়ার কায়দাতে
রোজা নমাজ সবই আছে মনটা খালি ফায়দাতে।।"

এই দুই চরণের শ্লোক হাকিমুদ্দির চরিত্রের মধ্যেকার সত্যিকারের শোষক ব্যক্তিটিকে সবার সামনে তুলে ধরে। তাছাড়া হাকিমুদ্দির দেওয়া ঋণের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে রহিমুদ্দির মত গরীব চাষী অথচ বুদ্ধিমান ছাত্রের লেখাপড়া বন্ধ হয়েছিল। এ তথ্য আমাদের বিস্মিত হলে চলবে না। পরিপূর্ণ এক শ্রেণীর খল চরিত্রের দাবিদার হাকিমুদ্দি। এই দিকটির প্রতিও আলোকপাত করেছে রহিমুদ্দি।' হাকিমও যদি ক্যাল হওয়া গেল হয়। কিন্তুক হাকিমুদ্দি হবার পাইন্যো না হয় কিছুতে।' এই শ্লেষ- ব্যঙ্গটি প্রকারান্তরে হাকিমুদ্দি প্রতি একটি নির্মম জ্ঞানাঞ্জন শলাকা বিশেষ। একই গ্রামে থাকার সুবাদে রহিমুদ্দি জোতদার হাকিমুদ্দি চরিত্র প্রকৃতি এবং তার শোষণের দিকগুলির সঙ্গে ভালো পরিচয় রাখে। 'হামরা যতই সহ্য করি ততই চোট বাড়ে।" হাকিমুদ্দি মানুষটি কোনো ভাবেই সহজ মানুষ নয়। অতি সহজ মানুষ হিসেবে নিজেকে জাহির করলেও শয়তান প্রকৃতির মানুষ সে। স্বার্থান্বেষী প্রকৃতির মানুষ বলেই 'বুদ্ধি উয়াব জবের চোখা।'

হাকিমুদ্দির প্রতিটি স্বার্থান্বেষী পদক্ষেপ বেশ ভালোভাবেই বোঝে রহিমুদ্দি। বয়সের ভারে হাকিমুদ্দির মত শ্রেণীশত্রুর সম্যক পরিচয় ভাব তার অজানা নয়। তাই হাকিমুদ্দির চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যকে সে সবার সামনে অক্লেশে তুলে আনে। 'না হইলে আল্লাতালাক ফাঁকি দিবার চায়! এতই রোজ নমাজ তসবি আর উতি খালি মিছা কথা আর মানুষ ঠকান বুদ্ধি।'

ব্যক্তিস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দির পিছনে লেগেছে। জাতন যন্ত্রের পেছনে উদ্যত হয়েছে হাকিমুদ্দির মিথ্যা চক্রান্ত এবং অসত্য কথন অহেতুকভাবে হাকিমুদ্দি যুদ্ধের চাঁদা বাবদ বেশী পরিমাণ অর্থ ধার্য করেছে। অথচ সেই পরিমাণ চাঁদা দেবার সামর্থ্য নেই। পূর্ব শত্রুতার কথা মনে রেখে রহিমুদ্দিকে শিক্ষা দেওয়ায় এইরকম মানুষের আচরণ মূল কারণ। তাই এসব হাকিমুদ্দি নিম্ন মানসিকতার পরিচায়ক। এছাড়া হাকিমুদ্দির দুর্দমনীয় লালসার পরিচয় আমরা জানতে পারি রহিমুদ্দির একটি সংলাপ থেকে। 'মস্ত বড় কাছারি ঘর; তিন তিনটা ধানের গোলা। অন্দরে দুইতলা টিনের ঘরে চাইর কামরায় চাইর বিবি। তার উপর চাকা মুখে পাকা দাড়ি মেহেদী

রঙিন। ফির তারও উপর আছে হাতে তসবি আর মুখে আল্লাহর নাম। মানুষগুলা যে উয়ারে কাছে আসি মরে।' প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদই মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল ও উদ্দাম জীবন জাপনে ব্যপৃত করে; তেমনি আবার তার অর্থলিপ্সাকে দিনে দিনে মাত্রাতিরিক্ত করে তোলে। যেখানে রহিমুদ্দির মত অন্যান্য কৃষকদের দিন গুজরান প্রতি পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সেখানে হাকিমুদ্দি শোষণ হয়ে ওঠে মাত্রাতিরিক্ত। রহিমুদ্দির আর একটি সংলাপ হাকিমুদ্দির চরিত্রের পর্দাকে উন্মোচিত করে দেয়। 'উয়ার চতুর পাকে কাম চোট্টা চাকর। নিজ হাতে অঁয় কিছুই করে না। উয়ারে এত টাকা আইস ক্যামন করি? উষার টাকা ভাই অন্ধকারে আইসে যায়; আলোৎ চলে না।' কার্যসিদ্ধির সবকটি বক্রপন্থা তার জানা রয়েছে। ধার্মিক মুসলমান হিসেবে ভান করে কিন্তু সে ধর্মপ্রাণ মুসলিম নয়। ধর্ম কিংবা হাদিজ- এর দোহাই দিয়ে সে নিজেও স্বার্থসিদ্ধি করতে সক্ষম। এছাড়া প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নৌকার চুরির ঘটনাকে মিথ্যা সাজানো ঘটনায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মতো ঘটনা দুষ্টবুদ্ধি হাকিমুদ্দিরই চাল। পুরোনো ক্রোধকে প্রশমিত করার এই হীনপন্থা- একথা সচেতন পাঠক পাঠিকার কাছে অজানা থাকে না। এখানেই তাঁর যাবতীয় অপকীর্তির সমাপ্তি নয়। চুরি ডাকাতির ঘটনায় পুলিশের কাছে প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে রহিমুদ্দির হোতা। তাই সাজানো মিথ্যা কথা প্রসঙ্গে সে বলে 'দিনের গতিকে বেআন্দাজ খারাপ হয়া গেলো। সেদিনও হামরা দেখছি সব নেংটি পিঁধে চাষবাস কচ্ছিল। বেটি ছাওয়ালগুলা ছ্যাওটা পিঁধি কাম- কাজ কচ্ছিল। এলায় সব পিরাণ গায়ে দেয়, হাফ প্যান্ট পড়ে বৌ বেটিক শাড়ি পিঁধায়। কাজে চুরি ডাকাতি না কইরলে চলে কিসে?' অনুসন্ধানকারী পুলিশ রহিমের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেও হাকিমুদ্দি যেকোনো ভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে তৎপর থেকেছে। রহিমুদ্দির সম্পর্কে কুদরতের কাছে হাকিমুদ্দিন বলেছে 'মোর সাথে লাগার ফল'। অর্থাৎ স্বার্থান্ধ মানুষ রহিমুদ্দিকে ছলে কৌশলে জেলে দিতে চেয়েছিল। একসময় হাকিমুদ্দির নিযুক্ত কুকরাই যাবতীয় কর্মের মূল। হাদিমুদ্দির ফন্দি প্রকাশিত হওয়ার ভয়ও পাচ্ছিল। তাই কুদরতের কাছে একসময় সে স্বীকারও করেছে যে 'ওই কুকরা শালায় হামাক ফাঁসাচ্ছিল।' অথচ ঐ কুকরাই এখন জেলের অভ্যন্তরে বন্দী। তার জন্য

হাকিমুদ্দ বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন করে না; কিংবা উপার্জনশীল ছেলে জেলে বন্দী থাকায় তার পাশে আর্থিক সাহায্য নিয়ে উপস্থিত হয় না হাকিমুদ্দি। অথচ এই কাজ করার জন্য টাকার বিনিময়ে হাকিমুদ্দি অন্যান্যদের মত কুকরাকে নিযুক্ত করেছিল। চিরঅভাবী মানুষ কুকরা তার কর্তব্য করেও প্রাপ্য টাকা একপ্রকার অর্থে গচ্ছিত রেখেছিল, এ- তথ্য আমরা তার পিতা শিয়ালুর মুখ থেকে অবগত হয়েছি। অথচ হাকিমুদ্দি সেই টাকা যথাসময়ে দিতে অস্বীকার করেছে। ফলে হাকিমুদ্দি চরিত্রের অন্য একটি দিক উন্মোচিত হয়। সহজে প্রমাণিত হয় যে- হাকিমুদ্দি দুর্নীতিপরায়ণ, প্রতারকও বটে। মিথ্যাবাদীও সে। তাই সে অক্লেশে নাটকে একের পর এক মিথ্যাচার করে গেছে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির কথা মাথায় রেখে।

অভিসন্ধিমূলক কাজকর্মে হাকিমুদ্দির জুড়ি মেলা ভার; মন্বন্তর তীব্র আকার নিয়েছে। চারদিকে অন্নাভাবজনিত দুরবস্থা দেখা দিয়েছে। তাই নতুন ফন্দি বের করেছে হাকিমুদ্দি। জাতে এই দুঃসময়ে বেশি লাভবান হওয়া যায়। নিজের গচ্ছিত ধন সম্পর্কে তাই সে পূর্ণ সচেতন। কুদরতকে সে নিয়োগ করেছে জাতে তার গ্রামের যুবকরা ধনীর বাড়ি আক্রমণ করে অক্লেশে লুটতরাজ চালায়; আর এই জাতীয় কর্মে আখেরে লাভবান হবে হাকিমুদ্দিই। নিজেকে সে গণ্যমান্য ব্যক্তি বলেই মনে করে। অথচ মানের কিছুমাত্র তার চরিত্রে অবশিষ্ট নেই। গোপনে ধান রাখার খবর যাবে জানাজানি হয়ে যাবে কোনোভাবে- এইরকম আশঙ্কায় সে বলে ‘রাখি কোঠে’? কেউ ফির কয়া দিলে বদনাম হইবে যে।’ এই অংশে হাকিমুদ্দিন যেমন পূর্ণলোভী স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ, ঠিক তেমনি সে সন্ধিগ্ধ চিত্তের অধিকারী। তাই সে সবাইকে সন্দেহের চোখে রাখে, তেমনি সে তার কু-কর্মের সহচর সহরূল্যা, কুদরতকে নিয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে পারে না। অথচ সহরূল্যা কিংবা কুদরৎ- এরা কেউই একে অপরের নামে সন্দেহ পরায়ণ নয়। ‘হামরা বেইমানি কইরবার নই।’ এই উক্তি প্রকারান্তরে হাকিমুদ্দিকেই তীরবিদ্ধ করে। সুযোগ-সন্ধানী বলেই দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে গরিব মানুষদের দুরবস্থার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়। ধান করজ দিতে চায়। কারণ ‘করজ দ্যাওয়াটায় ভাল।’ খাতগুলাক কম এ সালের বাজার দামের মত টাকার ধান হামি আর সাল চাই। আচ্ছা আকাল বলি সুদ

মাপ দিয়া দেমো। বুঝেন নাই? সরকার থাকি নিলে দিবে ১০ টাকা মণ, খাতকওয়ালার কাছে ফেরত পামো ২০ টাকা ধান করা। নিজের লোকের হাতে ওজনের পাল্লা তাতেও কিছু লাভ থাকি যাইবে।' ছদ্ম ভালো মানুষীর আড়ালে হাকিমুদ্দি একজন প্রচ্ছন্ন শয়তান। ভালো মানুষের মতো তার ব্যবহার তো মুখোশ মাত্র। তার নিজস্ব উক্তিই-এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ দাখিল করে। হাকিম চরিত্র প্রসঙ্গে স্বরচিত কুকরার পিতা শিয়ালুর একটি উক্তি স্মরণীয়। 'তোমার মতো শয়তান মানুষের শয়তানি থাকিয়া, মাইনষের যাত শ্বাস আর যত চৌউখের পানি পড়ে তার হিসাব যদি না হয় ত' দুনিয়া থাকি খোদার নাম উঠে জাইবে- খোদার নাম উঠে জাইবে-।' হাকিমুদ্দি চরিত্রের সত্য দিক উদঘাটনের দায় এভাবেই শিয়ালু নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তি যেমন কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, কোন কোন অপরাধী ব্যক্তি যেমন নিজের প্রতিচ্ছবিকে প্রতি মুহূর্তে ভয় পায়, তেমনি হাকিমুদ্দিও সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েই থাকে। কারণ, দুঃখি প্রজাদের সে যেমন তাদের জমিজমা থেকে বঞ্চিত করেছে, তেমনি বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন সময়ে পরিপূর্ণ মাত্রায় সে প্রভাবিতও করেছে। তাই সবসময় হাকিমুদ্দি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে থাকে। গ্রামে নিত্যনতুন ব্যক্তিকে দেখে সেকারণেই সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

রহিমুদ্দি গ্রামবাসীদের নিয়ে শহরে যেতে চায় হতদরিদ্র নিরন্ন মানুষদের আহারের সংস্থান করার উদ্দেশ্যে। সে সরকারের কাছে সবাইকে নিয়ে আবেদন করবে লঙ্গরখানার জন্য। এই সংবাদ কোন ভাবে কারোর দ্বারা হাকিমুদ্দির কানে পৌঁছে যায়। তাই হাকিমুদ্দি গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার যাবতীয় কৃতিত্ব দাবি করার জন্য কুকর্মের অপর সহযোগী প্রেসিডেন্টকে নিয়ে উপরওয়ালার কাছ থেকে আগেভাগে অনুমতি নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে লঙ্গরখানা খুলে দেয়। একাজ তার সাধুতার পরিচায়ক নয়, কারণ এখানেও সে লাভের আখের কষে বসে আছে। সরকারের বরাদ্দ চালডাল নিজে আত্মসাৎ করে সে আর বড়লোক হতে চায়। প্রকারান্তরে লঙ্গরখানা খোলার যাবতীয় কৃতিত্বের দাবীদার হিসেবে নিজেকে অক্লেশে প্রতিপন্ন করবে সে। লুটপাঠ গোলমালের খবর হয়তো আর পাওয়া যাবে না অন্নসংস্থান হলে- এটা আশার কথা। এতেও

হাকিমুদ্দি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সে খোঁজে তার লাভের রাস্তা। ‘দুই নম্বর হইল লঙ্গরখানা হইলে তোমার হাতে চাউল টাউল থাকিবে, সঙ্গে মুঁইও আঁছো। সবারে কিছু কিছু হইবে। তিন নম্বর, তুমি কইবেন হাকিমুদ্দি বহুঁৎ কাঁদাকাটি করি দরবার করিয়া গাঁয়ের মানুষ বাঁচাইতে লঙ্গড়খানা করাইলে আর হামি কমো আসলে হামার প্রেসিডেন্ট সাহেবের কথা ঠেলার সাধ্য হাকিমেরও নাই।’ স্বার্থের কাছে হাকিমুদ্দি সামাজিক ন্যায় নীতি কোন কিছুকেই প্রশ্রয় দেয় না। এই রকমই তার চরিত্রের ধাত- ঋত। যুদ্ধের বাজারে সরকার ধান সংগ্রহে নামলে তার-ই ক্ষতি। ন্যায্য দামের চেয়ে বেশী টাকা সে পাবে না। জনসাধারণ সরকারী লঙ্গরখানায় মুফুতে খাবার পেলে আর হটকারী কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে মাথাব্যাথা করবে না এবং হাকিমুদ্দি, প্রেসিডেন্টের মতো ধনী লোকের গোলজাত ধানও অটুট, অক্ষত থেকে যাবে- এটও হাকিমুদ্দির কাছে আশার আলো বয়ে নিয়ে আসে। জনগণকে ক্রোধোন্মত্ত করার মতো দুষ্ট চক্রান্তের সেই মূল হোতা। হয়তো গ্রামবাসীরা লুঠতরাজের পথে গিয়ে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাইতো না। কিন্তু হাকিমুদ্দিই তাদেরকে প্ররোচিত করে লোক লাগিয়ে। গ্রামের লোককে উত্তপ্ত করার পেছনে সে যথেষ্ট দুরভিসন্ধি রাখে। দুর্ভিক্ষের দিনে গ্রামবাসীরা তার গলা লুঠ করলে হয়তো শূন্য হাতে ভগ্ন মনোরথ হয়েই ফিরে যাবে। কারণ সে আগেভাগেই দান অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে। গ্রামবাসীরা হয়তো এই কাজে পেতো একেবারে শূন্য গোলা, কিন্তু সরকারকে ফাঁকি দেওয়া যেত এই রাস্তায়। কূট অভিসন্ধিপরায়ণ চরিত্র হিসেবে সে ‘নবান্ন’ নাটকের জোতদার- জমিদার আড়তদার- এদেরেকে সমান হারে মানাতে পারে। এই জাতীয় মানবতার শত্রু গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী চরিত্রের জুড়ি মেলা বড়ই ভার। রহিমের কারণে তার সে কৌশল ব্যর্থ হলে সে দয়ার অবতারের খোলস পরে অভুক্ত গ্রামবাসীদের যে শর্তে ধান কর্জ দেওয়ায় কড়ার করল, তা বস্তুত নির্মম প্রতারণা ও অমানবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

সরকারী নিয়ম মেনে লঙ্গরখানায় সবার খাবার প্রাপ্তিস্থান। অথচ সেই লঙ্গরখানায় রহিমুদ্দির আত্মজ বসির এবং বসির এবং বিবি ফুলজানের খাবার মেলেনা। হাকিমুদ্দি অন্যায়ভাবে তার স্ত্রী ফুলজান এবং অভুক্ত বসিরকে নির্মমভাবে লঙ্গরখানার খাবার

থেকে বঞ্চিত করে। এখানেও হাকিমুদ্দির নির্মম প্রতিবিধিৎসার উন্মাদনা। এছাড়া, ফুলজানের কাছে এসে ফুলজানকে স্বতন্ত্রভাবে বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে খাবার খেতে বলায় তার নিচতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তার নারীমাংস লোলুপ দৃষ্টি ও ব্যভিচারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও দর্শক পাঠক অনুধাবন করতে পারে। নাট্য ঘটনা এর পরেই চরম climax – এ উপনীত হয়েছে। রহিমুদ্দির বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে, সে হারিয়ে ফেলে স্ত্রী ফুলজানের প্রতি দাম্পত্য প্রেম। উন্মত্ত দিশেহারা রহিমুদ্দি ফুলজানকে তালাকের ফরমানপত্র তুলে দেয়। ঘটনাধারা ক্রম অগ্রসরমান হয়েছে। এর মধ্যে রহিমুদ্দিরও নিজের বাড়িতে ফিরেছে। পুনরায় ফুলজানকে রহিমুদ্দি ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে। কারণ মন্বন্তর কিছুটা অপসৃত হয়েছে। কিন্তু এখানেও পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে হাকিমুদ্দি। যুবতী ফুলজানকে সে নিজের কুক্ষিগত করতে চায়। তার নারীশরীর লোলুপতার প্রমাণ দেয় কানা ফকিরের একটি ছোট সংলাপ। ‘বিবি হইবে বুঝি? তাতে খোরাক দিয়া পোষ মানায়। দ্যাওয়ানী, তোমার মুখের গরাস মোরে হইল যে। হয় না ক্যানে একেটা রাইত।’ ফুলজানকে রহিমুদ্দি অসুস্থ ছেলের সেবার জন্য বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে দেওয়ানি হাকিমুদ্দি পরওয়ানা জারি করে, অথচ অপরের স্ত্রীকে নিজের ঘরে জোরপূর্বক আটকে রাখায় মুসলমানি হাদীজের খেলাফ হয় না- এমনই অকাট্য যুক্তি তুলে ধরে হাকিমুদ্দি।

নিজের হস্তগত প্রায় ফুলজান বেহাত হয়ে জাবার উপক্রম হয়। রহিমের সঙ্গী- সাথীরা কানা ফকিরের সঙ্গে নিকা দিয়ে পুনরায় রহিমুদ্দির গৃহে ফুলজানকে ফিরিয়ে দিতে সমবেতভাবে চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও বাধ সেধেছে হাকিমুদ্দি। তার এহেন আচরণ নারী লোলুপতারই নামান্তর। শিকার হাত ফসকে চলে যাবে- এই আশঙ্কায় হাকিমুদ্দি অধীর হয়ে পড়ে। আবার ধর্মের কথা তুলে কানা ফকির কে সে বলে,- ‘খোদার রাও তোক শুনাই। ফকির হইয়া বড়ায় চাল্লাক হচ্ছিস না? নিকা কইরবার সল্লা কচ্ছিস? যাঁয় এই দিন দুনিয়ার মালিক, যাঁর সব দেখে সব বুঝে তাক তুই ফাঁকি দিবার চাইস’? মনে পড়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের যার রাজতন্ত্রের কথা এবং পোপের আচরণের কথা। যারা ধর্মের নামে মানুষদেরকে প্রতারিত করত। যারা নিজেদেরকে ভগবানের প্রেরিত

দূত কিংবা প্রতিনিধি বলে মনে করত। আর ইন্দালজেন্স বা মার্জনা পত্র তুলে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিব্রত করতো। ঠিক একইভাবে হাকিমুদ্দিও যেন নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত বলে মনে করে। তাই সে বলেছে 'খোদার রাও তোক শুনাই'।

জীবন্ত দানব প্রবৃত্তির অধিকারী হাকিমুদ্দি। গোটা নাটকে তার বিভিন্ন জান্তব লালাসার ছাপ স্পষ্ট। হতদরিদ্র কৃষকের জমি দখল থেকে শরীরের আপাত সুখী দাম্পত্য জীবন ধ্বংসের মুলেও সে। সর্বত্রই তার মুরুব্বিয়ানার পরিচয় রয়েছে। নৌকা থেকে চুরির মামলায় সেই প্রথমবার মাত্র তার পরাজয়ের দৃশ্য আমরা দেখি। এরপর অব্যাহত গতিতে চলেছে তারই বিজয় অভিজান। কিন্তু প্রতিটি শুরুরও তো কোথাও না কোথাও শেষ থাকেই। সে কারণে নাটকের শেষ দৃশ্যে মাতব্বর হাকিমুদ্দিরও পরাভব পরাজয়ের পালা। জুলুমকারীর উপর সংঘবদ্ধ জনতার ক্রোধ এই শেষ দৃশ্যে দেখা জায়। জনতার কাছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে হাকিমুদ্দি। শোনা জায় এমন আওয়াজ 'ও শালা শয়তানেক মারি ফ্যালায় কাম।' একসময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটিও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ভূমিপুত্র হিন্দু-মুসলমানের দলবদ্ধ চেতনার পাশে। নাটক উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পে শোষিত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ চেতনার জাগরনে শোষক সম্প্রদায়ের মানুষের পরাজয় এভাবেই একসময় ঘটে। 'ছেঁড়া তার' নাটকের দরদী মরমী নাট্যকার তুলসী বাবুর অভিপ্রেতও ঠিক তাই ছিল। শোষিত সম্প্রদায়ের প্রতি নাট্যকারের দরদ ছিল অপরিসীম। এই দৃশ্যে হিন্দু- মুসলমান কেউ আর ভীত নয়। তীব্র প্রতিরোধের মধ্যে পড়তে হয়েছে হাকিমুদ্দিকে। গোবিন্দ শ্রীমন্ত এরা এতদিন মাতব্বরের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। আর বসে বসে মার খাওয়া নয়। এবার চাই অত্যাচারীর হিসেব-নিকেশ। 'তোর দ্যাওয়ানী গিরির শয়তানি আইজে শ্যাষ।'- এই অন্তিম দৃশ্যে হাকিমুদ্দির যাবতীয় অপকর্ম ও শোষণের রূপটি তুলে ধরেছে সরেমামুদ এবং শ্রীমন্ত। 'ওহোঃ দ্যাওয়ানীর কোনয় দোষ নাই। খালি গুণ। মানুষের সর্বনাশ করি ফায়দা করার কতইনা কায়দা তোমার।' হাকিমুদ্দি উত্তরে গোবিন্দের বাক্যবাণ 'শও শও কায়দা আছে। টাকার কায়দা, হাকিম ত্যালেয়া দ্যাওয়ানী হবার কায়দা,' উপকারের নাম করি মানুষের জান মারার কায়দা, হিসাব দ্যাখেয়া চুরি করার কায়দা, তসবী ঘুরেয়া সরল

মানুষ’ ঠকাবার কায়দা, আইন- গাইন হদীজ কোরাণ-’ এবং বিধ কায়দার অদ্ভুত সম্মিলন ঘটেছে হাকিমুদ্দির চরিত্রে। আর নাট্যশেষে হাকিমুদ্দির পরাজয়, পরাভয় সেই কারণে কারোরই শিরঃপীড়ার কারণ হয় না।

১২.৪ মহিম চরিত্র

নাটকে মহিমের প্রারম্ভিক পরিচয় তিনি উত্তরবঙ্গের কোন এক শহরের deputy director of Agriculture.- এই সামাজিক পরিচয়ের পাশাপাশি নাটকে আরেকটি বৃহৎ পরিচয় রয়েছে- তিনি এ নাটকের ‘ধুয়াপদ’। তিনি বাল্যবন্ধু কৃষক রহিমুদ্দির ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবন পথের নির্ণায়ক চরিত্র। স্বচ্ছল পরিবারের একজন স্বজন ব্যক্তি হলেন মহিমবাবু। সংস্কৃতিমনস্ক, সঙ্গীতরসিক এক অপূর্ব জগতের বাসিন্দা। আমাদের তাঁর চরিত্রের যে দিকটি সর্বাধিক আকর্ষণ করে তা হল- তিনি প্রতিষ্ঠিত সরকারী চাকুরীজীবী হলেও অহং সর্বস্ব চরিত্রের অধিকারী নন। সেকারণে স্কুলের বাল্যবন্ধু রহিমুদ্দিকে বিন্দুমাত্র বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে দেন নি। কিংবা আত্ম-অহমিকার বাল্যবন্ধুকে কাছে পেয়ে সে এক ধরণের নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। সদা হাস্যমুখর তিনি। ‘আমার ঘরের ফুলবাগান দেখেছিস’?... আর পাতাবাহারটি বাড়ির ভেতরে।’

নিজে সরকারী ডেপুটি। তাই বাল্যবন্ধুর দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে, তার পারিবারিক অর্থনৈতিক চালচিত্রের পরিচয় জেনে নিয়েছে বলেই রহিমুদ্দির মানসিক যন্ত্রণার উপলব্ধি করতে পেরেছে। কিছুটা জ্বালাহর মলনের ওরিকোলন দেবার মত করে তিনি বিষয়কে হালকা করে নিতে বলেছেন, ‘কুছ পরোয়া নেই রহিম। নিজের পয়দা করে নিজে খাচ্ছিস, আর দশজনকে খাওয়াচ্ছিস তুই। দুনিয়ার অন্নদাতা তোরা। তোরা কি ছোটরে?’ আত্ম অহমিকাকে বিসর্জন দিয়ে, বাল্যবন্ধুকে ফিরে পেয়ে আনন্দে ভেসে যেতে চান মহিমবাবু। রহিমুদ্দির সুধা ঝরা কণ্ঠের গান আজও তার মন প্রাণ আকুল করে দেয়। তাই রহিমুদ্দির দুঃখবাদকে তিনি ফুৎকারে, তুরি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। সৌন্দর্য রসিক মহিমবাবু রহিমুদ্দিকে বলেন ‘আরে বোকা- মানুষের জীবনটা একটা

আনন্দের খনি। দুঃখবাদের প্যাঁচে পড়ে মুখ সিঁটিয়ে যারা সুখ সাধ আনন্দ দূরে ঠেলে দেয়- জীবনের আনন্দকে যারা বর্জন করে, তারা নেহাৎ আহম্মক।' আপাদমস্তক সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ মহিমবাবু। জীবনকে তিনি সুন্দর পূর্ণিমা রাতের মত উজ্জ্বল দেখেন। সৌন্দর্যের দৃষ্টিতে মানবজীবনকে অনুভব করেন। গান-বাজনা, সখের বাগান, সুখী দাম্পত্য জীবন এবং পুত্রকন্যা পরিবৃত হয়ে এক অপার আনন্দলোকে অবস্থান করেন। তবে তিনি যে পরিবেশ পরিস্থিতি বিমুখ এমন নয়। দোতারার তানে ভর করে তিনি ছেলেবেলার গ্রাম বাংলাকে দিব্যনেত্রে প্রত্যক্ষ করার জন্য বর্তমান- এর উপর ভর করে অতীতে ফিরে যান। 'জীবনের আনন্দ বলে' তার নিজের মাথাটি যে তিনি খারাপ করেছেন এমনই অভিযোগ আনেন তার শহুরে বন্ধু সুশান্ত। আসলে তা কিন্তু নয় তিনি রহিমুদ্দিকে উৎসাহিত করেন 'আনন্দলোকে' অবস্থান করতে শরীরে মনে স্ফূর্তি রাখার অব্যর্থ ঔষধের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'দ্যাখ রহিম, যার কাজ যত কষ্টসাধ্য, তার বাঁচতে হলে সেই পরিমান আনন্দ চায়। মনে স্ফূর্তি রাখতে হয়।' ......আলবাৎ সব মানুষের জীবনের আনন্দ উপভোগ করার অধিকার আছে। অবশ্য দেখা জায় সর্বত্র সুখ-দুঃখ মেলামেশি করে আছে। তবুও ওরই ভেতর থেকে সুখ টুকু খুঁজে নিতে হবে। এই ধর কতদিন পর তোর সঙ্গে দেখা হলো। তোকে নিয়ে গান টান নিয়ে সেই ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া আনন্দটুকু যদি কুড়িয়ে পাই, সেইটা করাই ভালো, না করা দুঃখ কষ্ট তার ফিরিস্তি দিয়ে দুঃখ বাড়ানোই ভালো। মানুষ সারা জীবন আনন্দের আশাতেই দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়ে।' মহিমবাবু যে পূর্ণ আনন্দবাদী ভোগবাদী এবং জীবন রসিক আশাবাদী চরিত্রের মানুষ- এই অংশই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ দাখিল করে। তাইতো বন্ধু রহিমুদ্দির দুঃখ কষ্ট ঘেরা জীবন বৃত্তের সম্যক পরিচয় পেয়ে তিনি বলেন- 'ও সব সরিয়ে রাখবি।' এইসব কথায় মনে হতে পারে তিনি দার্শনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, আসলে কিন্তু তা নয়। তিনি এমন প্রকৃতির মানুষ যিনি জীবনকে আনন্দময় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন, অপরকেও জীবনপাত্র আনন্দের পাত্রে কানায় কানায় ভর্তি করে নিতে প্রেরণা দেন। তিনি জানেন পরিশ্রমী শরীরের দেহ ও মনকে চাঙ্গা করে নিতে হলে প্রয়োজন

হল গান-বাজনা আর স্ফূর্তির ফোয়ারা। এই প্রথম অঙ্গের প্রথম দৃশ্যের পর দীর্ঘক্ষন আর মহিমবাবুর সাক্ষাৎ আমরা পাইনা।

এরপর মহিমবাবুর সাক্ষাৎ পায় তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। ড্রইং রুমে উপবিষ্ট অবস্থায় মহিমবাবু যুদ্ধ প্রসঙ্গ এবং কলকাতার বুকে জাপানি বোমা বর্ষণের প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধু সুশান্ত বাবুর সঙ্গে মশগুল। প্রাণঘাতী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দানবীয় রূপ এবার আর একবার প্রত্যক্ষ হবে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। বোম বর্ষণ পরে কেন কলকাতাবাসী জনগণ আক্রান্ত স্থান ত্যাগ করেননি- এমন প্রশ্নের উত্তরে মহিমবাবু বলেন যে গত যুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে নয়, জনগণ প্রাণ হাতে করে নিয়ে পালিয়েছে কেবলমাত্র রাজ শক্তির উপর বিশ্বাস ভরসা ছিল না বলে। এ থেকে অনুমিত হয় যে মহিমবাবু যেমন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিত্ব তেমনি তিনি ভীষণভাবে ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা সম্মৃদ্ধ। আনন্দবাদী মানুষ মহিমবাবু গান- বাজনা আনন্দলোকের অনুরাগী হলেও বাস্তবের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি- সে কারণে যুদ্ধের ভয়ঙ্করতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। 'যে অশান্তির যুগ। ও সব পাটতো উঠেই গেল।'

এরই মধ্যে বাল্যবন্ধু রহিমুদ্দি দানবীয় যুদ্ধ এবং ভয়ঙ্কর অন্নভাবের শিকার হবে, স্ত্রী ফুলজানকে তালাক দিয়ে, শহরের বন্ধুর কাছে আশ্রয় নিয়েছে। আর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধুর অফিসের cow-shed-এ। রহিমুদ্দির একদিন অফিস কামাই- এর কথা শুনে তিনি বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। পুত্র ভবেশকে দিয়ে তার জাবতীয় খোঁজখবর নিতে বলেন। 'কি হয়েছে জানতে হবে না।' সামান্য একটি অদ্ভুতভাবে মহিমবাবুর পরোপকারী মনোভাবটির সঙ্গে পাঠকের মুহূর্তের মধ্যে পরিচিতি ঘটে জায়। তিনি রহিমুদ্দির পরম হিতাকাঙ্খী। তাঁর সুপারিশ ব্যতীত শহরের অফিসে কোনভাবে রহিমুদ্দির চাকরি জুটতো এমনও ভাবা অসংগত হবে না। মহিমবাবু পরহিতব্রতী, আশাবাদী এবং শতাংশে আনন্দবাদী প্রকৃতির চরিত্র। মহিমবাবু Deputy Director of Agriculture বলেই হয়তো কৃষক সম্প্রদায়ের বঞ্চিত হবার প্রসঙ্গটি বেশ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন। বাল্যবন্ধু রহিমুদ্দির বলা একটি প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি বেশ চিন্তিত। এই ভাবনা কেবল বাল্যবন্ধুর প্রতি একমাত্র ভালোবাসা বা

সহানুভূতি প্রদর্শন নয়; সমগ্র কৃষক সমাজের প্রতি তার সম্যক ব্যথিত চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে এই সংলাপে। 'ও ব'ল্লে যে আজ কাল দুনিয়ার চালচলন এমনি হয়েছে যে যারা মানুষ মারার কাজ করে, তাদেরই মান- ইজ্জৎ টাকা করি সবকিছু হয়। আর যারা মানুষ বাঁচাতে চায়, তার ভালো করতে চায়, তাদের কোনো দামই নেই। এই ধর একজন মিলিটারি, সে যতক্ষণ যে ভাবে খাটে তার চেয়ে একজন সাধারন চাষা ঢের বেশী খাটে। সিপাহী পায় খোরাক ব্যারাক উর্দি ইজ্জৎ, আর চাষা পায় আধপেটা খাওয়া, ভাঙ্গা কুঁড়ে, ছেঁড়া ট্যানা আর লাঞ্ছনা। সিপাহীর গুণ সে মানুষ মারার কাজ করে, আর চাষার গুণ সে মানুষের খোরাকী জুগিয়ে বাঁচায়! এমনকি নিজে বঞ্চিত হয়ে।– সিপাহী কৃষকের মূল্যায়ণ করার জন্য মহিমবাবু এই সংলাপ উচ্চারণ করেন নি, নাট্যকারের উদ্দেশ্য তাও নয়। কেবলমাত্র তুল্যমূল্য বিচার করায় বহু গুণে মহিমবাবু কৃষক দরদী ও সংবেদনশীল মনেরই বহিঃপ্রকাশ- এর এক আশ্চর্যরূপ এই অংশে প্রতিফলিত। মন্বন্তর কবলিত গ্রাম বাংলার বুভুক্ষু মানুষের মৃত্যুতে তিনি বেশ চিন্তিত বলেই মনে হয়। নিজের কর্মক্ষেত্রের অফিস সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা তেমন আশাপ্রদ নয়। তাই সিপাহীদের পেছনে যত টাকার খরচ হয়, তার সামান্যতম অংশ খরচ করে যদি কৃষক সমাজের উন্নতি হয় তবে সবারই মঙ্গল বলে তিনি মনে করেন। অফিসের লোকদেখানো Demonstration সম্পর্কে স্পষ্টতই দ্বিধা রয়েছে তার মনে। 'সেই খরচের সামান্য অংশও ব্যয় করে Demonstrare করলে চাষের কাজে অদ্ভুত উন্নতি হতে পারে। আমাদের হচ্ছে লোক দ্যাখান demonstration farm... war monger মুনাফাবাজেরা যাদের অশিক্ষা- কুশিক্ষায় ডুবিয়ে রেখে মাল্লে তাদের অভিশাপেই এ সভ্যতা ধ্বংস হবে।

সংবেদনশীল মনের মরমী মানুষ মহিমবাবু। তাই বাল্যবন্ধু রহিমুদ্দির পুত্র বসিরের অসুস্থতার সংবাদে বিচলিত হয়ে পড়েন। রহিমুদ্দি নিশ্চুপ হয়ে থাকলে তিনি খাবার-দাবারের অভাব রয়েছে কিনা জানার জন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। কী অসাধারণ তার সহানুভূতি। কি অনন্যসাধারণ সংবেদনশীলতা! ড্রইংরুমবিলাসী শহুরে সরকারি চাকুরিজীবী আধুনিক নাগরিক মনন মহিমবাবুর এই রকম দরদী মনের কাছে

একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। মহিম বাবুর কোনরকম আত্ম অহমিকার সন্ধান পাওয়া যাবে না। সভ্যতা মদগর্বী আধুনিক শহরবাসীর মতো উন্নাসিক মনোভাবের প্রকাশ তার কাছে প্রত্যাশিত নয়। রহিমুদ্দি সম্পর্কিত কোন তথ্যই তাঁর অজানা নয়; সে কারণে পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা জেনেও তিনি কিছুটা অনুযোগের সুরে বলেন, কেন রহিমুদ্দি বিলম্ব করে তার কাছে এলো। রহিমুদ্দি যখন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মতো হাদিজের দোহাই দেয়, তখনও যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্যে ধর্ম বিধানের কথা উল্লেখ করে মহিমবাবু তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। 'ধর্ম কিংবা তাঁর বিধানের তর্ক বাদ দিয়ে একটা কথা আমি তোকে বলি শোন! আমরা যেমন ভগবানকে অন্তর্যামী বলি- মানে সকল মানুষের মনের কথা সব কথা তিনি জানেন বলে বিশ্বাস করি, তেমনি তাদের খোদাও অন্তর্যামী একথা তোরাও বলিস তো'? তিনি চেষ্টা করেন রহিমুদ্দি যেন তার স্ত্রীর অন্তরের উপলব্ধিকে অনুভবী হৃদয়ে দেখুক। তিনি বিশ্বাস করেন তালাক দিবে যে ব্যথা রহিমুদ্দি স্ত্রী ফুলজানকে দিয়েছে- সেই অপরাধের মার্জনা করবেন মেহেরবান খোদা।

হিন্দু হয়েও বাল্য বন্ধুকে মুসলমানের ধর্মপ্রাণতায় কিংবা ধর্মের বিধানে আঘাত করতে চাননি। বরং ধর্ম সম্পর্কিত তালাক বিষয়ে যে সংকট ঘনীভূত হয়েছে বাল্যবন্ধুর জীবনে তাকে তিনি মানবিক সংবেদনশীলতার দ্বারা বিচার করেন। কিছুটা অভিযোগের সুরে তাই মহিমবাবুকে বলতে শোনা যায়, 'সেই দুই মাসের জায়গায় আজ চার মাস হয়ে গেল। নিত্যদিন গুনে গুনে হতাশ হয়ে তোর বিবি যদি বাঁদীই হয়ে থাকে, সে কি তার অপরাধ? মরনের পর যেদিন জবাব দিতে দাঁড়াবি, সে দিন এক নির্দোষ মায়ের লাঞ্ছনা অবোধ নিরপরাধ ছেলের যন্ত্রণা, যা তুই নির্বোধের মত খামখেয়ালি করেই দিয়েছিস, তার কি জবাব দিবি? রহিম তুই ত' অবুঝ নোস! মার বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে এনে তাকে মেরে ফেলিস না রে। তাকে বাঁচা- বাঁচা-।'

নাট্য কাহিনির মাত্র দুটি দৃশ্যের মিতায়তন উপস্থিতিতে মহিমবাবু তার কর্মপন্থা, জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি, কিংবা অভিন্ন হৃদয় বাল্যবন্ধুর বিপদের দিনে ঐকান্তিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করা কিংবা হতদরিদ্র বাংলাদেশের কৃষক সমাজের প্রতি অতি সদর্থক

ও স্বচ্ছ মনোভাবের প্রকাশে সকলের হৃদয় মনে অম্লান আসন পেতে বসেন। মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দানবীয় প্রেক্ষাপটে রচিত কৃষক জীবন ভিত্তিক নাটকে এই ধরনের মানবদরদী চরিত্রের সন্নিবেশ নাটকে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। এই তথ্য মনে রেখেই তুলসীদাস লাহিড়ী মহিমবাবুর চরিত্র সৃজনে এত বেশি যত্নলাভে ব্রতী হয়েছিলেন।

১২.৫ গোবিন্দ কোরাক

সমাজ সচেতন তুলসীবাবু এক অসামান্য চরিত্র নির্মাণ কারিগরী দক্ষতার পরিচয় বহন করে গোবিন্দ। কোন কোন সমালোচক তাকে কোরাস চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তবে আমাদের মনে হয় গোবিন্দ কোরাক জাতীয় চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করেও শেষ পর্যন্ত সে একটি সার্থক পূর্ণায়ব নাট্য চরিত্রের দাবীদার। নাট্যকার কৃষক জীবনের বঞ্চনার, শোষণের চিত্র তুলে ধরে পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন বলেই গোবিন্দ চরিত্র নির্মাণ করেছেন এমনটা দাবি করা চলে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক গোবিন্দ চরিত্র। সে কারণে নাট্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং নাট্য পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই খুব সতর্কতার সঙ্গে নাট্যকার গোবিন্দ চরিত্রের উপস্থাপনা করেছেন। গোবিন্দ চরিত্র কখনো সংয়ের দলের জাম্বুবান কখনো বা বাস্তব সমাজেরই অম্লান হাসির অক্ষয় কুসুম রক্ষাকারী একটি জীবন্ত সামাজিক চরিত্র।

গোবিন্দ গীদাল জাম্বুবান চরিত্র হিসেবে নাটকে উপস্থিত হয়েছে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে। প্রান্ত উত্তরবঙ্গে লোক ভাষায় যার গীত রচনা করে এবং গান গেয়ে বেড়ায় তাদের ‘গীদাল’ বলে। এই শ্রেণীর গান রচয়িতা সমকালীন সামাজিক পরিবেশ নিয়ে গান বাধে। সমকালীন নির্মম সত্য উন্মোচক। প্রতিটি চরিত্র যেন তাদের নখদর্পণে। তাই তারা অক্লেশে চরিত্র সম্পর্কে টিকা টিপ্পনী পারদর্শী। এবং চরিত্রের অন্তর সত্তার উন্মোচনকারী। দীন দরিদ্র কৃষক জীবনের সত্য উন্মোচন করে গোবিন্দ।

‘রাস্তা ঘাট আর ঘরের দশা দেখি কান্দন পায়
ভাত কাপড় ত্যাল নুন জোটাইতে দম ফুরাইছে হায়।’

অল্প কথায় গোবিন্দ গৃহস্থ কৃষকের দৈনন্দিন জীবনে ধারণের গ্লানিকে উন্মোচন করেছে এখানে। 'মরিয়া জুড়াই কেউ বা বাঁচিয়া মরি থাকে।' অংশেও সেই সমাজ সত্য- এর দিকটি প্রকাশিত। অদ্ভুতভাবে গ্রাম জীবনে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী যেন তারই গায়ক কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

'নিজের মুরাদ ফুরাইছে তা আশায় করি পূজা
দরগায় কেউ সিন্নি চড়াই কেউবা রাখি রোজা
মসজিদে মন্দিরে ভাইরে নিত্য কুটি মাথা
কালী হরি খোদা কিন্তু কয়না কোনয় কথা।।

....

শক্তিহীনের ভক্তিতে ভাই তুষ্ট হয়না কাঁয়ো
জাম্বুবানের এই কথাটা খেয়াল করি জায়ো।'

সমাজের সব দিকেই স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রসারিত। অদ্ভুত কৌতুক প্রিয়তার মেজাজে সে সমাজের সত্যকে মুহূর্তে উদ্ভাসিত করে তোলে।

জাম্বুবান নাম নিয়ে কেন সে গান বাঁধলো- এমন প্রশ্নের উত্তর পরিহাস রসিক, কৌতুক প্রিয় গোবিন্দ বলে যে রামায়ণের রামচন্দ্রের পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী ছিল জাম্বুবান, ঠিক তেমনি ভাবে গোবিন্দ যেন রহিমুদ্দিরও শ্রীমন্ত- এদের পরামর্শদাতা হতে পেরেছে। গোবিন্দ তার বাক্যবাণের দ্বারা সমাজে কৌর্দণ্ড প্রতাপ মানব রাক্ষসদেরকে জর্জরিত করে যেতে চায়। তাই গোবিন্দকে গাইতে শুনি এই চরণ দুটি-

'বুদ্ধিমান জাম্বুবান ঝালুম ঝুলুম মোটা
বাক্যবাণ বিন্ধিয়া মারে রাক্ষস গোটা গোটা।'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে গানে উচ্চারিত 'রাইক্ষস' শব্দটির নিক্ষেপের মূল লক্ষ্য কিন্তু জোতদার, মহাজন হাকিমুদ্দিই। গোবিন্দের গাওয়া গানের পরে রহিমুদ্দিও হাকিমুদ্দিকে উপলক্ষ করে গান গেয়েছে। গানের কথাগুলি গোবিন্দের মনে আলোড়ন তুলেছে। কৌতুকপ্রিয় গোবিন্দ এরপর যে সংলাপটি উচ্চারণ করেছে তাতে শোষিত জনগণের একসময় সংগ্রামী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। গোবিন্দ হালকাভাবে এখানে

গভীর সমাজ সত্যকে প্রকাশ করেছে। ‘বড়য় হক কথা কছিস ভাইরে। আখেরী বিচারের আশা ধরিয়া দুঃখীর দল বাঁচি আছে। মন কয়, আইজ হউক। কাইল হউক বিচার হইবে!’ গোবিন্দ জানা তৃতীয় নেত্রে ভবিষ্যতকে অনুধাবন করতে পেরেছে। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ জনতার হাতে অবরুদ্ধ হওয়ার ঘটনার পূর্ব ব্যাখ্যা তা হিসেবে গোবিন্দকে দেখলেও সে দেখায় ভুল থাকে না। পরিস্থিতি সচেতন সে। তাই তার ক্ষুদ্র আমির চারপাশে যে বৃহত্তর হিন্দু-মুসলমান কৃষক আমরা রয়েছে তাকেই বড় করে দেখছে দুঃখী গীদাল গোবিন্দ।

গোবিন্দ গীদাল হলেও সমাজব্যবস্থার নির্মম উপস্থাপক হলেও কিন্তু সামাজিক ভদ্রতাকে মান্য করেই চলে। হঠাৎই সে রহিমুদ্দির ঘরে প্রবেশ করতে না চাওয়ার দৃশ্যে তাই প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের পরিস্থিতি সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে এরকম পরিস্থিতিতে ‘এক কুরি বারো টাকায়’ রহিমুদ্দি নতুন বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করেছে শুনে অবাক হয়ে যায়। অশিক্ষিত মানুষ গোবিন্দ অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠে ‘বাপরে! এক কুরি বার টাকা! কাম দিছিস। একজোড়া হালুয়া বলদ হইল হয় যে।’ হাকিমুদ্দির গাভীকে খোয়ারে দেবার পরের ঘটনায় রহিমুদ্দি কিভাবে চক্রান্তের শিকার হবে এমন আগাম ইঙ্গিত গোবিন্দ তাকে দিয়েছে। সাধারণ দরিদ্র কৃষক হয়ে যে রহিমুদ্দি হাকিমুদ্দির সঙ্গে বিরোধিতায় পেরে উঠবে না- এই কথা বলতে সে আবার একটি প্রচলিত প্রবাদের সাহায্য নেয়। ‘ভাইরে! জলে বাস করে কুমীরের সাথে বাদ করি পারবু?’ অথচ কেউ না জানুক, গোবিন্দ কিন্তু জানে সমাজের শোষক শ্রেণির নির্মম চরিত্র। মানব চরিত্র বিশ্লেষণে সে দক্ষ। তাই তৎক্ষণাৎ তার জবাব ‘হিংসায়। এ দ্যাশে কারো ভালো চায় না। মন্দ হইলে খুসী। জবের খুসী।’ এছাড়া, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা সে সহজেই অনুমান করে যে তিস্তাঘাটের রাতের চুরির ঘটনায় হাকিমুদ্দির হাত রয়েছে। নাট্যপাঠক জানে গোবিন্দের এই রকম আগাম সন্দেহ অমূলক বা অহেতুক ছিল না। কুকরার জেলে যাবার ঘটনায় এবং শিয়ালুর উক্তিতে সর্বোপরি হাকিমুদ্দির নিজস্ব সংলাপ থেকে চুরির ঘটনায় হাকিমুদ্দিন কালো হাত প্রসারিত ছিল- এ তথ্য আমরা জানতে পারি। শিয়ালুর একটি সংলাপ দিয়েই গোবিন্দের সন্দেহের দিক সত্য বলে প্রমাণ করা জায়। ‘দ্যাওয়ানী গোসা

হন না। তোমার হুকুমে নাকি ওই ডাকাতি উয়াবা কইছ্ছে। সেই কথা চাপি উয়ারা জায়া নাকি নেমাক জ্যাল হাকি বাঁচেয়া দিছে।' গোবিন্দ প্রতিটি চরিত্র প্রসঙ্গে সব সময় সঠিক বিশ্লেষণ করে। যেমন কুকরা প্রসঙ্গে সে একটি বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেছিল- 'কুকরা শালা আসলে চুগলী খোর'- আর আমরা নাট্য ঘটনার পরবর্তী অংশে জানতে পারি যে কুকরাই গোপনে রহিমুদ্দির ঘরে চুরির মাল রেখে এসেছিল।

গোবিন্দ রহিমুদ্দির প্রতি সমবেদনা উজাড় করে দেয়। মিথ্যা মামলায় পড়লে অর্থ ব্যয় হতে পারে- এমনই আশঙ্কা করে গোবিন্দ। নিজে দুঃখী তাই অন্য দুঃখী মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা সে বেশ উপলব্ধি করে। উত্তেজিত রহিমুদ্দি যেমন সে শান্ত হতে পরামর্শ দেয়, তেমনি বিপদের দিনে তাকে পরামর্শও দেয়। একসময় সমবেদনাভরা কণ্ঠে তাকে বলতে শোনা যায়- 'দিনের গতিক ভালো নয়।' অর্থাৎ মন্বন্তর আসন্ন। এমনই ইঙ্গিত দিয়ে যায় গোবিন্দ। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই সেই আকাল- এর ঘটনাধারা বর্ণিত। নিরন্ন বুভুক্ষু মানুষেরা দল বেঁধে এসেছে হাকিমুদ্দি কাছে; কারণ সেই মাতব্বর, জোতদার। হাকিমুদ্দির মুখের উপর সেই অভুক্ত মানুষদের হয়ে ওকালতি করে। 'গরীবগুলো অত টাকা কোঠে পাইবে? ধান করজদ্যাও সুদ দিবে।' হাকিমুদ্দি দোদুল্যমানতার পরিচয় দিলে গোবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় তার দিকে। 'মানুষগুলা কি না খায়া মইরবে?' ভুকা মানুষের স্বরূপ গোবিন্দ জানে। তাই হাকিমুদ্দিকে সতর্ক করে বলে 'লুট হইলে সব জাইবে যে'। এইসব ছোট ছোট অংশে গোবিন্দের দরদী চরিত্রের প্রকাশও সমব্যথী হওয়ার দিকটি সকলকে মুগ্ধ করে, বিস্ময়ে হতবাক করে দেয় চারিত্রিক মাধুর্য।

দুঃখের ভিতরেও গোবিন্দ আশার স্বর্ণালী আলোর আভা দেখতে পায়। শ্রীমন্তের মুখে চাষ আবাদের ভালো খবর পেয়ে ও আশাবাদী হয়ে ওঠে। ক্ষেতের দিকে অনেক আশায় বুক বেঁধে তাকিয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের অস্বচ্ছতার মধ্যেও গান গেয়ে সবার দুঃখ কষ্টকে লাঘব করে দেবার চেষ্টা করে। তাই তো গান গাওয়ার মতো সময় সুযোগের অপেক্ষা করে নামে। মন্বন্তর কবলিত গ্রাম জীবনের মর্মান্তিক সত্যকে উন্মোচন করে গান ধরে গোবিন্দ।

'না খাওয়া শুটকাটা তার শুটকীক ডাকি কয়

প্যাট না থাকিলেরে মানুষ সুখী হইল হয়।

হাত পাও চৌউক কান দুইটা করি

পেট একেটা হয়।

[ফির] এমন করি থুইছেরে দ্যাহে কাটি ফেলার নয়

রে ভাই কাটি ফ্যালার নয়।'

-কৌতুক প্রিয়তার দ্বারা অভুক্ত মানুষদেরকে সবসময় হাসি খুশিতে ভরিয়ে রাখতে চায় সে। কেন চাষিরা অভুক্ত অবস্থায় থাকে- এমন প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব দেয় এই বলে 'রহিমুদ্দি আইলে পুছ করিস। খাটি খাই গান করি মুই ওইগুলা বুঝিয়ে না।'- এই হল রসিক সুজন গোবিন্দের জীবনব্রত। অথচ গোবিন্দই গভীর জীবন সত্যের নির্মম ব্যাখ্যা কর্তা। 'গোস্ত খায়া তুই ত' তাজা হবু। তোর ছাওয়া ছোটক কাঁয় খাওয়াইবে?'

গ্রাম্য মানুষ অভুক্ত থেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার দৃশ্য গোবিন্দ দেখেছে। 'মানুষ নগদে মরে।' এমন বিপর্যয়ের পর সে স্থির করে নেয় সে দেশান্তরী হয়ে শহরবাসী হবে। হয়ও। যুদ্ধের সময় সরকার পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করলে সাধারণ চাষীদের কথা ভেবে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। 'সরকার তামাম ধান আটকি রাখি মানুষগুলাক উপাস করেয়া মাইরবে। মাইনষের কি বাঁচার কোন দাবি নাই?' মানবতার যারা চির শত্রু তাদের কাছে তার এই বাক্যবাণ নিক্ষেপ। এই প্রশ্নের উত্তর সে পেয়েছে কলকাতায় যাবার পর। কলকাতায় গিয়ে জীবন রসিক, কৌতুকপ্রিয় গীদাল গোবিন্দ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। কিন্তু কৃষক গোবিন্দ ভিক্ষাবৃত্তি এখনও তেমন রপ্ত করতে পারেনি। যাত্রায় বিবেকের কাছাকাছি এক সময় পৌছে যায়। সহজ সরল চাষা গোবিন্দ অক্লেশে স্বীকার করে 'বাবু মুই গান গাবার জপ পারি। কিন্তু চাষার গান। এই গানের থেকেই মানুষের ভালো হবে এমন ধারণা জন্ম দিয়েছে শহরবাসী এক ভদ্রলোক। নিজের বাঁধা পরবর্তী গানে যে শোষক সম্প্রদায়ের সত্যিকারের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। 'নিত্যকালের নয়ত বাহুর বল' এই অংশকে নাট্যকার প্রতিষ্ঠা করেছেন একেবারে অন্তিম দৃশ্যে- যেখানে সমবেত জনগণের হাতে অবরুদ্ধ হয়েছে হাকিমুদ্দি।

গীদাল গোবিন্দ রহিমুদ্দির যন্ত্রনাঘেরা জীবনের সঙ্গে পুরোদস্তুর পরিচিত ছিল। তার এরকম অবস্থার পেছনে দুষ্টমতি হাকিমুদ্দির শয়তানি রয়েছে একথা গোবিন্দ জানে। তাই সে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে উঠে বলেছে 'আর শুনা শুনি নাই। তোর দ্যাওয়ানী গিরির শয়তানি আইজে শ্যাষ। ভালো মানুষটার কাছে লাগিয়া তুইয়েনা তাক এই কাউটালে ফ্যালাছিস?... শত শত কায়দা আছে। টাকার কায়দা, তসবী ঘুরেয়া সরল মানুষ ঠকাবার কায়দা, আইম গাইন হদীজ কোরান-। তোর জিৎ হইবে নাকি শয়তান?' প্রকারান্তরে 'নিত্যকালের নয়ত বাহুর বল'- গানের কথাকেই এই দৃশ্যে গোবিন্দ প্রতিষ্ঠা করে গেল। এখানে গোবিন্দ বিবেকে'র ভূমিকা যেন পালন করে গেল। কেন এই মানবসৃষ্ট, কৃত্রিম আকাল কেন গোবিন্দ বুঝে নিয়েছে জীবনের দ্বারা। সমবেত শক্তির জাগরণে শয়তান হাকিমুদ্দির মতো শোষক সম্প্রদায়ের দল পিছু হটবে, একসময় বাহুবলের পরাজয় ঘটবে। তাইতো গানের মধ্যে সে বলে যায়- 'চিনে রাখো লোভী রাহুর দল/ নিজের জ্বলে জ্বালো আলো পালাক পিচাশ প্রেতের পাল।'- গীদাল গোবিন্দ এইভাবে ক্রমে ক্রমে নাটকের এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মর্যাদা পেয়ে যায়। নাটকের অন্তিম দৃশ্যে দেওয়ান হাকিমুদ্দির সামূহিক পরাজয়ে গোবিন্দের ভাবনাই যেন বাস্তব রূপ লাভ করে।

১২.৬ অনুশীলনী

১) ছেঁড়া তার নাটকে ফুলজানের চরিত্র কে কেন্দ্রিয় চরিত্র বলা যাবে?

২) ছেঁড়া তার নাটকে রহিম্মুদ্দি চরিত্রকে কীভাবে দেখো, আলোচনা কর।

৩) ছেঁড়া তার নাটকে হাকিমুদ্দি চরিত্রের মূল্যায়ন কর।

৪) মহিম ও গোবিন্দ কোরাকের চরিত্র দুটির তুলনামূলক আলোচনা কর।

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) গণনাট্য আন্দোলন – দর্শন চৌধুরী।

৪) গণ-নব-সৎ-নাট্যগোষ্ঠীর কথা – সুধী প্রধান।

৫) ছেঁড়া তার –তুলসী লাহিড়ী – পুষ্পেন্দুশেখর গিরি।

একক ১৩- ছেঁড়া তার সংগীত প্রয়োগ, ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে গুরুত্ব

বিন্যাসক্রম

১৩.১-সংগীত প্রয়োগের তাৎপর্য

১৩.২–ট্র্যাজেডি নাটক হিসেবে গুরুত্ব

১৩.৩–অনুশীলনী

১৩.৪-গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১- সংগীত প্রয়োগের তাৎপর্য

নাট্য সংগীত প্রয়োগের পিছনে নাট্যকারের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পায়। গান মানেই নিছক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সৃজন করা হয়- এমন ভাবার মধ্যে তেমন কোনো সারবত্তা থাকে না। কিংবা কেবলমাত্র সাধারণ গদ্য কথা যেখানে পৌঁছয় না সেখানে কবিতায় ছন্দে, সুরে মিলে গান সহজে তার আবেদন দাঁড় করাতে পারে। কথায় বলে গদ্য যেখানে থেমে দাঁড়ায় সেখান থেকেই গানের যাত্রার সূচনা। সে যাই হোক, নাটকে গানের সাঙ্গীতিক প্রয়োগের তাৎপর্য অনুসন্ধান করার পূর্বে নাটকের প্রয়োজনের দিকে গান সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা কোন কোন দিক থেকে- তা একবার দেখা যেতে পারে।

প্রথমত, নাট্য কাহিনী বলয়ের একটানা ঘটনাপ্রবাহের একঘেয়েমি আনন্দময় বিরতির দায়িত্ব নেয় কোন কোন নাট্য সংগীত।

দ্বিতীয়ত, স্বার্থক নাট্য সংগীত নাটকীয় তাৎপর্যকেই প্রকারান্তরে তুলে ধরে। নাট্য সংগীত সক্রিয় নিষ্ক্রিয় উভয়বিধ নাট্য চরিত্রের বিকাশে সাহায্য করে থাকে।

তৃতীয়ত, নাট্য সংগীতের দ্বারা, নাট্য ঘটনার পরবর্তী স্তরকে ফুটিয়ে তোলা হয়।

চতুর্থত, সমকালীন নানান সামাজিক সমস্যা শোষণ কিংবা পারিপার্শ্বিকতার দিকগুলি সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে প্রকাশ করে গান।

পঞ্চমত, চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্তা উন্মোচনে গানের অনস্বীকার্য ভূমিকা থাকে নাটকে। সেক্ষেত্রে গান কখনো কখনো চরিত্রের অন্দরমহলের উন্মোচন করে।

ষষ্ঠত, নাট্য কাহিনীর বিশেষ কোনো মুহূর্ত কিংবা Dramatic Situation তৈরীর ক্ষেত্রে অনেক সময় সদর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে গান।

সপ্তমত, নাট্য দৃশ্যের সমাপ্তি থেকে পরবর্তী দৃশ্যে উপনীত হবার সূচনা হিসেবে গান ব্যবহৃত হয়ে থাকে নাটকে।

নবমত, পরবর্তী নাট্য দৃশ্য গুলির পূর্বাভাস দেওয়ার কাজ করে নাট্য সংগীত।

দশমত, নাট্য ভাববস্তু, নাট্য সংগীত - এর সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এছাড়া নাট্য চরিত্রের, ভবিষ্যৎ পরিণতির আগাম ইঙ্গিতও পরিবেশন করে নাট্য সংগীত। চলচ্চিত্রাভিনেতা নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর আরেকটি বড় পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন গীতিকার ও সুরকার, প্রাপ্য তথ্যাদি থেকে জানা যায় নাট্যকার তুলসীবাবুর ধ্রুপদী সংগীতের গুরু অন্তত দুজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মানুষ ছিলেন। এদের একজন হলেন লক্ষনৌ এর ইসতাক হোসেন। অন্যজন ছিলেন আগ্রা ঘরানার শিল্পী, সমকালীন ঢাকার নবাবের সভা গায়ক সালামত হোসেন। অতুলচন্দ্র গুপ্তের সহদর বিমলচন্দ্র গুপ্ত আইনজীবী তুলসী বাবুকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে মাসিক বেতন চুক্তিতে সঙ্গীত পরিচালকের পদে যোগদান করিয়েছিলেন। বিখ্যাত TWIN Company-র লেবেল সাঁটানো জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এবং জমিরুদ্দিন খান সাহেবের কণ্ঠে গীত বেশকিছু গানের গীতিকার ও সুরকার ছিলেন তুলসী লাহিড়ী। এত সংগীত প্রতিভার অধিকারী যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরাজমান, তিনি নাটক রচনা করতে বসে নাট্য সংগীত প্রয়োগ করবেন- যথেষ্ট সচেতনার সঙ্গে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন ব্যক্তিত্বের দ্বারা নাট্য সংগীত নাটকের বিষয়ের সঙ্গে হরিহর আত্মার মতো অভিন্ন হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

জীবনধর্মী সামাজিক নাটকে ‘ছেঁড়া তার’ আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটকে উদ্ভাসিত করেছে। সমাজ চিন্তা এবং যুক্তিবাদের সংযোগে এই নাটক। এসবের সঙ্গে ‘ছেঁড়া তার’- এর গান অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এ নাটকে মোট গানের সংখ্যাটি ৮টি। তবে সবকটি সংগীতের সাঙ্গীতিক প্রয়োগ যে সার্থক এমন দাবি করা চলে না। তবে একেবারে অহেতুক এমনও নয়। নির্মম শোষণের অত্যাচারী রূপে চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে কোন কোন গানে। ব্যাখ্যার সময় গানগুলির প্রয়োগ সার্থকতা, বিচার বিশ্লেষণ করা যাবে। কোন কোন দৃশ্যে কটি গান আছে তা এবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। সেগুলো আবার কার কার কণ্ঠে বসানো হয়েছে তাও বিচার্য বিষয়- এর মধ্যেই রাখতে হবে।

সংখ্যা	অঙ্ক- দৃশ্য	গানের কথা, গানের প্রকৃতি	কে কে গেয়েছে
১.	১ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য	ভুলের ফুলে ভরেছি মোর সাজি। গানের প্রকৃতি বাযার চলতি আধুনিক গান এটি।	Deputy Director of Agriculture- মহিম্বাবুর কন্যা মায়া।
২.	১ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য	বড় মিঞার বাঁদীর সাথে যদি হইলো সাদী/ বাঁদীরে বান্ধিতে নারী খ্যাদে সদায় কাঁদি/মোর কোনয় খ্যাদ নাই। গানের প্রকৃতি ছাত্রজীবনের রোমন্থন প্রসঙ্গ।	নায়ক রহিমুদ্দি গানটি গেয়েছে।
৩.	১ম অঙ্ক/য় দৃশ্য	ফাফালি চান্দের নাও ভাসি যায় আকাশ দরিয়ায়/ জাগার পালা আজিরে আমার নিদালী মায়ায়.....	রহিমুদ্দির বাল্যবন্ধু মহিমবাবু গেয়েছেন। কখনওবা রহিমুদ্দিও কণ্ঠ মিলিয়েছে এ গানে।

			মন্তব্য
		মনে করে আইসা জাওয়া	
৪.		নাগাইল পাওয়া দায়/ তবু	
		নাগাইল পাওয়া দায়। গানের	শ্লোকটি গেয়েছে
		প্রকৃতি বাল্যবন্ধুকে এবং হারানো	রহিমুদ্দি।
		অতীতকে ফিরে পাবার উৎস- এ	
		গান।	
		হাকিমুদ্দির বুদ্ধিশুদ্ধি চুষি খাওয়ার	
৫.		কায়দাতে/ রোজা নামাজ আছে	জাম্বুবান ওরফে
	১ম অঙ্ক/২য়	মনটা খালি ফায়দাতে। গানের	গোবিন্দ গেয়েছে
৬.	দৃশ্য	প্রকৃতি- শ্লোক জাতীয় হলেও	
		এতে জোরদারের চরিত্র প্রসঙ্গ	গানটি রহিমুদ্দির
		উত্থাপিত। শুনরে গ্রামের কথা শুন	কণ্ঠে গীত হয়েছে।
		দিয়া মন।	
৭.		ভক্তিভরে যুক্ত করে করি	
		নিবেদন। গানের প্রকৃতি- সমাজ	গেয়েছে গীদাল
	১ম অঙ্ক/২ম	বাস্তবতার চিত্র উপস্থাপন।	গোবিন্দ।
	দৃশ্য		
		স্বপ্নে দ্যাখোঁ মরি মায়া গোরে	
		আছি শুইয়া /নাক চোখ মুখ	
৮.	১ম অঙ্ক/২য়	পালাইছে হাড্ডি কয়খানা থুইয়া।।	গেয়েছে কোরাস
	দৃশ্য	গানের প্রকৃতি সামাজিক দুরবস্থা	শ্রেণির চরিত্র গীদাল
		শোষকের অত্যাচার।	গোবিন্দ।
		না খাওয়া শুট কাটা তার শুটকীক	
		ডাকি কয়। প্যাট না থাকিলেরে	
		মানুষ সুখী হইল হয়। গানের	

মন্তব্য

২য় অঙ্ক/২য় দৃশ্য	প্রকৃতি- মন্বন্তর কবলিত গ্রাম্য মানুষের দুর্দশার চিত্র উপস্থাপনা বিশেষ। মর্মান্তিক সত্য প্রকাশ করেছে গানটি। ভুল না রেখে মনে বাঁচবে যত কাল সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাল।
৩য় অঙ্ক/২য়দৃশ্য	গানের প্রকৃতি মন্বন্তরের কারণ সন্ধান এবং শোষক শ্রেণির পরাজয় পরাভবের ইঙ্গিত দেয় এই গান।

তালিকার দিকে নজর রাখলে অনুধাবন করা যায় যে ছোট-বড় মিলিয়ে, তিন অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে সংযোজিত গানের সংখ্যা আটটি। মায়ার কণ্ঠের একটি মাত্র গান দিয়েছেন নাট্যকার। চরিত্র ধর্মে গানটি অতি আধুনিক গান হিসাবে বিচার্য। কিশোরী কন্যা মায়ার রোমান্টিক মনোভাবের উন্মোচন করেছে গানটি। এছাড়া গানটির যেমন কোনো নাট্যোপযোগিতা নেই। রহিমুদ্দির কণ্ঠে তুলসীবাবু বসিয়েছেন দুটি গান এবং হাকিমুদ্দি সম্পর্কিত একটি দুই চরণের শ্লোক। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে রহিমুদ্দি দুটি গান গেয়েছে। এছাড়া, বন্ধু মহিমের গাওয়া একটি গানে (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য) রহিমুদ্দি কণ্ঠ দিয়েছে মাঝে মাঝে। এছাড়া, উল্লেখযোগ্য নাট্য চরিত্র গীদাল গোবিন্দ গেয়েছে তিনটি গান। যথাক্রমে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে এবং তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে। কোরাস চরিত্র হিসাবে, নাট্য ঘটনার ব্যাখ্যাতা হিসাবে গীদাল গোবিন্দ যে কটি গান গেয়েছে- তার সবকটির যথেষ্ট নাট্যগুরুত্ব রয়েছে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রারম্ভিক মুহূর্তে তাৎপর্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন সূচনা হয়েছে মায়ার কণ্ঠের। বিশ্লেষণে সে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

গানগুলির নাট্যোপযোগিতার প্রারম্ভিক মুহূর্তে মহিম বাবুর কন্যা মায়ার কণ্ঠের গানটির তাৎপর্য অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। নাট্যদৃশ্যের সূচনা হয়েছে মায়ার কণ্ঠের গান দিয়ে। এ প্রসঙ্গে ছেঁড়া তার নাটকটির মূল ভাববস্তুটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। এটি রাষ্ট্র সমাজ অর্থনীতি সমাজ জীবন এবং মন্বন্তর কবলিত কৃষক জীবনের বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গের বাস্তব সম্মত সার্থক রূপায়ণ। বাংলার আকালের দিনের অনাবৃত আরসি এটি। সেই দিকে অভ্রান্ত শরনিক্ষেপ করেছে এই গানটি। বাযার চলতি আধুনিক গান হিসেবে চিহ্নিত হলেও এর দ্বারা নাট্যপরিণতির স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে নাট্যকার সর্বাংশে সার্থক হয়েছেন। গানের প্রথম শব্দ দুটি 'ভুলের ফুলে' রহিমুদ্দির সাংসারিক জীবনের প্রতি আমাদের প্ররোচিত করে। মায়ার 'ভুলের' শব্দটি আকালের দিনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় 'তালাক' দানের ভুলকেই সুচিহ্নিত করেছে। 'ভুল' শব্দটি নায়কের 'ভুলে'-রই প্রতীকী দ্যোতনা এনেছে। গানের শেষ চরণগুলি 'না হয় এবার এল পালা/ ধুলায় লুটাবার/ মন ভোলানো বন্ধু হে আমার।'- যেন নাট্য শেষে রহিমুদ্দির উদ্বন্ধনে আত্মহত্যাকেই ব্যঞ্জিত করে। দাম্পত্য প্রেমের অপূর্ব মেলবন্ধনের যে মালা রহিমুদ্দি- ফুলজান গেঁথেছিল, সেই মালাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল দুশমন হাকিমুদ্দি। হাকিমুদ্দির স্বকৃত ভুলও অবশ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী।

পরের একটি শ্লোক এর পরেই বাবুর কণ্ঠের গানটি বেশ অনুধাবনযোগ্য। গানের কথাগুলি এইরকম 'ফালি চান্দের নাও ভাসি যায় আকাশ দরিয়ায়/ জাগার পালা আজিরে হামার নিদালী মায়ায়। কোন খেয়ালী বয়রে খ্যাওয়া দূর দূরান্তরে/ নয়নে না চিনি তারে চিনি যে অন্তরে/... তবু নাগাইল পাওয়া দায়।' সৌন্দর্য রসিক আনন্দবাদের এক অনির্দেশ্য লক্ষ্যে পাঠকদের পৌঁছে দেন মহিমবাবু। এই গানের কথায় ভর করেই স্মৃতির সরণি বেয়ে অতীতের রোমন্থন করেছে রহিমুদ্দি। নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্য ঘটনার দিকে গানটি যেন অঙ্গুলি সংকেত করেছে। হাদিজের সংস্কার ছেড়ে যেন নির্বোধ মায়ের লাঞ্ছনা দূর করার জন্য 'জাগার পালা' শব্দটি প্রযোজ্য। রহিমুদ্দির কণ্ঠে একটি দুই চরণের শ্লোক এবং দুটি গান প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার।

'বড় মিঞার বাঁদীর সাথে যদি হইল সাদী

বাঁদীরে বান্ধিতে নারী খ্যাদে সদায় কাঁদি।'

মোর কোনয় খ্যাদ নাই' - 'বাঁদী' অর্থে এখানে মহিমবাবুর মত আমরাও ফুলজানকেই বুঝি। দাম্পত্যজীবন স্বচ্ছল না থাকলেও দাম্পত্য সুখ ছিলই। কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হতে দিলো না- আকাল, এবং অন্যদিকে হাকিমুদ্দি। একদিকে প্রকৃতি অন্য দিকে মানুষ। দুই দিক থেকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে মানব জীবন; মায় গোটা সমাজ। মূলত রহিমুদ্দির সংসার জীবন। তালাক দানে ফুলজান হাকিমুদ্দির ঘরে একপ্রকারে বাঁদী হয়েই থাকে। অথচ হাকিমুদ্দির লালসা চরিতার্থ হয়নি- এ তথ্যও আমাদের জানা, অন্যদিকে গানের কথাগুলোর সঙ্গে রহিমুদ্দির বিবাহের কোন মিল খোঁজা বৃথা। কারণ, ফুলজান বড়লোকের বাঁদি নয়।- সে সামান্য মুসলমান চাষী রহিমুদ্দির ঘরের ঘরণী বৈ ত নয়। তাকে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে বন্ধ করে রাখতে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়নি রহিমুদ্দিকে। গানটি রোহিমুদ্দির মন্বন্তর কবলিত দাম্পত্য জীবনের উপর নির্মম 'Irony'। সত্যই তার জীবনে কোন রকম খেদ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ যেন তা সহ্য করতে পারেননি। তাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল রহিমুদ্দির দাম্পত্য জীবন। রহিমুদ্দির কণ্ঠের পরের গানটি ছিল -

'হাকিমুদ্দির বুদ্ধি শুদ্ধি চুষি খাওয়ার ফায়দাতে
রোজ নমাজ সবই আছে মনটা খালি ফায়দাতে।।'

গানটিতে রহিমুদ্দি শোষক হাকিমুদ্দির চরিত্রের ভাব সত্যটি প্রকাশ করেছে। পরের গানটিতে কিছুটা ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছে হাকিমুদ্দির উদ্দেশ্যে। গানটিতে মৃত্যুচেতনার প্রকাশ রয়েছে, আর রয়েছে হাসরের ময়দানে বিধি নির্ধারিত শেষ বিচারের প্রসঙ্গ। কয়ামতের বিচারের দিনের প্রসঙ্গ, এবং 'না-পাক' ব্যক্তির জাহান্নামে যাবার ইঙ্গিত ধ্বনিত হয়েছে এখানে। শোষিত মানুষ শোষকের আখেরী বিচারের আশায় ভরসায় বুক যে আজও বেঁধে রয়েছে এমন সত্য প্রমাণিত হয়েছে অবরুদ্ধ হাকিমুদ্দির দৃশ্য উপস্থাপনে। স্মরণীয় গানের অব্যবহিত পরে থাকা গোবিন্দের একটি সংলাপ। বড়য় হক কথা কছিস ভাই রে। আখেরী বিচারের আশা ধরিয়া দুঃখীর দল বাঁচি আছে। মন

কয়, আইজ হউক কাইল হউক বিচার হইবে!' এই গানে রহিমুদ্দি শেষ বিচারের কথা শুনিয়ে গেলেও হাকিমুদ্দির শাস্তির আয়োজন কিন্তু নিজের চোখে দেখে যেতে পারেনি।

গীদাল গোবিন্দের কন্ঠে গাওয়া প্রথম গানটি রয়েছে প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে। সমাজ প্রেক্ষিত ও শোষণ দুর্দশার রূপ বিধৃত হয়েছে এ গানে।

'জঙ্গলেতে জংলী থাকে ভূত থাকে শোশানে
জংলী ভূত হামরা গুলি বাস করি এইখানে।।
রাস্তা ঘাট আর ঘরের দশা দেখি কান্দন পায়
ভাত কাপড় ত্যাল নুন জোটাইতে দম ফুরাইছে হায়।।'

গানের কথার মাধ্যমে নাটকের ভাব সত্যকে প্রতিফলিত করেছে এই গান। মন্বন্তর তখনও গ্রামবাংলা গ্রাস করেনি; তবে অনতিবিলম্বে এইসব হতদরিদ্র মানুষগুলো অসহায়তার শিকার হবে তারই বাণীবাহক এ গান। গানের মধ্যে সাধারণের যে দুর্দশার চিত্র প্রতিফলিত, সেই দূর্দশা থেকে মুক্তি কামনার জন্য অক্ষমের মত ভিক্ষা পাত্রে বিশ্বাসী হলে আর চলবে না। এর জন্য চাই আপন শক্তি দিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা। চাই সংগ্রামী মানসিকতার উদ্বোধন। তাই গোবিন্দ গানের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে যায় সেই সত্য।

'শক্তিহীনের ভক্তিতে ভাই তুষ্ট হয় না কাঁয়ো
জাম্বুবানের এই কথাটা খেয়াল করি যায়ো।।'

-এই ভাবেই গোবিন্দ মূহ্যমান কৃষকদের জাগরণের মন্ত্র শুনিয়ে গেছে এই গানে। মন্বন্তর কবলিত দুর্দশাগ্রস্ত জীবন হতাশা কবলিত হলেও তাদেরই জীবন দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা করে যেতে হবে। গীদাল গোবিন্দ গানে যে কথায় স্পষ্ট বক্তা, সেই প্রসঙ্গই প্রকারান্তরে রহিমুদ্দি নিজের জীবন উৎসর্গ করে তাকেই সার্থক রূপ দিয়ে গেল। নাটকের শেষ দৃশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, গানটির প্রয়োগ কুশলতা তাই এখানে শতাংশে সার্থক ও ব্যঞ্জনাধর্মী।

গোবিন্দের কন্ঠের দুই চরণের পরের গানটিতে কোন গভীর অর্থ নিহিত নেই; কেবলমাত্র কেন জাম্বুবান নামের আড়ালে গান বেঁধে ছিল, তারই কারণ দর্শানো

রয়েছে। কেবলমাত্র 'বাক্যবাণ' শব্দ বিশেষ সত্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য। পরের গানটি রয়েছে দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে। মন্বন্তর প্রবেশ করেছে গ্রামজীবনে। সেই মন্বন্তরের মর্মান্তিক সত্যকে প্রকাশ করেছে এ গান। গানের মাধ্যমেই সমাজজীবনের নগ্ন ও বীভৎস রুপ এভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ গদ্য কথায় সমাজ জীবনের এমন ছবি হয়তো সহজে ফুটিয়ে তোলা যেত না। হাস্য রসের লঘু ভিয়েনে এ গান নাটকের বিষয়বস্তুকে অভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত করেছে। লোকসংগীতের ভিয়েনে এই গানটি রচিত। মন্বন্তর কবলিত স্বামী স্ত্রীর কথাকে তুলে ধরতে গিয়ে মানুষের দুর্নিবার ক্ষুধা সম্পর্কে কৌতুক রসে পরিবেশন করেছে এ- গান। স্বামী তার স্ত্রীকে ডেকে বলেছে যদি মানুষের উদর না থাকতো তাহলে হয়তো মানুষ সুখীই হতো। মন্বন্তর কবলিত অসহায় মানুষের ক্লেশের চিত্র কেবলমাত্র সংলাপের দ্বারা এমনভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। মন্বন্তর প্রপীড়িত কৃষক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে এ গানে। পরবর্তী গানটি বিশ্লেষণে যাবার আগে গোবিন্দ চরিত্রের একটি দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। গীদাল গোবিন্দ চরিত্রের শেষ কথা হল, সে দৈনন্দিন জীবন চর্চায় কৌতুকহাস্য ও রঙ্গপ্রিয়তাকে অবলম্বন করে রাখে। দুঃখ কষ্ট লাঘব করে হাস্যমুখে অদৃষ্টকে তুড়ি মেরে এভাবেই সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। বাক্যবানে শোষক সম্প্রদায়ের মানুষদের বিদ্ধ করায় সে পারদর্শী। সেই সমাজ পরিবর্তন করতে করতে পারে যার নিজের জীবন ধারণ নিয়ে কোনো রকম সংশয় থাকে না, থাকে না কোনো ভয়-ভীতি। তাই তো গোবিন্দ অক্লেশে বলতে পারে 'খাটি খাই গান করি মুই...'। এই হল গোবিন্দের জীবনব্রত। গভীর জীবন সত্যের বাণীবাহক হয়ে ওঠে তার কণ্ঠের গানগুলি। সোনার বাংলাদেশে কেন মন্বন্তর এলো, শান্ত স্নিগ্ধ জীবনগুলোকে-এমন কারণের মূলে মাতব্বরদের শোষণই রয়েছে- এমন কথাযই গোবিন্দ তার গানে বলে গেছে। নিজে জ্বলে জাগরণের শঙ্খধ্বনি যেন পীড়িতরা শুনিয়ে যায়- এমন আশাবাদের কথা শুনিয়ে প্রকারান্তরে রহিমুদ্দী, শ্রীমন্ত কিংবা সরেমামুদদের প্ররোচিত করতে চেয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমন্তের মনে

ধরেছে গানের সহজ-সরল কথাগুলি। তাই তো শিবের গাজন মেলায় গোবিন্দ এই গানটি গাইবার কথা বলে।

মোট কথা, নাটকের তিন অংকের বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে সংযোজিত গানগুলি নাট্যকাহিনি বলয়ের পরিণতির দিকে অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদে এগিয়েছে। অতি আধুনিক গান হিসাবে মায়ার কণ্ঠের গানটি কেবল নয়, রহিমুদ্দী কিংবা গীদাল গোবিন্দের কণ্ঠে প্রয়োগ করা গানগুলি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সঙ্গে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। নাটকের সবকটি গানই নাট্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। নাটকে সংগীত সংযোজনার যে প্রায়োগিক প্রয়োজন পূরণের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছি- তার সবকটিই এ নাটকের গানগুলি যথার্থই মেনে চলেছে।

১৩.২ ট্রাজেডি নাটক হিসেবে বিচার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং মন্বন্তরের ফলে হাত ধরাধরি করে আসা আধিদৈবিক ঘটনা এবং মুসলমান সমাজের মৌলবাদী বিধিবিধানকে কেন্দ্রাতিক বিষয় করে ‘ছেঁড়া তার’ রচিত। নাটকটি প্রাথমিক পাঠে যে সূত্রটি আমাদের হাতে উঠে আসে- তা হ’ল এটি একটি করুণ রসের নাটক। নাট্যপরিণতি দর্শক পাঠকের কাছে করুণ আবেদন রেখে গেছে। সেই দিক থেকে রস পরিণতির বিচারে একটি tragic নাটকের মর্যাদা পাবার যোগ্য এটি। কিন্তু কেন এটি ট্রাজেডি নামক এটি। কোন ব্যক্তি বিশেষের ট্যাজেডি কিংবা একটি জনপদ জীবনের সামগ্রিক ট্রাজেডি - তার বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

মানব জীবনের সম্যক বিপর্যয়ের কথা যে নাটক সোচ্চারে প্রকাশ করে এবং যে নাটক পাঠে বা দর্শনে নাট্য পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে ভয় করুণার সঞ্চার করে তাকে এক কথায় ট্রাজেডি নাটক বলা চলে। এ বিষয়ে Aristotol- এর বক্তব্য স্মরণীয়। ‘Tragedy, then is a imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action not of narrative,

through pity and fear effecting proper plergation of these emotions.'- এক বিশেষ গুরুগম্ভীর পরিমিত আয়তন আশ্রয়ী বিষয়বস্তু বা ঘটনার অনুকরণ, যাতে মানবজীবনের শ্রেয় ও প্রেয়কে হারানোর দ্বন্দ্বে তীব্রতম বেদনার করুণ হাহাকার, কিংবা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার নির্মম অভিঘাতে কোন মানুষের নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দুর্নিবার কামনায় শেষ পর্যন্ত তাকে আত্ম অবলুপ্তির পথে যেতে হয় - এমন বিষাশ্রয়ী ঘটনাই Tragedy পক্ষে গ্রহণযোগ্য। এবং এমন ঘটনার দর্শনে দর্শকের হৃদয়ে কারুণ্য ভীতি ব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করা এবং ভাবমোক্ষণ ঘটে অবশেষে। 'Doing something terrible' এবং 'Suffered something terrible' বিষয়বস্তুই Tragedy নাটকের প্রধান উপজীব্য।

আধিদৈবিক ঘটনা দিয়ে নাটকের সূচনা হয়নি। তথাপি নাটকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তু হয়েছে মন্বন্তর ও তার করাল গ্রাসে কবলিত অসহায়, নিরন্ন ভুখা মানুষ। নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রহিমুদ্দির বাল্য জীবনের দূর্দশার কারণে পড়াশোনা বেশি দূর অগ্রসর হবার সুযোগ না পাওয়ার কথা জেনেছি। অথচ তার মধ্যে প্রতিভার অভাব ছিল না। অর্থনৈতিক অচলাবস্থার কারণে জীবনধারা অন্য পথে অগ্রসর হয়েছে। 'একদিক সামলাইতে আর একদিক ব্যাসামাল। বুদ্ধি সুদ্ধি করিয়া, খাটিয়া খাটিয়া কোনও মতে উজাইনো।' প্রতিকূল পরিস্থিতির নির্মম নিষ্পেষণে এভাবেই তার জীবন পথ পরিক্রমা। গুছিয়ে নিয়ে তারপরে ঘরে এনেছে ফুলজানকে। মোটামুটি ভাবে শান্ত স্নিগ্ধতায় তার পারিবারিক জীবন প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু আচমকাই দুষ্ট গ্রহের মতো এসে পড়ে হাকিমুদ্দির শত্রুতা সাধনের প্রথম ধাপ। ফুল গাছ নষ্ট করায় রহিমুদ্দি গাভি খোয়ারে দিয়েছে মাতব্বর। নাটকে এখান থেকেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'আচ্ছারে দ্যাখা যাইবে'- এটিকে ট্রাজেডি সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু ধরা চলে। Tragedy রূপায়নে রহিমুদ্দির পরিবারের দিক থেকে এটি অবশ্য বিচার্য। অন্যদিকে রহিমুদ্দির পারিবারিক বিপর্যয়ের পশ্চাতে রয়েছে মন্বন্তর। মন্বন্তর একদিকের বৃহত্তর বিচারে প্রান্ত উত্তরবঙ্গের হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামগুলির সাধারণ কৃষক জীবন যেমন একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে বিপর্যয় ডেকে

এনেছে; তেমনি ব্যক্তিগতভাবে বুঝমান রহিমুদ্দির পরিবার হাকিমুদ্দি এবং আধিদৈবিক ঘটনার যৌথ ঘটনায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এ নাটকে। সাধারণভাবে রহিমুদ্দির এই বিপর্যয় দর্শনে দর্শক-মনে Pity এবং Fear-এর উন্মেষ ঘটেছে।

রহিমুদ্দির পারিবারিক বিপর্যয়ের বিশদ বিবরণ- এর পূর্বে আমরা সাধারণ কৃষক জীবনে মন্বন্তরের প্রভাব জনিত কারণে যে বিপর্যয় ঘনীভূত হয়েছিল তার দিকে নজর প্রক্ষেপ করতে পারি। কারণ নাটকে যেমন ব্যক্তি পরিবারের Tragedy ঘটেছে, তেমনি জনপদ জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র ও নাটকে উদঘাটিত। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আকাল প্রসঙ্গ নাটকে প্রথম উত্থপিত হয়েছে। ‘আকালের মত দ্যাখা যায়।’ ইংরেজ সরকারের ‘পোড়ামাটি নীতি’র ফলে সাধারণ মানুষের কণ্ঠাগত প্রাণ। অন্নাভাব এদের ভুখা মানুষের পরিণত করেছে। এর প্রতিবিধানকল্পে তারা মাতব্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে সমবেত হয়েছে। কিন্তু হাকিমুদ্দি স্বার্থ প্রণোদিত ব্যক্তি। অথচ কৃষক মানুষেরা নিজের সামান্য সম্বল পর্যন্ত অপর দিঃখীর হাতে তুলে দিয়ে সমব্যথী হয়েছে। অনাগত দিনের কথা তারা ভাবেনি। সেই রকম মানবদরদি চরিত্র হলো সরে মামুদ এবং শ্রীমন্ত। সবার দুরবস্থার কথা তুলে ধরে সরেমামুদকে বলতে শোনা গেছে- হামরা। সব না খাইয়া মইনো। যা ধান পাছিনো তাতে মোর চলিল হয়। কিন্তু বাড়ির বগলের মানুষ না খাইয়া থাকলে তাক কি ধান না পারা যায়?’ এ কেবল অভুক্তের কথার কথা নয়। অনাহারে-অর্ধাহারে কিংবা অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে গ্রাম বাংলার অসংখ্য প্রাণহানি ঘটেছে। একা শ্রীমন্তের পরিবারের চারজন মানুষ আকালের শিকার হয়েছে। এরা সবাই ধান করেজে নিতে চাই। আগামী বছরে তারা পুনরায় পরিশোধ করে দেবার কথাও দেয়। কিন্তু হাকিমুদ্দি কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত তা মেনে নিতে পারে না। এমনকি মাতব্বরের অপকর্মের পথে সাহায্য করেছে যে কুকরা, জেলে জাবার পর তার বাবা শিয়ালুর গোটা পরিবারও অনাহারের কবলে। তাকেও বিমুখ করেছে হাকিমুদ্দি। মন্বন্তর এবং মাতব্বর হাকিমুদ্দির সুযোগসন্ধানী মনোভাবের যৌথ প্রয়াসে এরা দুর্দশার শেষ ধাপে উপনীত। মন্বন্তর-

প্রাকৃতিক বিপর্যয়; কিন্তু মাতব্বরের মত মানুষের হাত ছিল না এমনটা ঠিক নয়। আবার আকালের সুযোগে জান্তব পশুরাও নিরন্ন মানুষের উপর আক্রমন চালিয়েছে। 'ঘরের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া শিয়ালগুলো ঢুকিয়া ধইচ্ছে টুঁটি কামড়েয়া।' কেবল এখানেই মন্বন্তরের বিষময় পরিণতির শেষ নয়। জীবন বাঁচাতে মানুষ গরু-ছাগলের মতো নিজের পরিবারের সদস্যকে পন্য করেছে। অথচ বিক্রি হয়ে যাওয়া স্ত্রী লোকটিও কোনো রকম প্রতিবাদ করেনি। এখানে মান-অভিমানের কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে তমিজ ও গোবিন্দ-এর সংলাপটি প্রকারান্তরে মন্বন্তরের ভয়ঙ্করাতে ব্যঞ্জিত করেছে।

তামিজ। দুলুর বউটাও আচ্ছা বেটি ছাওয়া। উয়াক বেচাইলে তবু অঁয় কিছু কইলে না।

গোবিন্দ। আরে ভাই যে মানুষটা টাকা দিয়া কিনলে তাঁয় ত' খাবার দিবে? দুলুর ঘরের ধরম ধরি থাকিলে নগদ যে শুটকি হয়া মরা।'

কৃষক জীবনে আকালের তীব্রতা সম্পর্কে শীতু পাইকারের মত শানুল্যা পাইকার। এরা সবাই মন্বন্তরের কবলিত জীবনে আখের গোছাতে ব্যস্ত। এরা আরতদার চরিত্রের মানুষ। যারা কোনরকম সামাজিক অবস্থায় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। মানুষের জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য যখন নানান রসদের অভাব হয়ে যায়- তখন মানুষ নানান স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতেও পিছপা হয় না। এই নাটকে তাই মন্বন্তর থেকে উত্তরণের জন্য মানুষ বিক্রির সংবাদ দেওয়া আছে, রয়েছে গরু ছাগল বিক্রির প্রসঙ্গ। এ সবই মন্বন্তরে জীবন পাড়ি দেবার ইতিবৃত্ত।

মামুদ। আকালে কাম দিলে শোলাবাড়ির শানুল্যা পাইকার। মুল্লুকটার

গরু বলদ কিছুই রাইখলে না। যত আড়িয়া বকনা বলদ

গাই সস্তায় কিনিয়া, দিলে লাল মাটির হাটে চালান করিয়া।

ফিরশুনি সেইটে নাকি ওজন করিয়া গরু কিনে। সের কে

এক টাকা!

মন্বন্তর অধ্যুষিত দিনে জনজীবনের অসহায়তার সুযোগে আরতদার, ব্যবসাদারদের পৌষ মাস। তারা যৎকিঞ্চিৎ দামে গ্রামের সমস্ত গৃহপালিত পশুকে ক্রয় করে নেয়। জীবন বাঁচাতে এই রাস্তা নেয় - দরিদ্র মানুষেরা। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না। সামান্য আহারের সংস্থানের জন্য এদের কেউ কেউ আবার সরকারের মিলিটারি বাহিনীতে যোগ দিতে চাই। মন্বন্তর বাংলার কৃষকের জীবনে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির কাছে মানুষ অক্ষম শিশুর মতই একেবারে অসহায়। কোনোভাবে জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার চিন্তায় বিভোর থাকে এরা। কেউ বা গ্রাম ত্যাগ করে শহরের পথে পাড়ি জমাতে চাই।

গোবিন্দ। 'মুইত দেশান্তরী হয়া শহরে চলি জাবার মন কচ্ছি।'

চলেও যায় সে। কিছুদিন পরে সে তার স্বভূমে প্রত্যাবর্তন করে। ভূমিপুত্র এইসব কৃষক সন্তানদের কি বাঁচার দাবি নেই। অথচ কৃষিসভ্যতায় গোটা দেশটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সরকার যুদ্ধের ধুয়া তুলে তামাম ধান আটক করে রেখে কার্যত মানুষগুলোকে উপোস করে থাকার পথে ঠেলে দিয়েছে 'মানুষের কি বাঁচার কোন দাবি নাই?'- এই প্রশ্নই আমাদের ভাবিত করে। সরকারের 'পোড়ামাটির নীতি' এবং মন্বন্তর কার্যত ট্রাজেডির কারণ হয়েছে বাংলার কৃষক জীবনের। বৃহত্তর অর্থে গ্রামজীবনের ট্রাজেডির রূপায়ণ নাটকে Tragedy-র সংবেদনা সৃষ্টি করেছে।

শিক্ষিত রহিমুদ্দি সরকারের কাছে আবেদন করতে চায় গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার। লঙ্গরখানা খোলার প্রাথমিক চিন্তা কৃষকদের মাথায় এলেও হাকিমুদ্দি লাভের ফায়দা তোলার জন্য সেই আগে ভাগে কার্যসিদ্ধি করে নিজের বাড়িতে এসে লঙ্গরখানা খোলার অনুমতি নিয়ে আসে। সে তা খুলেও ফেলে। মন্বন্তরের পটভূমিতে ব্যক্তিগত ক্রোধ প্রশমিত না হওয়ার কারণে, কায়েমী স্বার্থের হীন চক্রান্তের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে রহিমুদ্দির দাম্পত্য জীবনরও পরিবার জীবন দিনে দিনে ধীরে অথচ নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হওয়ার ঘটনাও নাটকে Pity এবং Fear জাগ্রত করে। শ্রেয়- প্রেয়ের দ্বন্দ্বে একসময় নায়ক রহিমুদ্দির উদ্বোধনে আত্মমুক্তির পথে গিয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায় তার জীবন প্রবাহ। নায়ক রহিমুদ্দির অ্যারিস্টটল কথিত doing something terrible

এবং suffers something terrible বিষয়বস্তুই যে Tragedy-র প্রধান উপজীব্য বিষয়, তারই প্রক্ষেপণ আমরা রহিমুদ্দির সমগ্র জীবনধারায় লক্ষ্য করি। তার জীবনের বিপর্যয় দেখে দর্শক পাঠক একসময় আঁতকে ওঠেন। প্রতিদ্বন্দ্বী, স্বার্থন্বেষী, চক্রান্তকারী হাকিমুদ্দির শত্রুতা সাধনে তার বারবার পরাজিত হওয়াটাকে দর্শক ভালোভাবে নিতে পারেন না। অথচ নাটকে অনিবার্যভাবে রহিমুদ্দি এবং হাকিমুদ্দির সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করল। অভুক্ত বসির ও ফুলজানের হাকিমুদ্দির বাড়ির সরকারী লঙ্গরখানা থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে তাদের প্রত্যাগমনের পরই। মন্বন্তরের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পুরনো ক্রোধকে জাগ্রত করে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে রহিমিদ্দিকে পদানত করতে চাইল মাতব্বর। অথচ রহিমুদ্দি তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে না বলে দৃঢ় প্রিতজ্ঞই ছিল। ফলে suffer’s something terrible-এর অনিবার্য শিকার হলো রহিমুদ্দি। যে রহিমুদ্দি দৃঢ়তার সঙ্গে এক সময় বলেছিল ‘থাকে না ক্যানে’। মোর এও কইরবে’। ‘কিংবা’ মানুষ বাঘ শিয়াল মোক জবের সাতায়। আচ্ছা দেখা যাইবে।’ অথবা ‘আচ্ছা কোনও ডর নাই মাও। ‘খোদার মেহেরবানীতে সব মুশকিল আসান হয়া যাইবে।’ অথচ আমরা তার প্রতিরোধ দেখি। প্রবল বিরুদ্ধ পক্ষের কাছে তার পরাজয়ের ঘটনার সাক্ষী আমরা হয়েছি। এখানেও ব্যক্তি রহিমুদ্দির পরাজয় বরণ, তার পিতৃত্বের পরাজয়, স্বামীত্বের পরাভব দেখে আমরা বেদনাবোধ করি। ভাবি তার এই পরাজয়ে মাতব্বরের কালো হাত যেমন প্রসারিত তেমনি মন্বন্তরেরও প্রভাব সঞ্চাত। এক বুক কাদায়, নোংরা জলে দাঁড়িয়ে থেকেও যে রহিমুদ্দি সেই মেঘের স্বপ্ন দেখেছিল- রহিমুদ্দির বিপর্যয়ে তাই আমরা মূহ্যমান হয়ে পড়ি।

ধীরেদাও, সদবংসজাত চরিত্রই নাটকের নায়ক হবার যোগ্য এ ধারণা আধুনিক Tragedy বিচারের মানদণ্ড হিসেবে তেমন আর গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, মনে রাখা প্রয়োজন যে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী কিন্তু গণনাট্য ও নবনাট্য ধারার মতো আধুনিক নাট্যধারারই একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সে কারণে তিনি রহিমুদ্দিকে বেছে এনেছেন প্রান্ত উত্তরবঙ্গের জনজীবন থেকে। মন্বন্তর কবলিত রহিমুদ্দির পরিবারের ধ্বংসের দৃশ্য নাট্যকাহিনীর সিংহভাগই দখল করে আছে। নাটকে যেমন গোষ্ঠীর ট্রাজেডি চিত্রিত,

তেমনি রহিমুদ্দির পরিবারের যে ট্রাজেডি তাতে মন্বন্তর এবং হাকিমুদ্দি প্রভাবও বর্তমান। বিরুদ্ধপক্ষ হাকিমুদ্দির চক্রান্ত ও কূটকৌশলে রহিমুদ্দি পরাজয় স্বীকার করতে চায় নি। কার্যত নাটকের বেশিরভাগ দৃশ্য জুড়ে রহিমুদ্দি ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে সগর্বে মাথা উঁচু করেই ছিল। চক্রান্তের কাছে সে মাথা নত করেনি- প্রবল ব্যক্তিত্বের; জোরেই, কিন্তু তাহলে তো নাটকে Tragedy সংঘটিত হবে না। তাই একসময় তার পরাজয় অনিবার্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। অসহায়ের মত তাকে এক সময় শ্রীমন্তকে বলতে শুনি, এক নিকিনারা দরিয়াত পড়ি গেছি নিতান্ত কূল কিনারা কিছুই নাই।-' কিংবা তার বিপদের দিনে সর্বশক্তিমান 'খোদাহরম' করেননি। অথচ রহিমুদ্দি উন্নত শির নত করতে চায়নি। অথচ বিরুদ্ধ শক্তির অপকৌশলের কাছে তার পরাজয় একসময় অনিবার্য হয়ে পড়েছে। স্ত্রী পুত্র হাকিমুদ্দির বাড়ির লঙ্গরখানা থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে আসায় রহিমুদ্দির পিতৃত্বের যন্ত্রণা বহুগুণে বর্ধিত হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। অক্ষম পিতার মর্ম যন্ত্রণা এবং এক অপাপবিদ্ধা স্ত্রীর সামনে তার চরম অসহায়তা প্রকাশিত হয়। দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে শ্রেয়- প্রেয়র দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনের মধ্যে সে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে। ফুলজানের মুখে সংবাদ শুনে হাকিমুদ্দির শত্রুতা সাধনের কথা ভেবে তার জাবতীয় কূট চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য রহিমুদ্দি আচমকাই একটি হঠকারীর মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। আর এই ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুরঙ্গপথে তার চরিত্রের ট্রাজেডির বীজটি প্রোথিত হয়। স্ত্রী ফুলজানকে সে তালাক দিয়ে বসে। 'ফুলজান ধরি যাও এই কাগজ। দ্যাখাও জায়া হারামজাদাক। মুই ইয়াতে তোক তাল্লাক লেখি দিছি। আর তুই মোর বিবি নইস-।' একদিকে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি, মন্বন্তর ও ব্যক্তিক্রোধ- অন্যদিকে স্বকৃত ভুল সিদ্ধান্ত- এই দুয়ের যৌথ সংঘাতে সে একসময় চলে জায় শহরে। কিন্তু শহরের বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে কিছুটা সুরাহা হলেও পুত্র বসিরের অসুস্থতা তাকে বড়ই বিচলিত করে তোলে। বসিরকে নিয়ে ফুলজানহারা নায়ক রহিমুদ্দির অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায়। তখনও তার মনে ধর্মের বিধি ও অনুশাসন প্রকট। এক সময় গ্রামে ফিরে আসার সংকল্প এবং ভুল সংশোধন করার অভিপ্রায়ের

বলে সে 'ভুল হামারে'- তার মাশুলও হামারে দ্যাওয়া লাগিবে।' নিজ গ্রামে ফিরেও আসে। মন্বন্তর কিছুটা হলেও গ্রাম্য জনজীবন থেকে অপসৃত হয়েছে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সাহানাত, সরেমামুদ, শ্রীমন্ত, গোবিন্দ- এরা সবাই রহিমুদ্দির ভেঙে জাওয়া সংসারকে পুনরায় জোড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়; কিন্তু এখানে হাদিজের বাধা। ফলে অনিবার্যভাবে কানা ফকিরের দ্বারস্থ হওয়া এবং নিকার জন্য দর কষাকষি ইত্যাদি নিয়ে প্রকারান্তরে কাহিনী এগিয়ে গেলেও মাতব্বরের বাধা আসে। এখানে ফুলজান রহিমুদ্দির মাঝখানে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের মত অলঙ্ঘ বাধা নিয়ে রহিমুদ্দির শত্রুতা এসে উপস্থিত হয়। উন্মত্ত জনতা ক্রোধে ফেটে পড়তে চায়। রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তারা। এসব ঘটনার নায়ক রহিমুদ্দির অসহ্য লাগে। একদিনের জন্য কানা ফকিরের মতো অতীব নিচ ব্যক্তির সঙ্গে ফুলজানের শয্যাসঙ্গিনী হবার ইঙ্গিতে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। নিকার নামে নারীর বেইজ্জতি সে মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারে না। এক সময় সে জোরপূর্বক শক্তি প্রয়োগ করে রহিমুদ্দির বাড়ি থেকে ফুলজানকে টেনে নিয়ে আসে। অসুস্থ ছেলেকে বাঁচাতে তার এই আয়োজন। কিন্তু সংস্কারে আকণ্ঠ নিমজ্জমান নারী ফুলজান। তার কাছে হৃদয় ধর্মের চেয়ে ধর্মের বাধা বড় হয়ে দেখা দেয়। এক সময় হাদিজের বিধান অমান্য করে শহরে চলে যাবার কথা জানায়। কিন্তু তাকে আর দেশান্তরী হতে হয়নি। ভুলের শাস্তির আয়োজন সে নিজেই করে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। শখের দিলরুবার তারে উন্মাদের মতো শক্তি প্রয়োগ করতে থাকে সে। একসময় দিলরুবার তারটি ছিঁড়েও যায়। মানসিক যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে রহিমুদ্দি। ছেলেকে বাঁচানোর তীব্র প্রয়াস এবং ফুলজানকে ফিরে পাবার আগ্রহে- বাধার সম্মুখীন হয়ে একসময় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে উদ্বন্ধনে আত্মহননের পথে চলে গিয়ে জীবনের উপর যবনিকা টেনে দেয় সে।- নাট্যঘটনা ধারায় ধারাবাহিকভাবে রহিমুদ্দির বিপর্যয়ের শোচনীয় দিক এবং অবশেষে আত্মহত্যা এ সবই নাটককে Tragedy-র স্তরে উন্নীত করে দেয়। এবং নাট্য শেষে unmerited misfortune এবং misfortune of a man like ourselves- সবই আমার লক্ষ্য করি রহিমুদ্দির চরিত্রের টানা পোড়েনে এবং তার দুর্ভাগ্যে। তাই রহিমুদ্দির আকস্মিক মৃত্যু এবং চরম

ভাগ্যবিপর্যয় দেখে আমরা ভয় যেমন পাই তেমনি তার জন্য করুণাও জাগ্রত হয় আমাদের চিত্তে। নাটকে রহিমুদ্দির মৃত্যু না হলেও ট্রাজিক সংবেদনার আস্বাদ অপূর্ণ থাকতো না। কারণ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হাকিমুদ্দির কাছে তার পরাজয় এবং মন্বন্তরে তার অবস্থানের দৃশ্য আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে। 'এ নাটকে পরিণতি মৃত্যু না হলেও বিষাদান্তক হোত। কারণ, প্রতিকূল শক্তি, কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে যে দুর্দশা নায়ককে ভোগ করতে হয়েছে, মৃত্যুর চাইতেও তা দুঃখদায়ক- মৃত্যু সেই বেদনাকে আরো গাঢ়তর করে তুলেছে মাত্র। শেষ কথাই বলা জায় যে, নায়কের সম্মুনতি সত্ত্বেও নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ে মানব জীবনের পরিণতিতে আমাদের বিস্ময়, ভয়, করুণা জাগে, আমরা বেদনাবোধে আপ্লুত হই।

অ্যারিস্টটল কথিত Tragedy-র সূত্রে রয়েছে নায়কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে। নায়কের বিচার বিভ্রমের অথবা অন্তর্নিহিত কোন আসক্তি বা দুর্বলতার ফলে। রহিমুদ্দির ক্ষেত্রেও তার স্বকৃত ভুল কিছুটা পরিমাণে দায়ী। তেমনি বাইরের বিরুদ্ধে শক্তির কাছে তার পরাজয়ও প্রদর্শিত হয়েছে নাটকে। রহিমুদ্দির মতো একজন মানুষের জীবনের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে পাঠক-দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় ও করুণার উদ্রেক করে। রহিমুদ্দি এক সময় গভীর ও তীব্রতম অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে ভীষণভাবে। আর গভীর তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব তো সেখানেই সম্ভব- যেখানে দুই পক্ষই সমান শক্তিশালী। তীব্রতম অন্তর্দাহ আসে তখনই যখন মানুষ প্রবৃত্তির বশে বা পরিবেশের চাপে তার হৃদয়ের প্রিয়তমকে, তার আত্মার শ্রেয়তমকে, পরিহার করে, বিনাশ করে বসে নিজেকে। যা জীবনে প্রেয়তম শ্রেয়তম তাকে হারানোর বেদনায়ই জীবনের তীব্রতম বেদনা। যেখানেই জীবনের মহতী বিনষ্টি। এ সবই নায়ক রহিমুদ্দির চরিত্রে যথার্থ ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। আর পরিণামে নাটকটি বাইরের বিচারে যেমন Tragedy করুণ রস নিষ্পত্তি করেছে, তেমনি বিশেষভাবে রহিমুদ্দির জীবনের করুণ পরিণতিতে Pity ও fear- এর উৎসার ঘটেছে। সেকারণে 'ছেঁড়া তার' উচ্চাঙ্গের করুণ রসের নাটক হিসেবে সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেছে।

১৩.৩ অনুশীলনী

১) ছেঁড়া তার নাটকে সংগীতের প্রয়োগে কোথায় বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে? আলোচনা কর।

২) ছেঁড়া তার নাটককে কি আদৌ ট্র্যাজেডির গোত্রে ফেলা যাবে? তোমার অভিমত।

৩) ছেঁড়া তার নাটক কি বিয়োগান্তের সমগোত্রে ফেলা যাবে?

৪) ট্র্যাজেডির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রয়োগ গণনাট্যের আদর্শে কোন আঘাত এনেছে কি? মতামত দাও।

১৩.৪ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) গণনাট্য আন্দোলন – দর্শন চৌধুরী।

৪) গণ-নব-সৎ-নাট্যগোষ্ঠীর কথা – সুধী প্রধান।

৫) ছেঁড়া তার –তুলসী লাহিড়ী – পুষ্পেন্দুশেখর গিরি।

একক ১৪- ছেঁড়া তার কাহিনি বিন্যাস, শৈলীবিচার, সংলাপ ও ভাষার নির্মাণ

বিন্যাসক্রম

১৪.১ 'ছেঁড়া তার'র অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ অনুসারে কাহিনি বিন্যাস

১৪.২ নাটকের শৈলীগত কাহিনির পরম্পরা বিন্যাস

১৪.৩ নাটকের সংলাপ ও নাট্যভাষার নির্মাণ

১৪.৪ অনুশীলনী

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১৪.৬ উপসংহার

১৪.১ 'ছেঁড়া তার'-এর অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ অনুসারে কাহিনি বিন্যাস

অবিস্মরণীয় নাট্যব্যক্তিত্ব তুলসী লাহিড়ী লেখনীস্পর্শে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন সংকটময় পরিস্থিতির এক জ্বলন্ত চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে 'ছেঁড়া তার' নাটকটিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবরর্তীকালের মন্বন্তর কবলিত বিপর্যস্ত অসহায় মানুষের মূক ছবি উঠে এসেছে নাটকে দৃশ্যের পর দৃশ্য বিন্যাসে। নাট্যকার সুকৌশলে একদিকে সমগ্র দেশের এক দোদুল্যমান পরিস্থিতি অপরদিকে রহিম ফুলজানের সোনার সংসারের আর্থিক, সামাজিক ও আত্মীক বিপর্যয়ের এক মর্মন্তুদ ভাষ্য রচনা করেছেন অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে। তিনটি অঙ্কের মোট নয়টি দৃশ্যে নাট্যকার এক স্বপ্নমাখা প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ-প্রধান চরিত্র রহিমের জীবনযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার করুণ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহিমবাবুর নিজের বসার ঘরের এক সুখচিত্র। সূচনায় মায়া ও ভবেশের খুনসুটির মধ্য দিয়ে মহিমের সুখী সংসারের এক সরস বাতাবহ তৈরী হয়েছে। সুশান্ত এসে এই আনন্দের বাতাবহকে করেছে আরো প্রগাঢ়। তবে স্নধ্যাপ্রদীপ প্রজ্বলনের পূর্বে সকালেই সলতে পাকাবার এক প্রস্তুতি পর্ব নেওয়া হয়েছে এই দৃশ্যে। এই আনন্দ সুখঘন মুহূর্তটি যেন পরবর্তী বিপর্যয়ের ক্যানভাস হয়ে ওঠে মূল অংশকে করেছে বেদনাবহ। এই সুখময় পটভূমিকায় রহিমের জীবন বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। একটি মেধাবী ছেলের লেখাপড়া ছাড়তে বাধ্য হওয়া, চাষের কাজে অত্মনিয়োগ অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারকে রক্ষা করে ফুলজানকে বিবাহ, হাকিমুদ্দীর শয়তানি- ইত্যাদি প্রসঙ্গ নাটকের মূল ঘটনা দ্বন্দ্বের পটভুমিকা রচনা করেছে। এসঙ্গে রয়েছে রহিমের উর্বর মানসিকতার সংকেত সুত্র, যথা-পুষ্পাসক্তি, স্বল্প শিক্ষিত হয়েও উন্নত মন ও উন্নত চিন্তার অভিলাষ গভীর জীবনবোধ প্রভৃতি। রহিমের সংগীতপ্রিয়তা ও তাঁর সংগীত প্রতিভা আমাদের মনকে করে স্নাত। কিন্তু ‘সকল খেলার মাঝে’ রহিমের ‘মনে বেদন’ বেজেই চলেছে। তাইতো অবাধে তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে ‘সুখ কি চাইলেই পাওয়া যায়?’ কিংবা ‘চাষা মানুষের যে দুঃখ-কষ্ট ছাড়া কিছু নেই’-এই ভাবেই নাট্যকার মূলঘটনা দ্বন্দ্ব পরিবেশনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতিটি বেশ ভালভাবেই সেরে নিয়েছেন।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য এক পথের দৃশ্য। যুদ্ধ ভয়াবতার নিস্তরঙ্গ সরল গ্রাম্য জীবনকেও করেছে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ। গ্রামের অসহায় মানুষের উপর বর্ষিত হয়েছে যুদ্ধ চাঁদার অভিশাপ। গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দীর উপর চাঁদা আদায়ের ভার ন্যাস্ত হয়েছে। কিন্তু শুরু হয়েছে আকাল। তাই এই সব চাঁদা মাঙ্গন দিতে গরীব কৃষকরা অপারগ । হিন্দু মুসলমান গ্রাম বাসী তাই এসেছে। হাকিমুদ্দির সঙ্গে দরবার করতে। ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে রহিম

হাকিমের গাভী খোঁয়ারে দিয়েছে। রহিম আসাতে শুরু হল হাকিমের সঙ্গে বিতর্ক। রহিমের উপর বর্ষিত হল হাকিমের হুমকি। গ্রামের উল্লেখযোগ্য লোকায়ত সংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে সঙের দলের জাম্বুগানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন। শোষক শ্রেণির চরিত্র।

আলোচ্য দৃশ্যে হাকিমের সঙ্গে রহিমের সংঘাত। স্পষ্টভাবেই আভাসিত। রহিমের তীক্ষ্ণ উক্তি "হামরা ভয়ে মরি। আর তাতে ওই শয়তানগুলা আস্কারা পাই।" হাকিম যে কতটা নীচ, ছলবাজ, স্বার্থপর, হিংস্র-তার প্রত্যক্ষ পরিচয় এই দৃশ্যে পাওয়া গেল।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

রহিমুদ্দির দাম্পত্য জীবনে এক চিত্র রয়েছে দৃশ্যটিতে। ফুলজানের জুতা পরা এবং সেই প্রসঙ্গে ফুলজান বসির এবং রহিমুদ্দির কথোপকথনের রহিমুদ্দির অনুসন্ধিৎসু সংস্কৃতির সম্পন্ন আধুনিক পরিশীলিত রুচিবোধ অবাধেই বেশ নাড়া দেয় আমাদের চিত্তকে। 'ফারাক খালি একটাতে নৌতন কিছু দেখলেই তারা শিক্ষা করি নেয়। আর হামরা আউগাবারে চাই না।' কথাটি যেন এক সুমিষ্ট গন্ধে আমাদের মনকে সুবাষিত করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে রহিমের সেই 'বেদন' সুত্রটি যেন নাট্যকার বইয়ে নিয়ে চলেছেন। তাইতো রহিম গোবিন্দকে বলেছে 'ছাড়ি দাও অন্দরের কথা।' এসেছে নতুন বাজনার প্রসঙ্গ, এসেছে চুরির প্রসঙ্গ। গোবিন্দ শ্রীমন্ত চুরির প্রসঙ্গকে আরো ঘনীভূত করেছে। প্রতিহিংসালিপ্সু হাকিমুদ্দি চুরির দায় চাপাতে চেয়েছে রহিমের উপর। আসলে সাধারণ মানুষের এই আপাত স্বচ্ছল আনন্দোপভোগের ন্যূনতম উপাদানের হাকিমের মত মানুষেরা ক্ষুব্ধ হয়, তারা আর চোখে তাকায়। তাইতো হাকিমের মতো চরিত্রই বেশ মিথ্যার ঘনঘটার পরিস্থিতি গড়ে, 'কেস' সাযায়। রহিম কোলকাতা থেকে কিছু টাকা খরচ করে জামা কাপড় ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি বিলাশ বহুল দ্রব্য কিনে এনেছে। টাকাটা নিশ্চয় চুরির টাকা তাই দারোগা রহিমের বাড়িতে খানা তল্লাসি করতে এসেছে। এই অংশে নাটকীয় ঝঞ্ঝা বেশ দাপটের সঙ্গে গতিশীল। হাকিম প্রাণপণে চেষ্টা করছে অপবাদ রহিমের কাঁধে চাপাতে। অপরদিকে রহিমের দৃঢ় চিত্ততা ও স্থৈর্য ঘটনার

গতীকে তার অনুকূলে নিয়ে গেছে। ঘটনাবহুল এই দৃশ্য খানি নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতে বাস্তব মাটির গন্ধ মিলে মিশে হয়েছে একাকার। দৃশ্যটি তীব্র ও গাঢ় নাট্যবেগ সম্পন্ন। সূচনা দৃশ্যে নাটকীয় কাহিনি দ্বন্দ্বের মৃদু আভাস, দ্বিতীয় দৃশ্যে এই বীজ প্রোথিত হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যে এই বীজের বিস্তার ঘটেছে সর্বনাশা পথে। নাটকের প্রথম অংশেই নাট্যকার দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিতব্য বিষয়কে তুলে আনছেন আমাদের সম্মুখে। রহিমের সহজ উক্তি-'চুরি হল কাল রাতে, জিনিস কিনে এনেছে সাত দিন আগে- যা পাঠক ও দর্শককুলকে আরামভঙ্গি ছেড়ে দিয়ে দৃঢ় নিষ্ঠুর জাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে সৎমানুষের প্রতি অমোঘ নিয়তির এই দুর্বিষহতা আমাদের করে উত্তেজিত। আবার করে খানিকটা বিষন্ন চিত্ত। শেষে মনে পড়ে যায় রহিম ও তার মায়ের উক্তি প্রত্যুক্তি ও দারোগার সঙ্গে রহিমের চলে যাওয়ার পর ফুলজান ও রহিমের মায়ের উৎকণ্ঠিত বিপন্ন বিস্ময় মাখা চোখগুলিকে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হাকিমুদ্দীর কাছারি ঘরে স্বচ্ছলতার চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে যত্রতত্র। কিন্তু নাট্যকার সচেতনতার সঙ্গে নাটকে ব্যক্ত করেছেন যে, দেশে তখন আকাল পড়েছে। কচু ঘেঁচু খাওয়া ছাড়া মানুষের কোন গত্যন্তর নেই। হাকিমুদ্দির শয়তানি ও কু-মতলবের বিশদ চিত্র এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। আকালের সুযোগ নিয়ে সে মানুষকে উত্তেজিত করে গোলার ধান লোক দেখানো লুঠ করাতে চায়। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের চুরির প্রসঙ্গে সুত্রের প্রথম অঙ্কুর কুকড়া যে সমস্ত ষড়যন্ত্রে হাকিমের একমাত্র লাঠি সেটি এই দৃশ্যে ফাঁস হয়ে গেছে। কুকড়া জেলে তার বাপ অভাবে পড়েছে, কিন্তু পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত হাকিম তাকে সাহায্য করতে চায় না। রহিমের 'ব্যামারী' হয়েছিল, কাল সে ভাত পায়নি এ তথ্য রয়েছে এখানে। হাকিম গোলার ধান লুকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র করে। হাকিম-প্রেসিডেন্ট অংশে অভাবের সুযোগ নিয়ে মানুষকে শোষণের ষড়যন্ত্রের চিত্রটি

বড়ই মর্মস্পর্শী। গোবিন্দ-গ্রামের মানুষ অংশে কূটকৌশলী, স্বার্থপর, নীচ শোষক শ্রেণির পরিচয়টি জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটি গ্রাম্য পথ, তা আজ যেন বড় বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মন্বন্তরের ভয়াবহতা, বুভুক্ষের হাহাকারে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। দৃশ্যটির শুরুতেই ভূমিকা অংশে নাট্যকারের যে বর্ণনা কৌশল তা দৃশ্যটিকে আরো ভয়াবহতার, গাঢ়ত্বে নিক্ষেপ করেছে। গ্রাম্য মানুষের বৃত্তি পরিবর্তনের সামাজিক প্রেক্ষিতটি এখানে বড় বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছে। কুদরৎ সহরুল্লার কথায় জানা যায় জোতদার হাকিমুদ্দীর ধান চাল লুঠ হয়ে যাওয়ার কথা। এইপর্বেই রয়েছে গ্রামবাসীর দুঃখ দৈন্যের চিত্র। দুর্ভিক্ষ কবলিত গোবিন্দ মামুদ-তমিজ-শ্রীমন্ত এই সব বাংলার গ্রাম্য প্রতিনিধিদের দুর্দশার কথা এরা নিজে মুখেই বলেছে নাটক। রহিমের কঠিন ব্যাধি তার মাতার মৃত্যু জমি হাকিমের পেটে যাওয়া রোগে শোকে দারিদ্রে তার ব্যাথা জর্জর মূর্তটি বড়ই হৃদয়স্পর্শী। তবু গ্রামের মানুষ রহিমের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। কারণ তার মধ্যে রয়েছে সততা গুণবৃত্তি এক অগাধ সমুদ্র। যে চিত্ত সমুদ্র মন্থন করলে মিলবে ‘মান আর হুশ’ নিয়ে মানুষ- এই এত বড় বোধ যা আমাদেরবোধকে চাবুকের কশাঘাতে জাগ্রত করে। না খেতে পেয়ে যেখানে মানুষ মরছে, জ্যান্ত মানুষকে শিয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ পশু বিক্রি করছে। স্বামী বিক্রি করছে তার যুবতী স্ত্রীকে। খাদ্যের আশায় শহরে পাড়ি দিচ্ছে সহজ নিরিহ মানুষ। লুঠতরাজের ছক কষছে। সেখানে রহিম কিন্তু নিজ নীতিতে স্থির। মনুষ্যত্বের এই উজ্বল প্রতিমূর্তি গ্রামের মানুষকে বুদ্ধি দেয় সরকারের কাছে লঙ্গরখানার জন্য দরবার করতে। এরই মধ্যে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয় রহিমের সেই সিদ্ধান্ত- অভাবের তারনায় সে ফুলজান ও বসিরকে ফুলজানের ফুফার বাড়ি রেখে আসবে। সহরুল্লা আরাল থেকে দরবার করার পরা মর্শশুনে ফেলে। সে খবর সহজেই পৌঁছে যায় হাকিমের কানে। এই সুযোগে হাকিম ও প্রেসিডেন্টের কূটবুদ্ধির যে কৌশলটি তাও নাট্যকার বেশ দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপিত

করেছেন। একদিকে আসবে অর্থ ও অন্যদিকে এই শোষক শ্রেণির মিলবে জনসাধারণের সুনাম। নাটকটি এখানে তীব্র গতিতে প্রবাহমান। একটি উল্লেখযোগ্য নাটক পরিকল্পনার অভিনবত্ব প্রকাশিত হয়েছে এই অঙ্কে। প্রথম অঙ্কের তুলনায় ঘটনা ধারা এখানে অনেক পরিণত। দুর্ভিক্ষের চেহারা এবং মানুষের উপর এর অভিঘাত বেশ মর্মান্তিক চেহারা নিয়েছে এখানে। একদিকে রহিমের মানসিক বিপন্নতা অপরদিকে হাকিমের কূটনৈতিক ঢঙে চরিত্রের ক্রমবিকাশ এই অংশকে বড় বেশী জীবন্ত ও বাস্তবধর্মী করে তুলেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

এই দৃশ্যে রহিমের শূন্যপানে দৃষ্টি মেলে বশে থাকা। ভঙ্গিটি ঠিক যেন 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।' বড় ক্লান্ত সে আজ। বড়ই অবসন্ন। এ অবসন্নতা ঝেড়ে ফেলতেই বোধ হয় দিলরুবাটা নিয়ে এসে ধুলো ঝেড়ে টুংটাং শব্দে বাজাতে শুরু করল। শ্রীমন্ত এল। রহিমের গতকাল ফুলজানকে ফুফার বাড়ি রেখে আসা, ঐ বাড়িতে ফুলজানকে ফের পাঠাবার ভয়ে নিজে না ঢোকা, কর্মহীনতা, গতকাল রহিমের পেটে দানাপানি না পড়া হাকিমের বাড়িতে লঙ্গরখানা বসলেও মান বাঁচাতে সেখানে না যাওয়া- এই সবই রহিম-শ্রীমন্ত কথোপকথনে আমাদের সামনে প্রতিভাত। শ্রীমন্তের আনা কয়েকটা চিঁড়ে খেয়ে পেট ভরায় রহিম। নিয়তিতাড়িত মানুষের দুর্বিপাকে যেমন শেষ নেই ঠিক তেমনি দুর্ভাগ্যপীড়িত ফুলজান ফুফার ঘর এবং শেষে পুত্রের ক্ষুধা সহ্য করতে না পারার জ্বালায় লঙ্গরখানা থেকে বিতাড়িত হয়ে রহিমের কাছে ফিরে আসা, কিন্তু রহিমের হৃদয়ের অন্তরতম প্রতিমূর্তি ফুলজানকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং রহিমের উন্মত্ত অবস্থার আমাদের হৃদয় কে করে বেদনার্ত। 'ছাওয়ার চিড়াটা মুই বাপ হয়া খাইয়া ফ্যালাইনো'- উক্তিটি যেন আমাদের করে বাকরুদ্ধ ও অশ্রুসজল। তালাক দেওয়ার এই ব্যাপারটি যে অস্তিত্বরক্ষার আপ্রাণ প্রয়াস। কারণ সে জানে তালাক দিয়ে ফুলজানের লঙ্গরখানার দাক্ষিন্য গ্রহণে আর কোন বাধা থাকবে না। হাকিমের খলতার

যোগ্য জবাব দিতে গিয়ে তার এই নিরুপায় সিদ্ধান্ত। এই ভাবেই নাট্য ঘটনা climax এর স্তরে উন্নীত হয়েছে। আসলে পুত্রর প্রতি ভালবাসাই তাকে এই আবেগমথিত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। দুমাস ফুলজান এভাবেই বেঁচে থাকবে। রহিম নিজের সঙ্গে নিজের মত করে বাঁচিয়ে রাখবে বসিরকে। তারা শহরের পথে পা বাড়ায়। দুমাস পরে সে বসিরকে তুলে দেবে ফুলজানের কাছে এই প্রতিশ্রুতি ছিল। ফুলজানের জীবনে মর্মন্তুদ ট্রাজিডিকে উন্মোচিত করতে তার একটি মাত্র উক্তই যথেষ্ট- 'ঘর আর মোর তো নয়।'

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শহরে মহিমবাবুর বসার ঘরের দৃশ্য। মহিমবাবু এবং সুশান্তবাবুর কথোপকথনে শোনা যাচ্ছে কলকাতায় বোমা পড়েছে। কলকাতায় এসে রহিম মহিমবাবুর নজরের মধ্যে আছে। মহিমবাবুর অফিসেই কাজ করে। বসার ঘরের এই আলোচনাই শুধু গ্রাম কেন শহর কলকাতাও যে বিপর্যস্ত, দুর্বিপাকগ্রস্ত তার পরিষ্কার আভাস রয়েছে। এই যুগে যে গড়ার চেয়ে ভাঙার কারিগরের মূল্য অধিক তা স্পষ্ট হয়ছে কৃষক ও মিলিটারির তুলনা প্রসঙ্গে। কিন্ত মহিমবাবু পুত্র ভবেশ কে দিয়ে রহিমকে ডেকে পাঠান ও অফিস কামায়-এর কারণ জানতে চান খুবই সহানুভূতির সঙ্গে। রহিমের মুখ থেকে শোনা যায় বসির অসুস্থ, সে মায়ের জন্য কাঁদে। মহিমের পরামর্শও রহিমের গ্রহণ করার সাধ্য নেই। কারণ হদীজের নিষেধ অনুসারে রহিম যেতে পারবে না ফুলজানের কাছে। মুসলমান হয়ে সে যেমন হাদিজ অমান্য করতে পারে না তেমনি ফুলজান হাকিমের বাঁদি হয়ে গেছে, তাই পুত্রকে নিয়ে গিয়ে সে বাঁদির ছেলে বলেও প্রতিপন্ন করতে পারে। একদিকে ভালোবাসা ও স্নেহ আর অপরদিকে সংস্কার ও আত্মমর্যাদা-এই দুয়ের দ্বন্দ্বে তখন রহিম অসহায় পাখির মত শুধুই করেছে ডানার তীব্র বিক্ষেপ। অবশেষে এই সৎ মানুষটি মানবিক বোধের স্তরে উন্নিত হয়ে 'ধর্মকারার প্রাচীরে বর্জ্য' হানবে বলে প্রস্তুত হয়। তাইতো সে বলেছে যে ফুলজানকে তালাক দিয়ে বসিরকে তার মাতৃক্রোর থেকে বঞ্চিত করার মাশুল সে নিজেই দেবে।

পূর্বাঙ্কের দৃশ্য গুলির তুলনায় এই দৃশ্যে লয় একটু ঢিমে তালে এগিয়েছে। তবে এই বিলম্বিত লয় বোধ হয় রহিম চরিত্রের অবসন্নতাকে আমাদের হৃদয়েরে স্পর্শ করাতে চেয়েছে। আসলে এখান থেকেই শুরু হয়েছে নাটকের falling of action তবে এই স্তিমিত মেঘের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে রয়েছে হৃদয় রূপসূর্যের কিরণ ছটা। প্রচলিত মুসলিম সমাজে সংস্কার অতিক্রমী একটা প্রয়াস।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

এই দৃশ্যে নাট্যকার যেন এক হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আকাশে বাতাসে নিঃশ্বাস ছেড়েছেন। এত বিপর্যস্ততা অসহায়তার পরে হয়তো দর্শক বা পাঠকের একটু হাত পা ঝেড়ে নেওয়ার সুযোগ মিলেছে। গ্রাম ছেড়ে দুচোখে একমুঠো অন্নের আশায় শহরে যাওয়া মানুষদের আবার নিজ গ্রামে ফিরে আসার এ এক অভিনব মিলন মুহূর্ত। গোবিন্দ- রহিম সকলেই ফিরে আসছে একে একে। এখানে শোনা যায় গোবিন্দ শহরে গিয়ে কিছু কিছু পয়সা জমানোর কথা । কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মাতটির গন্ধ তাদের আবার মিলিয়ে দিয়েছে এক সাথে । গ্রাম বাংলার এই মাটির গন্ধ উপেক্ষা তারা করতে পারেনি। যে গানটি গেয়ে শহরের পথে সে ভিক্ষা বৃত্তির কাজে যোগ দেয় সেই গানটি মন্বন্তর জর্জরিত দোলাচল অবস্থায় জ্বলন্ত সাক্ষ্য। যার অগ্নি নির্বাপিত হলেও দগ্ধতার জ্বালা ও ক্ষত তখন অম্লান। এই বেদনার বাতা বহ আরো গাঢ়তর হয়েছে রহিমের আগমনে। তবে মেধা বৃত সূর্যের যেন এক ঝলক আস্ফালন আছে এই অংশে। এখানে সকলেই শহরে গিয়েও শত বাধা কষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও ফিরে আসে গ্রামে। গ্রামের সবুজ মাঠ ঘাট এক দর করেছে রসসিক্ত উদ্দীপত জীবনযুদ্ধে তলিয়ে যাওয়ার পরি স্থিতি থেকে উঠে এসেছে এরা বিশ্বালোকের প্রাঙ্গনে। এখানেই রয়েছে আলোর ইঙ্গিত। নিবিড় ঘন আঁধারে যেন এরা সত্যি দিশাহারা হয়নি। পথ হারায় নি।

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

রহিমের আর্থিক বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্ব এটি। অন্ধ কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির বশবর্তী হয়ে হৃদ্যজাত মনুষ্যত্ব ধর্ম-ভালোবাসা কিভাবে মাথা কুটে মরে তার জ্বলন্ত জীবন ভাস্কর্য এটি। রহিমের মানসিকতার প্রত্যেক গুণাবলী খোদিত তার চরিত্রে। জীবনে শেষবারের মতো এবার সে দিলরুবায় সুর দিতে চায় দাওয়ায় বসে। ফুলজানের বিবাহে মত আছে। নিকা করে তালাক দিলেই রহিম তাকে ঘরে আনবে। কিন্তু যে কানা ফকির এই বিবাহে আরো দশ টাকা চায়। কটূক্তির মধ্য দিয়ে ফকির, হাকিম সকলেরই উপস্থিতি মধ্যে এখানে রয়েছে। অবশেষে আত্মহত্যা করেছে সে। পুত্রর অন্নের সংস্থান প্রেমের গাঢ়ত্ব এবং হাদিজের নিষেধকে অতিক্রম করেও অবশেষে এই আত্মহনন আমাদের কাছে রহিমের বেদনাজর্জর মূর্তিকে স্পষ্ট করেছে। সত্যই তো তার জীবন দ্বীপ হল নির্বাপিত। জীবন বাদ্যের ছিন্ন তারে রয়েছে আহত অন্তরাত্মার প্রতিকৃতি। কিন্তু চারিত্রিক এতটা আলোক বিক্ষেপের পরও শেষে অন্ধকারে স্থবির হয়েছে রহিম- আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে। ওই ছিন্ন তার যেমন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানুষকে বিরত করে সুমধুর সঙ্গীত থেকে ঠিক তেমনি সাজানো গোছানো পরিপাটি রহিম চরিত্র যেন হঠাৎই বিচ্যুত হয় জীবন তরণীর গতিপথ থেকে। এই বিচ্যুতিও অগৌরবের নয়। বরং তা চিহ্নিত করে কোন অসহায় ও মানসিক দ্বন্দ্ব মানুষকে নিজের অস্তিত্ব বিনষ্ট করতে বাধ্য করে। আমরা হই অগ্নিশর্মা তাদের ওপর যারা শতশত জীবননাট্যের কুশলী শিল্পী অর্থাৎ এই সাধারন মানুষকে করে জীবন অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রবল ধিক্কার এই শোষকশ্রেণির প্রতি। নাটকের বিষয় বিন্যাসে তুলসী বাবু আধিদৈবিক বিপর্যয়, এবং মৌলবাদী নিদানের সমন্বয়ে মানবজীবনের যোগ ফলটি সমাধান করতে চেয়েছেন। ফলে বৃহত্তর জনজীবন এবং ব্যক্তিক পারিবারিক জীবন অপূর্ব সুষমায় প্রস্ফুটিত হয়েছে এ নাটকের তিনটি অঙ্কের মোট নয়টি দৃশ্যের বাতাবরণে।

১৪.২ নাটকের শৈলীগত কাহিনির পরম্পরা বিন্যাস

বিগত শতাব্দীর চারের দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আর্থ-সামাজিক দিকের বিপর্যয় এবং যুদ্ধের প্রায় হাত ধরাধরি করে সমাজজীবনের ঢুকে পড়া মহামারী-মন্বন্তর এবং অসংখ্য প্রাণহানি- এ সবের সঙ্গে সমকালীন মানব জীবনকে অন্বিষ্ট করে জীবনের যোগ ফলটির সমাধান করেছেন। জীবন সম্পর্কে তুলসী বাবুর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে এ নাটকে। যুগপৎ বাধা-বিপত্তি সংশয়, দুর্বল অর্থনীতি, পঙ্গু সমাজ জীবন - এ সবের নীচে চাপা পড়ে যায় নি তাঁর নাটকের জীবনগুলি। প্রতিটি স্তরে এইসব অসহনীয় অবস্থা থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেকে মেলে ধরেছে। এই পর্বে অবিস্মরনীয় সৃষ্টি 'ছেঁড়া তার' বিভিন্ন আধিদৈবিক ঘটনা এবং মৌলবাদী শাসকদের অমানবিক বিকৃত হদীজ নিদানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এ নাটক রচিত। এটিকে মন্বন্তরের দ্বিতীয় পাঠ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ নাটক জ্বলন্ত বাস্তবতার জীবন্ত দলিল। মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে ফোকাস রেখে এ নাটকটি অন্যরকমের স্বাদ বৈচিত্রের অবতারণা করেছে। এ নাটক রহিমুদ্দি ফুলজানের দাম্পত্য সমস্যাকে একটা Tragic point-এ দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় অনাবিল জীবনরসের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার অবকাশ পেয়েছি আমরা। নির্মম অথচ অতি খর রিয়েলিটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ নাটক।

প্রথমে বিভিন্ন অঙ্ক দৃশ্য বিভাগ অনুযায়ী পাশ্চাত্য রীতির প্রয়োগ দেখবো নাটকটির গঠন কাঠামো বিচার করবো। শিল্পোত্তীর্ণ নাটক হিসেবে আমরা প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যকে Rising Action হিসাবে বিচার করতে পারি। কিছুটা Flash Back পদ্ধতির প্রয়োগে এই দৃশ্যে নাট্যকার নায়ক রহিমুদ্দির বাল্যাবস্থার দিকে আলো ফেলেছেন। ক্লাসের ফার্স্ট বয় হয়েও দারিদ্র্যের চাপে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে না পারার খবর আমরা এ দৃশ্যে অবগত হয়েছি। পরবর্তী দ্বিতীয় দৃশ্যে রহিমুদ্দি গ্রামে ফিরেছে। সেই পুরোপুরিভাবে নাট্য ঘটনা ধারার কেন্দ্রভূমে এসে পড়েছে। আমরাও জেনেছি সৌন্দর্য রসিক রহিমুদ্দির সাধের ফুলের গাছ মাতব্বর হাকিমুদ্দির বাগান ধ্বংস করায় রহিমুদ্দি তার গাভীকে খোয়াড়ে দিয়েছে। ফলত রহিমুদ্দি ও হাকিমুদ্দির চির প্রতিদ্বন্দ্বীতার সূচনা

লক্ষ্য করি এই দৃশ্যে। দু'জনের সংঘর্ষের সূচনা হয় এই দৃশ্যে। কিছু অংশ তুলে ধরা যেতে পারেঃ-

হাকিম। মাথা তোর অনেক দিন হয় গরম হইছে।

রহিম। কিসে গরম দেইখলেন?... বাপজান সিধা মানুষ আছিল। তাতে তাক ঠকেয়া বড়য় সুখ কইচ্ছেন। মোক পারেন না- তাতে পাজী?

হাকিম। কি কলু? মুই ঠক? মানুষ ঠকাই?

রহিম। ভুঁইগুলা মোর তোমার প্যাটে গেল ক্যামন করি?'

-এভাবেই ধীরগতিতে উভয়ের সংঘাতের সূচনা হয়। এই দৃশ্যেই রহিমুদ্দি হাকিমুদ্দিকে শয়তান বলায় সে মানহানির মামলা করার কথা বলে শাসিয়েও যায়। এ বিষয়ে অপরকে হাকিমুদ্দি সাক্ষীও মানে। 'আচ্ছারে দ্যাখ্যা যাইবে'- বলে সে বলেও জায়। ফলে এই সংলাপের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী দৃশ্যের ঘটনাধারা নির্ণীত হবে- এমন আভাস দর্শক পাঠক অনতিবিলম্বে অনুমান করে নিতে পারেন। প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে নাট্য বিষয়ের কেন্দ্রে এসেছে নায়ক রহিমুদ্দির ঘরের দাওয়া আর শহর থেকে নিয়ে আসা ভালো শাড়ি এবং high hill জুতো পায়ে দেওয়াকে ঘিরে পুত্র বসিরের চিৎকার এবং সুখী দম্পতি রহিমুদ্দি ফুলজানের খুনসুটি এবং সহাস্য সংলাপের বিনিময় হাকিমুদ্দি রহিমুদ্দির সংঘর্ষের মধ্যে নিয়ে আসা Dramatic ও Comic Relief হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু পর মুহুর্তেই যেন সেই Relief দেবার সুরটি বড় বেসুরো হয়ে পড়ে গোবিন্দের মুখে তিস্তা ঘাটের নৌকার চুরির কথা শুনে। আবার একবার সংঘর্ষের সূচনা হয়। পুলিশ তল্লাশির কাজে এসে রহিমুদ্দির মায়ের শয়ন কক্ষ থেকে রামেশ্বর সিং উদ্ধার করে চুরি যাওয়া জিনিস। উদভ্রান্ত রহিমুদ্দি এমন সময়ে ক্ষিপ্ত হয়ে হাকিমুদ্দি উপর আক্রমণ করে। এই ভাবেই Rising Action একটা Turning Point- এ উপনীত হয়েছে এখানে। আকাল প্রবেশ করেছে গ্রামে। মাতব্বরের কাছারি ঘরে দুর্ভিক্ষের সময় সুযোগ সন্ধানী কায়েমী স্বার্থের চিত্র এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। ছদ্ম ভালোমানুষির আড়ালে হাকিমুদ্দির শঠতার পরিচয় এই অংশে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এবং হাকিমুদ্দির শলা-পরামর্শ যেন Dramatic crisis এর অভ্রান্ত

পূর্বাভাস। সারা বছরের খাবারের সংস্থান করে যে শ্রীমন্ত ধান বিক্রি করতো সেও আজ হাকিমুদ্দির কাছে অভুক্ত অবস্থায় এসেছে। অন্যদের সঙ্গে সেও দরবার করতে এসেছে। কারণ দরদী শ্রীমন্ত পরোপকারী বলেই অন্যের অনাহারে নিজের গোলাজাত ধান বিলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মাতব্বর হাকিমুদ্দি তাদের দুর্দিনে ধান দিতে চায় না। অন্যায় ভাবে বেশি টাকা চেয়ে বসে। 'করজ দ্যাওয়াটায় ভাল। যদি বা ধান দিতে চায় খাতক গুলাক কমো এ সালের বাজার দাম-এর মত টাকার ধান হামি আর সাল চাই।'

এরপর নাট্যদ্বন্দ্বের মূল কেন্দ্র climax-এ নাট্য কাহিনি উপনীত হয়। দুর্ভিক্ষ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করার খবর দিয়ে দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনা হয়েছে। রহিমুদ্দির মায়ের মৃত্যু হয়েছে। এই দৃশ্যে গোবিন্দ, শ্রীমন্ত, মামুদ এবং তমিজ রহিমুদ্দিকে নেতা হিসেবে নির্বাচন করেছে। সবাই লুটের জন্য তৈরি। 'হুকুম দিয়া দ্যাখ'- বলে গোবিন্দ প্রত্যক্ষে রহিমুদ্দিকে সংগ্রামী জননেতার ভূমিকায় উপনীত করে দিয়েছে। দর্শক পাঠক টানটান উত্তেজনায় ভাবতে শুরু করে যে, রহিমুদ্দি এইসব ক্ষুধার্ত মানুষদের নিয়ে এবার ধনীর ধানের গোলা লুট করতে এগিয়ে যাবে। এ সবই climax-এ নিয়ে জায় নাট্য কাহিনিকে।

এই রকম হালকা হলেও Climax- এর ধারা অব্যাহত থাকে বসির এবং ফুলজানকে তারই ফুফার কাছে রেখে আসতে চাওয়ায়। এই দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘটনাবলী বেশি গতিময়তা লাভ করেছে। কারণ ফুলজান বসিরকে ফুফার বাড়ির কাছে রহিমুদ্দিই ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। কিন্তু ফুফার কাছে অপমানিত হয়ে তারা ফিরেও আসতে বিলম্ব করেননি। ফলে নাট্য ঘটনা ধারায় লেগেছে দ্রুততার হাওয়া। প্রথমত বসিরকে সঙ্গে করে ফুলজানকে হাকিমুদ্দি বাড়ির লঙ্গরখানায় পাঠিয়ে দেবার ঘটনায় এবং বসিরের খবর না পেয়ে ফিরে আসা আসা এবং ঘটনার অভিঘাতে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে রহিমুদ্দির উদ্ভ্রান্ত হওয়ায় climax-এর শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে নাট্যঘটনাধারা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও রহিমুদ্দীর পুত্রের করুণ মুখ, এবং নিস্পাপ অপাপবিদ্ধা স্ত্রী ফুলজানের অসহায় চোখের ভাষা বুঝতে পারে সে। ঘটনার মুহুর্মুহু অভিঘাতে, নিজেকে অসহায় পিতা, অক্ষম স্বামী বলে হয়তো মনে করে থাকতে পারে

সে। কিছু একটা করতে হবে, না পারার বেদনা বোধ তাকে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দেয়। কোন এক অজানা বোধ তাকে কেবল ক্লান্ত, ক্লান্তই করে তোলে। এক সময় তার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তিও Error of Judgement- এর শিকার হয়ে পড়ে। ফুলজানকে তালাকের ফরমানপত্র তুলে দিয়ে বলে 'খাওয়াবার পারি নাই। কিন্তু মোরে জন্য তোর খাওয়া বন্ধ হচ্ছিল। তাতে তোক ফারকাৎ করি দেনো।' স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এবার তার প্রায়শ্চিত্ত করার পর্ব শুরু হবে। দুঃখের দহন জ্বালায় তার এবার নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই সংঘাতের পর্ব। বসিরকে নিয়ে সে এবার শহরের দিকে পাড়ি জমাবে। একদিকে সন্তানকে দূরে রেখে জননী যেমন সুখে থাকতে পারবে না, তেমনি রহিমুদ্দির তালাকের ফলে তার ঘর আর ফুলজানেরও থাকলো না। এবার স্রোতের টানে খড়কুটোর মতো আশ্রয় হারা হয়ে হাকিমুদ্দি বাদী হয়ে থাকার সূচনাপর্ব এটি।

এরপর তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য মূলত পরিণতির দিক থেকে Falling Action-এর পর্যায়ে পড়ে। এই অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে রহিমুদ্দির গ্রামে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা দেখানো হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দৃশ্যে এক সময় মন্বন্তর কবলিত গ্রামীণ কৃষকেরা রহিমুদ্দির উপর জাবতীয় আক্রোশের প্রতিবিধান আইন যেন নিজের হাতে তুলে নিতে চেয়েছে। বসিরের অসুস্থতা আর কান্না নাট্য ঘটনাকে করুণ রসের যোগান দিয়েছে। কানা ফকিরকে মাধ্যম করে পুনরায় ফুলজানকে রহিমুদ্দির সংসারে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় নাট্যদেহে Cathersis বা ভাববিমোক্ষণের সন্ধান মেলে। অবশেষে নাট্য ঘটনা Crisis –এ উপনীত হয়েছে। একসময় উদ্বন্ধনে রহিমুদ্দির স্বেচ্ছামৃত্যু এবং তার মৃতদেহের উপর উন্মাদিনীর মত ফুলজানের লুটিয়ে পড়ায় দর্শক পাঠক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। একটি পরিবারের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে আর স্থির থাকতে পারেন না দর্শক পাঠক।

১৪.৩ নাটকের সংলাপ ও নাট্যভাষার নির্মাণ

সংলাপ নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। সংলাপের দ্বারা নাট্য চরিত্রের অন্তরের ও বাহিরের পরিচয় সহজে উন্মোচিত হয়। ব্যথা-বেদনা, ক্রোধ চরিত্রের উন্মাদনা, এসবই সংলাপের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। মূক ও বধির যেমন নানান অঙ্গভঙ্গির তাদের চাওয়া পাওয়া

কিংবা মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তেমনি নাট্যচরিত্রও সংলাপের সাহায্যে তার মানসিক অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করে। নাট্যকারকে সংলাপ রচনার সময় বিশেষ যত্নবান হতে হয়। কারণ, নাটকের মধ্যে তার সৃজন করা পাত্র-পাত্রী উপস্থিতি থাকে; কিন্তু নাট্যকার থাকেন সবার অন্তরালে। চরিত্রই নাট্যকারের মুখপাত্র। কেননা, চরিত্রের দ্বারাই নাট্যকার নাট্যবিষয়ের কথা যেমন প্রকাশ করেন তেমনি সমাজ বাস্তবতাও সামাজিক নাটকে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। সার্থক সামাজিক নাটকের কৃতিত্ব যেমন বিষয়বস্তু নির্ভর, তেমনি সেই বিষয়বস্তুকে দর্শক পাঠকের মনের গহীনে প্রবেশ করাতে গেলে চাই সংলাপের হাতুড়ির আঘাত। তবেই তা সহজে আবেদন রাখতে পারবে দর্শক পাঠকের মনিকোঠায়। নাট্য চরিত্রের সংলাপ রচনায় নাট্যকারকে চরিত্রের শ্রেণী পরিচয় সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। ঠিক শ্রেণীর চরিত্রের মুখে সঠিক সংলাপ যদি না বসানো যায়- তবে চরিত্র সেক্ষেত্রে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। তাই সংলাপ রচনায় নাট্যকারকে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। নাটকে চরিত্র ও চরিত্রের ভাষা যদি পার্বতী পরমেশ্বরের মতো অদ্বয় সম্পর্কে অম্বিত হয় তবে সে নাটক সার্থক হতে বাধ্য। আর সংলাপের সার্থক প্রয়োগের উপর নাটকের সাফল্য-কিংবা ব্যর্থতা যেমন নির্ভর করে, তেমনি নাট্যকারের বক্তব্য নাটকে সহজেই দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াবার ভূমি পায়।

পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর এবং মুসলিম মৌলবাদীদের ধর্মীয় চেতনা এবং জীবনের পক্ষে যা বয়ে আনে সেই বিপর্যয় কোরানের বিকৃত বিধানের বিরুদ্ধে জেহাদী মেজাজে তুলসী লাহিড়ী ‘ছেঁড়া তার’ লিখেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে তুলসী গণনাট্য ও নবনাট্য ধারার নাট্যকার। তিনি গণনাট্য সংঘের সভাপতিও একসময় ছিলেন। তাই গণনাট্যের সাফল্যের বিষয়ে সংলাপের অপরিসীম গুরুত্বের কথা তিনি বেশ ভাল করেই জানেন। ‘দুঃখীর ইমান’ কিংবা ‘পথিক’ নাটকের সংলাপ রচনার কৃতিত্ব মনস্ক পাঠক আজও মনে রেখেছেন। ‘বাংলার মাটি’র সংলাপ রচনার ক্ষেত্রটিও ছিল বেশ সমৃদ্ধ ও যথেষ্ট মজবুত। ঠিক একইভাবে সেই সাফল্য এসেছে ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের সংলাপ বয়নে। সংলাপে তিনি তীব্র ও প্রখর বাস্তব চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত কৃষক সম্প্রদায়ের ছেঁড়াফাটা জীবন বৃত্তান্ত এবং মৌলবাদীর নিষ্ঠুর বিধান আশ্রয়ী এ নাটক। কার্যত সেই কারণে ভূমিপুত্র কৃষক জীবন যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি কাহিনীবয়নের কুশলতার গুনে শহরবাসী চরিত্রও এসেছে। সংলাপের সার্থকতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ণয়ে এই উভয়দিকের প্রতি সচেতন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দুই বিবদমান গোষ্ঠী শোষক শোষিত এদের শ্রেণি সংঘাত দেখানোর ক্ষেত্রে, নাট্যকার সংলাপের প্রয়োগে ক্ষেত্রে সাফল্য কতটা রেখেছেন এবং এদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারা শ্রেণি দ্বন্দ্বের রূপটি কেমন ভাবে প্রকাশিত তাও বিচার করা প্রয়োজন।

মাত্র দুটি দৃশ্যের মিতায়তনে চিত্রিত হয়েছেন নায়ক রহিমুদ্দির বাল্যবন্ধু মহিমবাবু। সঙ্গীত রসিকবাবু মহিমবাবু বেশ রসিকতা প্রিয় মানুষ। তাঁর নিজের রয়েছে বাগানের সখ। সেই বাগানের সৌন্দর্য মুগ্ধ করেছে বাল্যবন্ধু সৌন্দর্য রসিক রহিমুদ্দিকেও। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহিমবাবু নিজের পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে তার দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে বলেছেনঃ-

“আমার ঘরের ফুলবাগান দেখেছিস? এটি আমার ছেলে ভবেশ, কলেজে ঢুকেছে এবার। এটি মেয়ে মায়া, Matric দেবে আসছে বার। আর পাতাবাহারটি বাড়ির ভিতরে।”

রসিকতাপ্রিয় মানুষের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ‘আমার ঘরের ফুলবাগান’ এবং ‘পাতাবাহারটি’- শব্দগুলির প্রয়োগকুশলতায়। বুদ্ধিমান শ্রেণীতে প্রথম হওয়া রহিমুদ্দি বাল্যজীবনের প্রকাশ করতে গিয়ে নাট্যকার যেমন সংলাপ প্রয়োগের কুশলতা প্রদর্শন করেছেন, তেমনি বর্তমান সংসারজীবনে প্রবেশ করলেও যখন বাল্য বয়সের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, সেই মুহূর্তের সংলাপে মহিমবাবুর কণ্ঠে অমলিন সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে যেমন ঠিক তেমনি চিরকালের সহজ সত্যটি উন্মোচিত হয়েছে।

“কুছ পরোয়া নেহি রহিম। নিজের মেহনতের পয়দা করে নিজে খাচ্ছিস, আর দশজনকে খাওয়াচ্ছিস তুই। দুনিয়ার অন্নদাতা তোরা। তোরা কি ছোট রে?”

মানুষ মনের আনন্দে হারিয়ে ফেললে অনেক সময় শ্রেয় এবং প্রেয়ের মধ্যে সংঘাতকে টেনে আনে। অনেক সময় জীবন সম্পর্কে অনীহার প্রকাশও ঘটায়। রহিমুদ্দিও একসময় নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়। রহিমুদ্দি ও মহিমবাবু এই এখান থেকে সংলাপ শুরু করুন। প্রসঙ্গের কিছুটা অংশ তুলে ধরা যেতে পারে।

রহিম। না- বাবু এখান থেকে সংলাপ শুরু করুন। হামার মাথা কি খারাপ হয়। চাষার আবার

জীবন! তার আবার আনন্দ!

মহিম। দ্যাখ রহিম, যার কাজ যত কষ্টসাধ্য, তাকে বাঁচাতে হলে সেই পরিমান আনন্দ চাই।

মন স্ফূর্তি রাখতে হবে।

এই অংশে জীবনধারণের সুচিকিৎসার মহৌষধী প্রয়োগ করতে চেয়েছেন তা এককথায় অনবদ্য। পরের একটি সংলাপ কথার পিঠে কথার মোক্ষম চাল। 'সুখ কি চাইলেই পাওয়া জায়'? মানুষের জীবনে আনন্দ উপভোগ অধিকার রয়েছে। অবশ্য এও তিনি জানেন যে সাদাকালো পরস্পর বিরোধী উপস্থাপনার মতো জীবনেও সুখ-দুঃখের মেল বন্ধন রয়েছে। এরই মধ্যে থেকে মানুষকে দিন যাপনের গ্লানি দূর করতে হয়। দুঃখের ভেতর থেকে সুখ খুঁজে বের করে নিতে হয় তাকে। এর জন্য মানসিক শক্তি এবং চরিত্রের দৃঢ়তা। আশাবাদী মানুষ মহিমবাবু, তাই তো তিনি যুক্তি দিয়ে বলেনঃ- মানুষ সারাজীবন আনন্দের আশাতেই দুঃখ কষ্টের সঙ্গে লড়ে।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য বিবদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত- সংঘর্ষের আভাস দিয়েছেন নাট্যকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া গ্রামজীবনের বিস্তর প্রভাব ফেলেছে। যুদ্ধের চাঁদার, রাজার মাগুন দিতেই হবে সাধারণ কৃষকদের। অথচ যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে এরা রোগভোগ, অনাহার অর্ধাহার আর ছিন্ন বসনে কালাতিপাত করে। তারই চকিত উদ্ভাস হয়েছে দ্বিতীয় জনৈক চরিত্রে।

মিঞা! ব্যাম্যারে ভুগিয়া- না খায়া- আর ফাটা, কাপড়া পিঁধিয়া বেটি ছাওয়াল গুলোর যে ছুরৎ হইছে না- হামারে দেইখব্যর ইচ্ছা করে না। পল্টন ওগুলাক দেখিয়া প্যাত্তানী

ভাবিয়া ডরে পালাইবে। যুদ্ধের অনিবার্য প্রভাবে মন্বন্তরের যে দৃশ্য এখানে উন্মোচিত তাতে দরদী সমাজ মনস্ক নাট্যকারের সমাজ অন্বেষার দৃষ্টান্ত বেশ প্রোজ্জ্বল। দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বচ্ছ। খোয়াড়ে রহিমুদ্দি দিয়ে এসেছে হাকিমুদ্দির গৃহপালিত গাভীকে। ফলে তার একাজে ক্রুদ্ধ হয়েছে মাতব্বর হাকিমুদ্দি। বাগান ক্ষতি করার চেয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে রহিমুদ্দির। কার্য - কারণের মধ্যে অনিবার্যতায় এসেছে সংঘাত। সংঘাতের পটভূমি ছিল একেবারে সংলাপ নির্ভর।

রহিম। কি করা যায়। রোজ দিন জিরাৎ খায়া খায়া যায়। আইজ মাথা গরম হ'য়া গেল।

হাকিম। মাথা তোর অনেক দিন গরম হইছে।

রহিম। কিসে গরম দেইখলেন?

-শোষক হাকিমুদ্দির মুসলমান চাষীরা শোষণের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একটি প্রশ্নাত্মক চিহ্নের বাক্য প্রয়োগ।

রহিম। ভুঁইগুলো মোর তোমার প্যাটে গেল ক্যামন করি?

হাকিমুদ্দির পাওনা টাকা- শোধ এভাবেই হয়েছে- এমন ব্যাখ্যা দিয়ে বিষয়টিকে হালকা করার চেষ্টা বৃথা। 'হক' বললেও তা কিন্তু আদৌ হক ছিল না, একথার প্রমাণ নাটকেই রয়েছে।

শ্রীমন্তের কথায় "মানুষটা সহজ নয়রে! দারোগা নিসপিটার সব ত্যালেয়া ত্যালেয়া হাত কইচ্ছে। এবার নজর আলী আকন্দক হটেয়া অয় প্রেসিডেন্ট হইবে। বুদ্ধি উয়ার জবের চোখা। অত্যাচারীর অত্যাচারের, শোষণের সমাপ্তি একসময় প্রতিরোধের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। শোষকের পরাজয় ঘটে সঙ্ঘবদ্ধ এবং শ্রেণি সচেতন মানুষের কাছে। দুঃখিরা মনে করে প্রতিটি সূচনারও একসময় সমাপ্তি হবেই। তাই তো রহিমের গানের পর এরপর গীদাল গোবিন্দ বলেঃ-

আখেরী বিচারের আশা ধরিয়া দুঃখীর দল বাঁচি আছে। মন কয়, আইজ হউক, কাইল হউক বিচার হইবে!

নাটকের শেষ দৃশ্যে সমবেত জনগণের কাছে অবরুদ্ধ হাকিমুদ্দি জাতনা প্রাপ্তির ঘটনা গোবিন্দের দিব্যদৃষ্টিকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছে। রহিমুদ্দির সঙ্গে চরম শত্রুতার পথ তৈরি করেছে মাতব্বর হাকিমুদ্দিই। সেই সংবাদ অবগত হয়ে রহিমুদ্দি কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়ে না। বরং নিজের প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে তাকে বলতে শোনা গেল-

মিছা ভাবিত হইস না। হামারা ভয়ে মরি। আর, তাতে ওই শয়তানগুলা আস্কারা পায়। কারবালা ময়দানে জান দিয়া হামার হাসান, হামার হুসেন দ্যাখেয়া গেইছে যে বেইমানের যতই হিম্মত হউক মুসলমান তার আগে শির ঝুকাইবে না। এতে প্রমাণিত হয়ে জায় যে মুসলমান হিসেবে, রহিমুদ্দি কেবলমাত্র স্বীয় বিপদ সম্ভাবনায় চিন্তিত যেমন নয়, ঠিক তেমনি আত্মদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়তে চায় সে নিজে যেমন, তেমনি প্রবল প্রতিরোধ গড়ার জন্য অন্যদেরকে পরোক্ষে সে উদ্বোধিতও করেছে। বুদ্ধিমান, শিক্ষিত রহিমুদ্দি মাতব্বর হাকিমুদ্দির চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ নিজের বয়সের ভারে জেনেছে। আর বুঝেছে হাকিমুদ্দির শোষক রূপের সম্যক রূপ। সেকারণে হাকিমুদ্দি সম্পর্কে সে বলতে পারেঃ-

উয়ার চতুর পাকে কাম চোট্টা চাকর। নিজ হাতে অয় কিছুই করে না। আর অতো টাকা আইছে ক্যামন করি? উয়ার টাকা ভাই অন্ধকারে আইসে যায়; আলোৎ চলে না।

শয়তান মানবতার চিরশত্রু, যেমন সহজ-সরল জনজীবনের অন্যতম শত্রু সন্ত্রাসবাদী ও তাদের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ। সেই রকম হাকিমুদ্দি পিছন থেকে কল্পনা করে নেওয়া চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রহিমুদ্দির বিপদ ডেকে আনতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। মিথ্যা চুরির সাজানো ঘটনায় তাকে জেলে নিক্ষেপে রাস্তা খুঁজেছে। এই সব শয়তানদের কবলে পড়ে সাধারণ ভালো মানুষ, নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষগুলি বিপদের সম্মুখীন জাতে না হয় ;তারই চেষ্টা করেছে রহিমুদ্দি। 'শয়তানগুলাক চেনা হইল ত'? তারা জাতে ভালো মানুষগুলাক জ্বালাবার না পারে তার বুদ্ধি করা লাইগবে।'- শোষনের প্রতিবাদ যে রাস্তায় সম্ভব তারও বুদ্ধি বের করেছে। সমবেত, সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তির জয় হয়ই। এরই আভাস দিয়ে রহিমুদ্দি বলেছে 'সব গরিব যদি একঠে হয় মাইরবার পারবে?'

পরিবেশ-পরিস্থিতির সুযোগ বুঝে কূটকৌশলে হাকিমুদ্দি কূটকৌশলে প্রকারান্তরে ক্ষিপ্ত করেছে সাধারণ অভুক্ত মানুষদেরকে। মুনাফাবাজ আড়তদারের কায়দায় নিজের লোককে দিয়ে গ্রামের মানুষদের ক্ষিপ্ত করার দিকটির পরিচয় প্রকাশ করে বলেছেঃ

লোকজন দিয়া চাইরো পাকে খোঁজ খবর রাইখতেছি। ফির তলে তলে আরোও একটা কাম করি ফ্যালাইছি। লোক লাগেয়া তাতেয়া চ্যাংড়াগুলাক গরম করে দিচ্ছি। তারা সব জোট পাকেয়া ধান চাই বলিয়া হামলা কইরবার আইল বলিয়া।

এর অব্যবহিত পরে মাতব্বর হাকিমুদ্দির শোষক চরিত্রের দিকটির উন্মোচন ঘটেছে এই সংলাপে। তার অপকর্মের যোগ্য সহচর প্রেসিডেন্ট। উভয়ের কথোপকথন প্রসঙ্গের মধ্যে নাট্যকার জমিদারী শোষণের দিকটির উন্মোচন করেছেন, সমাজদরদী নাট্যকার হিসেবে হয়তো তুলসী লাহিড়ীর প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা কাজ করেছে এখানে।

আচ্ছা আবাল বলি সুদ মাপ দিয়া দেমো। বুঝেন নাই? সরকার থাকি নিলে দিবে ১০ টাকা মণ, ঘাতকওয়ালার কাছে ফেরত পামো ২০ টাকা মণ করা। নিজের লোকের হাতে ওজনের পাল্লা তাতেও কিছু লাভ থাকি যাইবে।

মাতব্বর শ্রেণীর মানুষ সে। নিজের লাভালাভের হিসেব-নিকেশ বেশ কষেই তবে পথ চলে। তাই নাটকে হাকিমুদ্দির প্রতিটি পদক্ষেপকে স্বচ্ছ করে তুলে ধরতে গিয়ে তার কণ্ঠে যেমন স্বার্থগন্ধী সংলাপ দিয়েছেন, ঠিক তেমনি তার বিপ্রতীপে যে সব কৃষক হিন্দু-মুসলমান চরিত্র নাটকে রয়েছে, তাদের সংলাপও প্রকারান্তরে হাকিমুদ্দির চরিত্রকে সচেতন দর্শক পাঠকের সামনে তুলে আনে। দীনের দুঃখ কথা যেমন করে দুঃখী মানুষরা বোঝে, তেমন করে সেই দিনের দুঃখ কথা ধনী হয়তো বুঝতে চায় না। কিংবা না বোঝার ভান করে- কিছু দিয়ে সাহায্য করার ভয়ে। কিন্তু অসহায়ের পাশে অপর আর এক অসহায় এসে দাঁড়াতে কোন ভয় করে না। কারণ, দীন দরিদ্র মানুষ বিরাট হৃদয় সম্পদের একচ্ছত্র অধিকারী। সামান্য যা তার ক্ষমতায় সম্ভব তাই নিয়ে তুলে দেয় অন্যের হাতে। নাটক সেই রকম আদর্শ চরিত্র শ্রীমন্ত কিংবা সরেমামুদ। একসময় স্বার্থান্বেষী হাকিমুদ্দির মুখের উপর এক ধরনের ব্যঙ্গ শ্লেষে ভরা প্রশ্নের বাণ ছুড়ে দিয়ে বলেঃ

যা ধান পাছিনো, তাতে মোর চলিল হয়। কিন্তুক বাড়ির বগলের মানুষ না খাইয়া থাকলে তাক কি ধান না দিয়া পারা যায়?

এই সংলাপ যেন মাতব্বর হাকিমুদ্দিকে তার শোষণের নগ্নতাকে পরোক্ষে আঘাত করে। অব্যবহিত পরে শ্রীমন্তের কণ্ঠের একটি সংলাপে সমব্যথী চরিত্র হিসেবে তার যে পরিচয় বিধৃত, তেমনি মন্বন্তরের অনিবার্য ফল যে মৃত্যু- তারও ছবি প্রকাশিত হয়েছে। তুলসী লাহিড়ী একই সংলাপের ভিতরে মন্বন্তরের ভয়ংকরতা এবং সাধারণ মানুষের মৃত্যুর প্রসঙ্গটি নিপুণ চিত্রকরের মতো তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেঃ

কলেরা নাগিয়া বাড়ীর চাইর চারটা মানুষ মাইলো। তবে ক্রিয়া কইত্তে আর পরশ গুলাক দিতে, মোরও ধানে টান পড়ি গেইছে। চাপাচাপি কইল্যে চলে। কিন্তুক পড়শীগুলোর খাওয়ার বুদ্ধি না হইলে-

গীদাল গোবিন্দ নিজের কথাও চিন্তা করে না। কৌতুকপ্রিয় এই মানুষটি সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করে ভুখা মানুষের যন্ত্রণা। সেও তাই দরবার করে হাকিমুদ্দির কাছে। সেও বোঝে ধানের দাম মন্বন্তর কবলিত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। অতএব, এখন জীবনধারণের উপায় হল মাতব্বরের সাহায্য প্রাপ্তি। ধান যদি মাতব্বর দেয় তবে দরিদ্র অভুক্ত মানুষেরা তার বিনিময়ে সুদও দেবে। তবে বরাবর যে হিসেবে সুদ দিয়ে এসেছে, ওই একই হিসেবে সুদ দেবে। কিন্তু এত সহজ-সরল হিসেবে রাস্তায় বেশি লাভবান হবার তেমন কোনো লক্ষণ নেই বলে হাকিমুদ্দি তার ওই দেখানো রাস্তায় যেতে চায় না। সেই কারণে হাকিমুদ্দির জান্তব লালসার দিকটি তুলে ধরতে গিয়ে বসিয়েছেন এই সংলাপঃ-

বরাবরের কথা ছাড়। কোনও দিন তিন টাকার বেশি ধানের দাম দেখছিস? এ সাল বিশ টাকা। আবাদের গতিক ভালয় দ্যাখা জায়। ইনশাল্লা ত আইসে সন ফির তিন টাকায় হইবে। কি কইস শ্রীমন্ত।।.... বিশ টাকা দরের এক মণ ধান নিয়া আর সাল ৩ টাকা দরের ১।০ মন তোরা ফিরি দিবার চাইস রে? বিশ টাকা নিয়া ফিরি দিবু ৪।০ টাকা। দ্যাখেন প্রেসিডেন্ট সাহেব চ্যাংড়াগুলা মোক ঠকাবার চায়।

অসংখ্য অভুক্ত কঙ্কালসার মানুষের জীবনের মূল্য এই মাতব্বরের লোভের কাছে, তার অর্ধগৃধ্নতার কাছে কোনরকম সহানুভূতি দাবি করতে পারে না, পারে না বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন জাগ্রত করতে। তাই এইসব নিরন্ন অভুক্ত মানুষগুলি তার কাছে ‘চ্যাংড়াগুলা’ বলেই মনে হয়।

মন্বন্তরে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। রহিমুদ্দির মা- ও অনাহারে থেকে থেকে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে পতিত। এত মৃত্যুর মিছিলের মধ্যেও শেয়ালগুলো জীবন্ত মানুষদেরকে। যেন জীবন্ত মানুষের উপর তারাও আক্রমণ শানাতে চায়। এই রকম পরিস্থিতির উপস্থাপনা লক্ষ্য করা জায় এই সংলাপেঃ

গোবিন্দ। [শ্রীমন্ত আসছে দেখে] শিয়ালে তাড়া কচ্ছিল রে? পার হইছে কোনও মতে। ওঃ হো কি আন্দাজ আকাল হইলরে। মড়া মানুষ খায়া শিয়াল কুত্তার এমন ত্যাজ হইছে যে মানুষ দেখি আর ডরায় না।

শ্রীমন্ত। শিয়ালে ধচ্ছিল। মুই কঁও আরে বত্তা থাকিতে খাবার চাইস?

গোবিন্দ। মধুটাক বত্তায় খায়া ফেলাইছেনা।

মামুদ। কি? বাঁচি থাকিতে শিয়ালে খাইল!

গোবিন্দ। খাইল ত! উপাসে উপাসে মধু মরিয়ায় আছিল। ঘরের ভাঙা

বেড়ার ফাঁক দিয়া শিয়ালগুলা ঢুকিয়া ধইচ্ছে টুঁটি কামড়েয়া।

আর কবড়াবারও পারে নাই।

গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দির বাড়িতে লঙ্গরখানা খুলেছে। নিরন্ন মানুষদের খাবারের সংস্থান হয়েছে। কিন্তু হাকিমুদ্দির রহিমুদ্দির উপর পুরানো আক্রোশ এখনো প্রশমিত হয়নি। সে কারণে রহিমুদ্দির অভুক্ত পুত্র বসির এবং স্ত্রী ফুলজানকে নিতান্তই অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে না খেতে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। এক অক্ষম পিতা এবং এক নিষ্পাপ স্ত্রীর অসহায় এবং কর্তব্যবিমূঢ় স্বামী হিসেবে, এবার ‘বুঝমান’ রহিমুদ্দির সমস্যা উত্তরণের পালা। উপর্যুপরি ঘটনার আকস্মিকতায় বুদ্ধি বিভ্রম ঘটে যায় তার।

আচমকাই সে স্ত্রী ফুলজানের হাতে তালাকনামা তুলে দেয়। নাট্যঘটনা Climax- এ উপনীত হয়। দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে স্বামী-স্ত্রী। এই প্রেক্ষিতের একটি সংলাপ ছিল এই রকমঃ

রহিম। ফুলজান ধরি জাও এই কাগজ। দ্যাখাও জায়া হারামজাদাক।

মুই ইয়াতে

তোক তাল্লাক লাখি দিছি। আর তুই মোর বিবি নইস...

তোক তাল্লাক দিছি।

ফুলজান। তাল্লাক!! কি কল্লুরে! হায় হায় রে কি কাম কল্লু?

রহিম। খাওয়াবার পারি নাই। কিন্তু মোরে জন্য তোর খাওয়া

বন্ধ হচ্ছিল। তাতে

তোক ফারকৎ করি দিনো।

এরপরে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মহিমবাবুর অফিসের কাজে নিযুক্ত হয়েছে রহিমুদ্দি। এই দৃশ্যে রহিমুদ্দি কিছুটা ভারাক্রান্ত; কিন্তু আবেগতাড়িত। ধর্মকে সে এখনো অমান্য করতে পারেনি। ঘটনা ধারা এগিয়েছে নাট্য পরিণতির অভ্রান্ত লক্ষ্যে। রহিমুদ্দি পুনরায় নিজের গ্রামে ফিরে এসেছে। মন্বন্তর অপসৃত হয়েছে। সবাই মিলে ফুলজানকে রহিমুদ্দির ঘরে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করে দিতে চায়। দুটি ভাঙা হৃদয়ের জোড়া দিয়ে তাপিত হৃদয়ে শান্তি ফিরিয়ে দিতে চায়। মাঝখানে প্রয়োজন কানা ফকিরের নিকা এবং তালাক প্রদান প্রথা। এতসব - এর প্রয়োজন হয়েছে মুসলমান সমাজের সামাজিক ও হাদিজের নিষ্ঠুর বিধান, ধর্মের নামে মানবতার উপর আক্রমণ। কানা ফকির অশ্লীল ইঙ্গিত করে দর কষাকষি করে। ধর্মের হাদিজের নির্মম বিধান বজায় রাখতে গিয়ে নাট্য ঘটনার এক ধরনের Crisis সৃষ্টি হয়েছে। নায়ক রহিমুদ্দির একসময় কিছুটা বিষণ্ণতার শিকার হয়েছে। 'কিনারায় আসিয়া মোর নাও বুঝি দরিয়ায় ডুবে রে।' অথচ ধর্মের কাছে রহিমুদ্দিও একসময় অসহায়ের মত আত্মসমর্পন করেছে। সেও ধর্মীয় নিগূঢ়ের বাইরে বেরিয়ে আসতে না পেরে বলেছেঃ

কামটাই হাঙ্গাম ত' আছে। হামরা যে মুসলমান, হদীজ মানি। তাতে ত' নিকার হাঙ্গামা।

অথচ অসুস্থ পুত্র বসিরের জন্যই ফুলজানকে ফিরিয়ে নেবার দুর্মম বাসনা পোষণ করেছে রহিমুদ্দি। এক সময় হাদিজ ইত্যাদিতে সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। জোরপূর্বক হাকিমুদ্দির বাড়ি থেকে রহিমুদ্দি ফুলজানকে ধরে নিয়ে আসে। ধর্মীয় নীতি, সামাজিক অনুশাসন অমান্য করে সে বলেঃ-

"তোর কোনও ভয় নাই ফুলজান। যা হয় হামারে হইবে। তুই ছাওয়ালটাক কোলে নিয়া তাক বাঁচা চল।"

আবারও রহিমুদ্দি পরিস্থিতি সচেতন হয়েছে। মহিম বাবুর বন্ধু সুশান্ত বাবুর কথা হয়তো সে মনে রেখেছিল, তাই এক সময় প্রতিবাদী মুসলমানের মত রহিমুদ্দি গ্রাম ত্যাগ করে শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায় যেখানে তাদের হদীজ নিয়ে, তালাক নিয়ে কেউই তাদের সামনে জগদ্দল পাথরের মতো এসে বাধার সৃষ্টি করবে না।

"কথা হইলে গুনাহ হয়? মাইনষের দিল তোর নয় ফুলজান। তোর দিল পাথথর। কাবার তামিরখানা গড়েয়া যে পাথর বাঁচছিল, তাই দিয়া খোদা তোর দিল গড়াইছে। চল ফুলজান, হামরা গাঁও ছাড়ি চলি যাই। দূরে অনেক দূরে যাবু? ফুলজান! ফুলজান! গুণাহ হইবে? আচ্ছা গুনাহের আখেরী কথাটা শুনি রাখ। এইটাই তোর ঘর। তোর ছাওয়াল নিয়া তুই এইঠেই থাকবু। মোর ভুলে এত দুঃখ পালু। মাশুল খেসারৎ জা দেওয়া নাগে- মুই দেমো হা আল্লা-।"

ধর্মীয় অনুশাসন খণ্ডনের প্রস্তাব রেখেও স্ত্রী ফুলজানের কাছে থেকে সে কোনরকম সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির আভাস পায়নি। ফলে অশান্ত হৃদয়ে ব্যথা জমেছে, কিছুটা অভিমানে, ক্ষোভে। মুসলমান সমাজের কুসংস্কারের মোহে মোড়া নারী হিসেবে রহিমুদ্দির প্রস্তাবে মতামত দিতে পারেনি। ফলে রহিমুদ্দির পায়ের তলার মাটি যেন কখন সরে গেছে। মনস্ক পাঠক উপরের সংলাপের 'গুণাহ গারের আখেরী কথা' কিংবা এইটাই তোর ঘর। তোর ছাওয়াল নিয়া তুই এইঠেই থাকবু।'- প্রভৃতি শব্দ এবং বাক্য সচেতনভাবে অনুধাবন করে। তাঁরা বুঝে ফেলেন এবার নায়ক রহিমুদ্দী কোন গভীর অভিসন্ধি কিংবা

শ্রেয় প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে স্বকৃত ভুলের মাশুল দিতে প্রস্তুত। তবু প্রতিবাদী যুবক হিসেবে মনুষ্যত্বের পক্ষে যে ধর্মীয় নিদান বাধা স্বরূপ- তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে বিষয়টিকে মানবিক দিক দিয়ে বিচার করতে চেয়েছে।

নিকার নামে বেইজ্জত হইলে হদিজ খেলাপ হয় না। ছাওয়ালটাক বাদীর বাচ্চা বানাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটা মুখের কথা থাকি বাঁচে, তার জীউটা দুই পায়ে থেৎলাইলে হদীজ খেলাপ হয় না- না?

প্রকারান্তরে রহিমুদ্দি সমস্ত মানব সভ্যতার কাছে এই প্রশ্নই রেখে গেছে। আঘাত হানতে চেয়েছে জেহাদী মৌলবাদী ধর্মের অনুশাসনের কারা প্রাচীরে, হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সে যে সুর বাঁধতে চাইছিল তাকে স্থায়ী হতে দিল না ধর্মীয় বিধি। আর অপর প্রান্তে ফুলজানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী মানষের ধর্মীয় গোঁড়ামি। উদ্বন্ধনে, ইচ্ছামৃত্যুর পথে রহিমুদ্দিকে যেতে বাধ্য করেছে এরাই (ফুলজান, হদীজ আর মাতব্বর) তার আত্মহনন সামাজিক, ধর্মীয় অনুশাসনে আঘাত দেবার জন্যই। নাটকের একেবারে শেষ অংশে বন্ধনীকৃত অংশের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সমাজ সচেতন নাট্যকার সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি উপস্থাপনার জন্য যে সব নাট্য চরিত্র নির্মাণ করেছেন, তাদের শ্রেণি পরিচয় অনুসারে সংলাপের আয়োজন বেশ চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি চরিত্রের নাট্য সংলাপ প্রতিটি ক্ষেত্রে মন্বন্তর এবং মৌলবাদী নিদান- এই দুটি দিক স্পষ্টত ব্যঞ্জিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক উপভাষা এবং লোকভাষা নাট্যকার নির্বাচন করেছেন যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে। কিছু ফারসী আরবী শব্দের প্রয়োগে ধর্মীয় অনুশাসন বিষয়ের দিকটি যেমন প্রকাশিত, তেমনি কিছু ইডিয়াম বাগ্ধারা প্রয়োগের নাট্যকারের সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো। নাট্য চরিত্রগুলির মানবিক অভিব্যক্তি অপূর্ব- কারিগরি দক্ষতার মৃত্তিকা গন্ধি সংলাপের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে এই নাটকে। আমরা জানি তুলসীবাবু সমাজ অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানের পরিচয় বহন করে চলেছে তার সবকটি পূর্ণাঙ্গ কিংবা একাঙ্ক নাটক গুলি। সামাজিক নাটক- সামাজিক নাটকের কথা বলে, আর এর জন্য প্রয়োজন স্বার্থক সংলাপ নির্বাচন প্রক্রিয়া। সেই সংলাপ নাট্য বিষয়কে যেমন নির্বাচনের ক্ষেত্রে

যথেষ্ট সাধুবাদ পাবার যোগ্য নাট্যকার ছেঁড়া তার নাটকের সংলাপ বিষয়কে যেমন খুব সহজেই প্রতিফলিত করেছে, তেমনি নাট্য চরিত্রের অন্তর্দেশ প্রকটনেও সাফল্য লাভ করেছে। সে কারণে এ নাটকের সংলাপ সর্বাংশে সাফল্য দাবি করে।

১৪.৫ অনুশীলনী

১) ছেঁড়া তার নাটকের ঘটনা পরম্পরার সংক্ষিপ্ত বিরবণ দাও।

২) ছেঁড়া তার নাটকের শৈলী বিচার সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

৩) ছেঁড়া তার কাহিনি বয়ানের সঙ্গে শৈলীগত পার্থক্য নিরূপণ কর।

৪) ছেঁড়া তার নাটকের কোন ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ও কেন করা হয়েছে, ব্যাখ্যা কর।

৫) ছেঁড়া তার নাটকে সংলাপের বৈচিত্র্য ও প্রায়োগিক দিক উদ্‌ঘাটন কর।

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস – আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২) বাংলা নাটকের ইতিহাস – অজিত কুমার ঘোষ।

৩) গণনাট্য আন্দোলন – দর্শন চৌধুরী।

৪) গণ-নব-সৎ-নাট্যগোষ্ঠীর কথা – সুধী প্রধান।

৫) ছেঁড়া তার –তুলসী লাহিড়ী – পুষ্পেন্দুশেখর গিরি।

১৪.৭ উপসংহার

নাটক কোন প্রথাবদ্ধ শিল্প মাধ্যম নয়, নির্দিষ্ট গড়ন বা পরম্পরা নাটকের বৈচিত্র্য কে বাড়িয়ে তোলে ঠিকই। তবে দর্শকের মনোরঞ্জন ও পাঠকের নিবিষ্টতার পারস্পরিকতা মাথায় রেখেই আমাদের এগিয়ে চলা। নাট্যক্রিয়া ও নাট্যদ্বন্দ্ব তাই আমাদের মিলিত লগ্ন নির্ধারণ করে। ছেঁড়া তার এমন একটি সময়ের পরম্পরিত বয়ান যেখানে নাট্যবিবর্তন তার প্রায়োগিক ও তাত্ত্বিক অভিমুখ গুলোকে একত্রে পেতে আরম্ভ করেছে। নিতান্ত সুখ পাঠ্য না হলেও এর সাময়িক প্রাসঙ্গিকতা আমাদের সাহিত্যবোদ্ধা পাঠকের চেতনা

জাগিয়ে রাখে ঐতিহাসিক স্মরণে স্থিতিশীলতায়। নিরাভরণ দৃষ্টিতে তাই ছেঁড়া তার একটি সামাজিক মর্মস্পর্শী আবেদন, নিম্নবৃত্তের আয়না, হতভাগ্যের উদ্‌বর্তন।